গল্পসমগ্র

(প্রথম খণ্ড)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬৬

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোম্পানী

৭৩/এ আমহার্স্ট রো

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

গৌতম রায়

নবনীতা দেব সেন

করকমলেষু—

গল্প

অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ

অঘ্রাণ মাসের সলকাবেলায় ভাপ-ওঠা স্বাদু ভাত খেয়ে ধনহরি মোড়ল যাবে শালার বাড়ি ধামালিতলা। শালার নাম বনমালী। কবরেজও বটে, গুনিনও বটে। আধিব্যাধির ওষুধ দেয়, আবার ভূতও ছাড়ায়। তবে ধনহরির যাওয়ার কারণ গরু। তিনদিন আগে সোমত্ত বকনাটা নদীর ধারে চরতে গিয়ে পালছাড়া হয়ে নিখোঁজ। মোড়লের মনে সুখ নেই। রাখাল ছোঁড়াটাও ভয়ে বাড়ি ছেড়েছে। ধামালিতলা থেকে চাই কী একটা রাখালও জুটিয়ে আনবে।

আতুরী বেওয়ার পাড়াবেড়নী ধিঙ্গি মেয়েটা বলল, মা গো! ও মা! আমি মাসির বাড়ি যাই?

আতুরী রোদে পা ছড়িয়ে বসে বাসি গুগলির ঝোল মাখানো একমুঠো পান্তা খাচ্ছিল। তাতে ভাতের সংখ্যা কম, এনামেলের খুরির কানায়-কানায় আমানি। পেটের নাড়ি ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, মাসির বাড়ি যাই! মাসি তোমার আপনজন। মুখে অক্ত উঠে মলে খবর নেয় না!

মেয়েটা মায়ের পিঠের কাছে ধুপ করে বসল। কাঁধ আঁকড়ে আদর দিতে দিতে বলল, ধামালিতলা যাই মা! ধনারি মোড়ল যাচ্ছে। তার সঙ্গে যাই। ও মা, মা গো! দুটো দিনের লেগে যাই—লবান্ন খেয়ে আসি।

আতুরীর মনটা নরম হয়ে গেল। উদাস চোখে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, সুরির ঘরে এখন বড় সুখ। আঘুন মাসে ধান উঠেছে। কেনেলের জলে চাষ। খরা-আকাড়া নাই। তা মোড়লমশাই যাচ্ছে?

হুঁ। মেয়ে মিষ্টি হেসে বলল। পুকুরে চান করছিল দেখে বললাম, মোড়ল-মশাই! তোমার জাড় লাগে না গো? মোড়ল বললে, জাড় লাগলে চলবে? এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ধামালিতলা যাব। শেষে বলে কি জানো মা? ও চিরুনী! তোর মাকে শুধোসদিনি, নদীর উদিকে ঘোরাফেরা করে—তো আমার ধলী বকনাটা চোখে পড়েছে নাকি? মা মেয়ে একসঙ্গে খুব হাসতে লাগল। মোড়লের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থাই বটে। তিনদিন ধরে হুলস্থুল বাধিয়ে বেড়াচ্ছে গরুর খোঁজে। এবার ধামালিতলা যাচ্ছে কেন, সিবাই বোঝে। গুনিন শালা মন্তর পড়ে আঁক কষে বলে দেবে, ধলী বকনাটা

কোথায় আছে—উত্তর, দক্ষিণ, পুব না পশ্চিমে। নাকি ঈশেনকোনায়। কতদূরে কী অবস্থায় আছে, বলবে। বলবে বাঁধা আছে, না চরছে।

হাসির ফাঁকে আদুরী বলল, আর মোছলমানের পেটে গেলে? বলে হাসিটা বাড়িয়ে দিল।

চিরুনীর মন মোড়লের গরুতে নেই। এতক্ষণ ভাপওঠা ভাতগুলো সাবাড় করে মোড়ল উঠে পড়েছে। তার মতো মানুষের দায় পড়েনি যে এ পাড়ায় ডাকতে আসবে দীনদুঃখীর ঘরের মেয়েটাকে। চিরুনী উঠে দাঁড়াল। পরনের ছেঁড়া ময়লা আর আঁটোসাটো এই ফ্রকটা পরে মাসির বাড়ি যাবে? মন খারাপ হয়ে গেল তার। দুবছর আগে পুজোর সময় কষ্টেসিষ্টে মা কিনে দিয়েছিল। এখন আর শরীর আঁটে না। ঠেলে বেরিয়ে আসে বুকদুটো। এ বয়সে তার একটা শাড়ি যে কত দরকার, মা যখন-তখন বলে আর ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়ে। বলে, তোর বাবা বেঁচে থাকলে এ্যাদ্দিন কত শাড়ি পরে কার ঘর আলো করতিস। তাই বলে চোখ বুজে যেখানে-সেখানে যার-তার গলায় তো তোকে ঝোলাতে পারিনে! দেখি কী হয়।

চিরুনী বলল, তোমার তোলার কাপড়টা দাও না মা! পরে মাসির বাড়ি যাই।

আদুরী দুঃখে হাসল। তোলার কাপড় কিছু না মাঠঘাট নদীখালে ঘুরে এসে ওই পুরনো রঙীন তাঁতের শাড়িটা পরে কাদামাখানো ছেঁড়া থানটুকু ছাড়ে। ওটা এয়োতি-আমলের কাপড়। নিঃশ্বাস ফেলে আদুরী বলল, তাই পর। আর শোন্, ফকখানা গুটিয়ে সঙ্গে নে। মাসির কাছে সাবুনসোডা চাইবি। কেচে নিবি যত্ন করে।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে চঞ্চল মেয়েটা ঝটপট সেই ডুরে রঙীন শাড়ি পরে যখন বেরুল, তখন নিজের মেয়েকে দেখে আদুরী বুঝি আর চিনতেই পারে না। এমন সোমত্ত হয়ে গেছে তার মেয়ে! মেঘে-মেঘে বেলা বাড়া একেই বলে তবে। আদুরী মনে-মনে লজ্জা পাচ্ছিল। দু-তিনটে জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল। টাকাকড়িও কিছু দিতে চেয়েছিল। কথা দেয়নি। সব মরে হেজে ওই মোটে একটি। দেখে শুনে গেরস্থ ঘরেই দেবে। বোন সুরি ধামালিতলায় গেরস্থঘরে পড়েই না সুখে বেঁচে আছে। দুবেলা ভাতটা খাচ্ছে দাচ্ছে। আর কী চাই মানুষের?

খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো জুটলে তার এই ছিপছিপে গড়নের মেয়ে একদিন

আরও কী ডাগর হত ভেবেই পায় না আতুরী। হেঞ্চাকলমির শাক কাঁকড়া-গুগলির ঝোল খেয়েই এত। বাবুপাড়ায় কারও ঘরে জন্ম হলে কী ঘটত চিরুনীর, তাই ভেবে আতুরীর মন আঁকুপাঁকু করে ওঠে।

আতুরী কপট রাগ দেখিয়ে বলল, ওই মুখেই মাসির বাড়ি যাচ্ছিস হারামজাদী? রগড়ে মুখখানা অন্তত ধো!

কথা কানে করে কে? ধনহরি মোড়ল এতক্ষণ মাঠের পথে নেমেছে দীঘির পাড় থেকে। ধামালিতলা দূর বটে। ঘোরা সুপথে ন ক্রোশের কম নয়। কিন্তু নাক বরাবর সিধে মাঠবিল ভেঙে হাঁটলে ক্রোশ পাঁচেক। এখন বিলের জল শুকোতে লেগেছে। খাল-কাঁদরও প্রায় শুকনো। আলপথে মিঠে রোদে হাঁটতে ভালোই লাগবে। ক্রোশ দুই বাঁধের ওপর দিয়ে পায়ে চলা পথ আছে। জায়গায়-জায়গায় বাঁধ ভেঙে একটু জলকাদা হবে।

খোলামেলা উঠোনের ধারে এঁটোহাতে দাঁড়িয়ে আতুরী দেখছিল তার মেয়ে পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে। গ্রামের পথে এখন সকালের হলুদ রোদ। ধুলোয় পড়ে আছে ধানের কণা। ঝাঁক বেঁধে চড়ুই পাখি খুঁটে খাচ্ছে। চিরুনী তাদের ফরফর করে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। ছায়ার ভেতর ডুবে রঙীন শাড়ি উধাও হয়ে গেলে একবারের জন্য বুকটা একটু কাঁপল আতুরীর। সোমত্ত মেয়ে যাবে অতদূর পথ একজন ভিনপুরুষের সঙ্গে? মাঠঘাট বিলের পথ! ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হল?

ফের তার মন শান্ত হল। ধনারি মোড়ল বাপের বয়সী। চুলে পাক ধরেছে। সামনে দুটো দাঁত ভাঙা। থলথলে সুখী গতরে থপথপ করে হেঁটে বেড়ায়। জমিজিরেত গরু বাছুর ছাড়া আর কিছু তার মাথায় ঢোকে না। এই যে এখনও ছেলেপুলের মুখ দেখলে না, আঁটকুঁড়ে বাঁজা-বাঁজির সংসার—তবু কি অন্য কিছু ভাবল? ক্ষেত আর গরু ছাড়া ধনারি মোড়ল কিছু বোঝে না। আতুরী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটা কদিন ভাতের মুখ দেখে আসুক।

পেছনে ধুপধুপ শব্দ শুনে ধনহরি মোড়ল আলপথে ঘোরে। তার প্রকাণ্ড মুখে পুরু গোঁফ। খুঁটিয়ে কাটা চুল। গায়ে হাফহাতা ফতুয়ার ওপর এণ্ডির চাদর। গোড়ালি থেকে অনেক উঁচু অব্দি পরা খেঁটে ধুতি। কাঁধে একটা মোটা ব্যাগ ঝুলছে। হাতে একটা গাছের ডাল কেটে বানানো যেমন-তেমন

ছোট্ট লাঠি। চিরুনী জানে ওই লাঠিটা গরু খেদানোর কাজে লাগে। তবে আজ পায়ে জুতো পরেছে মোড়ল শালার বাড়ির খাতিরে। চিরুনী জুতোর ভেতর মোড়লের সেই থ্যাবড়া ফাটল ধরা পা আর হাজামজা আঙুলগুলো স্পষ্ট দেখতে পায়। মোড়লমশাই খাঁটি চাষা বটে। মুনিশের চাষ পছন্দ হয় না বলে বার বার ক্ষেতে নেমে লাঙলধরা দেখিয়ে দেয়। এই তো গতকাল ধান কাটার ভঙ্গী শেখাচ্ছিল সে মুনিশদের। তম্বি করে বলছিল, এমনি করে কাস্তে-খানা ধরবি। এমনি করে প্যাঁচ দিবি ধানের গোড়ায়। এই দ্যাখ্, মুঠো কেমন ধরেছি। দেখছিস? চিরুনী ধান কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল মাঠে। এখন তাদের মতো মেয়ের সুদিন। চিরুনীকে দেখে ধনহরি মোড়ল কেমন চোখে তাকিয়েছিল, চিরুনী বোঝে। চুরি করে শামুকের খোলায় কুটুস করে ধানের শিষ কেটে নেয় কুড়ুনীরা। ভাঙা শিষ কুড়োবার ছলে এই এক হাতসাফাই। কিন্তু আঁটকুড়ে মোড়ল, চিরুনী তেমন চুন্নী না। বড় রাগ আর দুঃখ হয়েছিল লোকটার ওপর।

আজ তার ধুপধুপ পায়ের শব্দে পিছু ফিরে সেই চোখে তাকাচ্ছে। এঁড়ে গরুর মতো ঢেলাবেরুনো চোখ। চিরুনী দমে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, রাস্তা কি মোড়লের কত্তাবাবার? তুমি চলো, আমিও যাচ্ছি। চিরুনী মনে মনে শক্ত হয়।

কিন্তু ধনহরি মোড়লের মুখে হাসি ফোটে। বড় দুর্লভ এই হাসি। বলে, সত্যি যাবি নাকিন রে মাসির বাড়ি? এ্যাঁ?

চিরুনী গুমট মুখে নিচে তাকিয়ে বলে, হুঁ।

তা আয়। ধনহরি মোড়ল পা বাড়ায়। ভালই হল। একা না বোকা। কথায়-কথায় বিশ কোরোশ কখন পায়ের তলায় ফুরিয়ে যায় বুঝলি?

গুমুটির মাঠে এখন উত্তরের হাওয়া বইছে। রোদ লি লি করছে দূরের কুয়াশা। দুধারে মাঠের রঙ সোনালী। এখানে-ওখানে মুনিশের সার, কোথাও নির্জন ক্ষেতে এক চাষা সামনে ঝুঁকে ধান কাটছে। কাস্তের পাতে রোদ ঝিলিক দিচ্ছে। খালডোবায় হেঞ্চাকলমির দামে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে কান-কুটোরি পোকা। দুধারে তাকিয়ে-তাকিয়ে ধনহরি মোড়ল হাঁটে আর বুঝি নিজের মনে, কী পেছনের মেয়েটাকেই শুনিয়ে মাঠের কথা বলতে থাকে। তখন ছিল যৌবনকাল। আঘুনমাসটা—তোমার মশাই নবান্ন অব্দি আমাকে মাঠছাড়া করে কে? গোয়ালসুদ্ধ গরুবাছুর হারিয়ে যাক, আর যত ক্ষেতি হোক, এ ধনারি

মাঠছাড়া হবে না। আসলে মাঠের বড় মজা রে! ওই দ্যাখ—দেখতে পাচ্ছিস ভাঁড়ুলে গাছটা—মাথায় শামুকখোল বসে আছে? সেবারে ভাঁড়ুলে-তলায় মানুষ খাড়াই ধান। মুনিশদের সঙ্গে আম্মো ধান কাটছি মনের সুখে। হঠাৎ খবর এল, বাবা তুলসীতলায় শুয়েছে। হুঁঃ, তখন এক নেশা মাথায়। কে কার বাবা—কে শুল কোথা তাতে আমার কী? আমি হলাম মাঠের মানুষ।

ধনহরি মোড়ল খ্যা খ্যা করে হাসে। চিরুনী আনমনে বলে, গেলে না মোড়লমশাই?

পরে গেলাম। ধনহরি বলতে থাকে। তবে মরার আগে দেখাটা হল না। আর টাকাকড়ির খবরও বিশেষ জানতে পারলাম না। শেষে, ঘরের মেঝে, উঠোনের উনোন খোঁড়াখুঁড়ি করলাম রেতের বেলায়।

ক্যানে মোড়লমশায়? চিরুনী আস্তে শুধোয়।

ধনহরি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে, টাকাকড়ি। আবার কী? কাকেও বলিস না। তোকেই বলে ফেললাম।

পেলে না? চিরুনী দুপা এগিয়ে এসে বলল। লুকানো টাকার এমন গল্প ভারি রহস্যময়।

নাঃ। বলে ধনহরি দাঁড়ায়। এণ্ডির চাদরটা গুটিয়ে কাঁধে তোলে। ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে। হাওয়া বাঁচিয়ে বিড়ি জ্বেলে ফুঁক ফুঁক করে টেনে বলে, মাঠ আমাকে খেলে। বুঝলি? বলবি, তাহলে মোড়লমশাই, ক্যানে এমন অসময়ে ধামালিতলা যাচ্ছি? যাচ্ছি—মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ধলী বকনাটা আমার ছেলের মতো ছিল রে! তাকে ফিরে না পেলে দেখবি আমি তুলসীতলায় গে শোব।

চিরুনী নরম হয়ে বলল, বালাই ষাট। অমন কথা বলো না বাপু!

ধনহরি মোড়ল ঘুরে বলে, ক্যানে? আমার মরার বয়স হয়নি বুঝি? দেখছিস না চুল পেকে সাদা হয়েছে? এই দেখ দাঁত ভেঙে ফোকলা হয়েছে।

মোড়ল ফের হাসে। চিরুনীও মজা পেয়ে হি হি করে হাসে। মাথার ওপর দিয়ে শনশন করে বালি হাসের ঝাঁক উড়ে যায়। দেখতে দেখতে ধনহরি বলে, শাঁখালার বিল থেকে বেচারীরা চলল হরিণমারার বিলে। শাঁখালায় আজকাল বন্দুকবাজদের বড় উপদ্রব। খালি ফুটুস ফাটুস গুড়ুম গাড়ুম! কান পাতলেই শুনতে পাবি!

চিরুনী বলে, ও মোড়ল ! তুমি বন্দুক কেনো না ক্যানে বাপু ?

ধনহরি গম্ভীর হয়ে বলে, পাখি মারতে নাই। পাপ হয়।

পাপে কী হয় মোড়লমশাই ?

মাথার চুল উড়ে যায়। বলে ধনহরি মোড়ল হাঁটতে হাঁটতে আলপথের কিনারায় খুদে কাঁটাঝোপের মাথায় বেগুনি রঙের ফুলগুলোর দিকে আঙুল বাড়ায়। বলে, ছোটবেলায় মধু চুষতাম বুঝলি ? তুলে চুষে ছাখ মধু আছে।

জানি। বলে চিরুনী ঝুঁকে পটাপট কয়েকটা ফুল তোলে। চুষে ফেলে দেয়। তারপর বলে, কাঁটা ফুটিয়ে দিলে দেখছ ?

ধনহরি বলে, হুঁ। ফুলগুলান বড় দুষ্টু। দেখি, রক্তটক্ত পড়ছে নাকি ?

চিরুনী আঙুল দেখায়। রক্তের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে। আঙুলটা চুষতে থাকে সে।

ধনহরি হাসতে হাসতে বলে, ভগবানের পিথিমিতে এই এক নিয়ম। ফুলের মধু খাবে তো কাঁটাটিও সও। ও চিরুনী, তোর মা তোকে আসতে দিলে ?

চিরুনী আনমনে বলে, না দিল তো এলাম কী করে ?

তুই বলেছিলি মোড়লমশায়ের সঙ্গে আসবি ?

হুঁউ।

ধনহরি মোড়ল কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে। তারপর বলে, ছামুতে একটু জল-কাদা হবে। ওই দেখছিস হেজলতলা—ওখানটায় বাঁধ ভেঙে আছে। জুতো গুলান খুলি।

জুতো দুটো খোলে সে। বাঁহাতে নেয়। চিরুনী বুঝতে পারে, মোড়ল-বুড়ো জুতো পরে হাঁটতে পারছে না। হিজলতলা এখনও কিছু দূরে। পরশু হিজলতলার জলকাদাটা হাতড়ে তারা মায়ে-ঝিয়ে মিলে অনেক মাছ ধরেছিল। গুহুটির চারদিকে ছড়ানো মাঠঘাট খালবিলের খবর ধনারি মোড়লের চেয়ে তারা কি কম জানে ? তবে ওই কথাটা বেশ নতুন। মোড়লের সঙ্গে তার বাবার মরার সময় দেখা হয়নি। তাই পোঁতা টাকাকড়ির খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাড়ি ফিরে মাকে বলবে চিরুনী। টাকাগুলো তাহলে এখনও পোঁতা আছে।

চিরুনীর গা শিরশির করে। শীতে নয়, উত্তেজনায়। উত্তুরের হাওয়াটা বরং রোদে তেতে মিঠে হয়েছে। যত দূরে আসছে গ্রাম থেকে, তত লোক-জন মাঠে কমে যাচ্ছে। এমাঠে এখনও ধান কাটা হয়নি। ভাল পাক ধরেনি শীষে। কোথাও ধানের রঙ এখনও কিছু সবুজ। যেতে যেতে কতবার সেই-

সব ধানক্ষেতের ভেতর বদ্ধ জলে আটকেপড়া মাছের খলবলানি শুনে চঞ্চল হল চিরুনী। মাসির বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে মাছগুলো কি আর থাকবে? শেয়াল আর পাখপাখালি গন্ধে টের পেয়ে যাবে।

ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাঠ বিলের দিকে। চিরুনীর গায়ে শাড়িটা আর বুঝি থাকতে চাইছে না। কখনও আঁচল উড়ে খুলে যাচ্ছে, কখনও জড়িয়ে-মড়িয়ে আঁটো করে ফেলছে। তবু তার মনে শাড়ি পরার সুখ। সুখের ঘোর একটু করে বাড়ছে আর বাড়ছে। কখন ধামালিতলায় মাসির দাওয়ায় রোদে বসে ভাপওঠা নতুন চালের ভাত খাবে। আর এই বিশাল মাঠে গুমুটির সেরা এক মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটাও কিছু কম সুখ নয়। ধনারি মোড়ল যে এমন করে মন খুলে তার মতো মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে, হাসাহাসি করবে, এ জন্মে ভাবতে পেরেছিল কি চিরুনী? কেমন করে ফুলগুলো দেখিয়ে মধু চোষার কথাটাও বলে দিল!

এই ঢালু ও নাবাল মাঠের আলপথে দুদিক থেকে ধানের শীষ উপচে এসে পড়েছে। কত শীষ পায়ের তলায় মেড়ে গিয়ে ছড়িয়ে আছে। শালিক পাখিরা খুঁটে খাচ্ছে। লাঠির ডগায় দুধারে সরিয়ে দিয়ে হাঁটছে মোড়লমশাই। এখনও ধান আর ঘাস থেকে রাতের শিশির সবটা শুকিয়ে যায় নি। চিরুনীর দুই পা ভিজে যাচ্ছে। ঘাসের ফুল আর কুটোকাটার সঙ্গে দু একটা পোকামাকড়ও আটকে যাচ্ছে। ঝাড়তে ঝাড়তে হাঁটে সে। ধনারি মোড়ল পেছন ফিরে দেখে বলে, মকুনপুরের বাঁধে উঠলে আর হ্যাঙ্গামা নাই। খটখটে পোক্তের রাস্তা। ও চিরুনী, গেছিস কখনও ওবাগে?

চিরুনী বলে, হুঁউ। সেই সেবার বাবার সঙ্গে গেলাম। মেলা বসেছিল ধামালিতলায়।

তোর বাবা বড় ভাল মানুষ ছিল। ধনহরি ওর বাবা আকালীর গল্প করতে থাকে। আকালীর মতো খাটিয়ে মুনিশ আর পৃথিবীতে জন্ম নেবে না। আকালী মাটি চিনত। মাটির মানুষ ছিল। ওর গায়ে মাটির গন্ধ ছিল।...তোর তখন জম্মো হয় নি চিরুনী। গুমুটির বিলে বোরোধানের ক্ষেতে জল ছেঁচতে মুনিশ দিয়েছিলাম তিনটে। তোর বাবাও ছিল। রেতের বেলা জোসনা উঠেছে—তখন তোর মা এসে বললে, ও মোড়লমশাই, আমাদের মিনসেকে কোথা রেখে এলে? ভয় হল মনে। পোকামাকড়ে দংশালে নাকি। দুই মুনিশ কখন বাড়ি ফিরেছে, আকালী ফিরল না ক্যানে? গিয়ে দেখি, তখনও

দোন বেয়ে জল ছেঁচছে। বলল, কাজ বাকি রেখে বাড়ি যাবে না আকালী। তো এই রকম মুনিশ ছিল তোর বাবা। বুঝলি কি না? আজকাল মুনিশজন বড় ধড়িবাজ।

চিরুনী চুপ করে থাকে। বাবার কথা তুলে ধনারিবুড়ো মন খারাপ করে দিচ্ছে কেন? আজ তার বড় সুখের দিন। মাসির বাড়ি অঘ্রানের গন্ধমাখা মিঠে ভাত খাবে। ধান পেকে ওঠার দিন থেকেই তার মাথায় খালি মাসির বাড়ির কথা স্বপ্ন হয়ে ভেসেছে। মা তো মাথা কুটলেও বোনের বাড়ি যাবে না। একা কেমন করে যেতে পারত চিরুনী? বড় ভাগ্য ধনারি মোড়লের বকনা গরুটা হারিয়ে গেল।

হিজলতলায় পৌঁছে লাঠি বাড়িয়ে ধনহরি মোড়ল জল মেপে পা বাড়ায়। তারপর ছেলেমানুষের মতো শীতে চমকখাওয়ার ভঙ্গি করে। উঁ হু হু হু! কামড়ে দিলে রে কামড়ে দিলে! তখন পুকুরে ডুব দিলাম। এমন ঠাণ্ডা জল হলে মরেই যেতাম। মাঠঘাটের জলটা বেজায় ঠাণ্ডা হয়।

ওপারে একটা ভাঁটগাছের মাথায় কয়েকটা শামুকখোল চুপচাপ বসে আছে। পরশু মায়ের সঙ্গে চিরুনী এখানে এসে পাখিগুলোর পেছনে লেগেছিল। এখন ইচ্ছে করে না। খালি মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে যেতে-যেতে এমনি করে সারাপথ কত গল্প শুনত। আর সেই গঙ্গার ঘাটে চাঁপাফুলের বাসছড়ানো মড়ার গল্পটা।

মোড়লও কি জানে সে গল্প? কিংবা কাঁদুনেদীঘির বটতলার সেই পেত্নীর গল্প—আকালীকে বলেছিল, আয়, তোকে বে করি? ও চিরুনী, মাকে যেন বলিস নে—শুনলে…

চিরুনী খিখি করে হেসে ওঠে জলের মধ্যে। ওপারে আলে উঠেছে মোড়ল। ঝটপট কাপড় সামলে লাজুক মুখে বলে, কী রে? হাসলি কেন? আমি বুড়োমানুষ।

লজ্জায় চিরুনী তক্ষুনি কাঠ। কথাটা বুঝতে পেরেছে। চোখের মাথা খেয়ে মোড়লের গতর দেখেছে নাকি সে? পেত্নীর কথা মনে হয়ে এ হাসি। উঠে গিয়ে বলে, মোড়লমশাই, কাঁদুনেদীঘির বটতলায় গেছ কখনও?

অবাক ধনহরি বলে, ক্যানে, ক্যানে?

বাবা একটা পেত্নী দেখেছিল।

ও। আকালী! ধনহরি মোড়ল পা বাড়িয়ে বলে। আকালী বড় গপ্পে মানুষ ছিল। ও পেত্নী দেখবে না তো দেখবে কে?

তুমি দেখনি মোড়লমশাই ?

ধনহরি হাসিমুখে বলে, ভূতপেত্নীর গল্প রেতের বেলা জমে। এখন দিনদুক্কুর বেলা। আয়, পা চালিয়ে আয় দিনি। এমন করে হাঁটলে ধামালিতলা পৌঁছুতে বিকেল গড়িয়ে যাবে।

ধনহরি মোড়ল থপথপ করে হাঁটে। একহাতে লাঠি, আর হাতে জুতো-জোড়া। এণ্ডির চাদর গুটিয়ে কাঁধে তুলছে। হাঁটুঅব্দি ধুতি গুটিয়েছে। পেছন থেকে তাকে লক্ষ্য করে চিরুনী। মোড়লপাড়ার এই সেরা মানুষটার সঙ্গে সে কী ভাগ্যে হাঁটছে। ফের তার সুখ বাজে মনে। কাঁধের পুরুষ্টু ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, কী থাকতে পারে ওর ভেতর ? গুড়-মুড়ি কি ? অনেকদূরের পথ। আসার সময় সেবার মাসি অনেক গুড়মুড়ি দিয়েছিল। বাঁধের রাস্তায় আসতে আসতে বাবা-মেয়ে গাছতলায় বসে পেট ভরে গুড়মুড়ি খেয়েছিল। নোলায় জল আসে চিরুনীর। কাল রাতে গমের আটা গুলে সেদ্ধ করে খেয়েছে মায়ে-ঝিয়ে। গুগলির ঝোল করেছিল। দিনের একটুখানি ভাতে জল ঢেলে সকালের জন্যে রেখেছিল। ভোরে উঠে যেটুকু খেয়েছে, কখন হজম হয়ে গেছে। ভগবান, ধামালিতলাকে শিগগির কাছে এনে দাও। চিরুনী তার মাসির বাড়ির দাওয়ায় বসে ভাপওঠা নতুন ধানের ভাত খাবে।

শীতেরই ধানের দিনে কত দূর কত গাঁয়ের মাঠে যায় ধানকুড়োনী মেয়েরা। গত শীতে চিরুনীরা মায়ে-ঝিয়ে যতদূর এসেছিল, তাও ছাড়িয়ে যেতে চিরুনীর চমক লাগে। গোপগাঁয়ের মাঠে মোষ চরাচ্ছে জলার ধারে এক যুবজোয়ান রাখাল। মোষের পিঠে বসে হাঁক মেরে বলে, মোড়লমশাই নাকি ? চললে কোথা গো ?

ধনহরি সূর্য আড়াল করে লাঠিসুদ্ধ হাত কপালে তোলে। চিনতে পেরে বলে, মুকুন্দ ! তোর মামার খবর কী ? ভাল তো ?

মুকুন্দ ফ্যাঁচ করে হাসে। ভাল। তা মোড়লমশায়ের পেছুতে উটা কে গো ? লতুন স্যাঙা করলে নাকি ? ই কী করেছ বাপু বুড়োবয়েসে ?

ধনহরি মোড়ল ঘুরে চিরুনীকে দেখে নিয়ে হা হা করে হাসে। তোর খালি ফচকেমি মুকুন্দ ! এটা আমার গাঁসম্পর্কে নাতনী।

ভাল, ভাল। রসিক মুকুন্দ হেঁড়েগলায় মোষ ডাকায়, ধোঃ ধোঃ ! জলার ধারে কাঁড়িঘাসের বন ভেঙে তেজী মোষটা ছোটে। বক তাড়া খেয়ে ওড়ে। মাথার উপর হট্টিটি পাখি ডাকে, টি টি টি।

চিরুনী রেগে লাল হয়ে চাপা গাল পাড়ে। ধনহরি মোড়ল বলে, বলুক না—বলুক। বলতে দে। মুখে বলছে বৈ তো না। তবে ছোঁড়াটা ওই রকম।

চিরুনী ফোঁসে। বলবে ক্যানে? এ্যাঁ? চোখের মাথা খেয়েছে? দেখতে পায় না?

বলুক, বলুক। ছেড়ে দে। ধনহরি সান্ত্বনা দেয়।

চিরুনী বলে, গিয়ে মাকে বলব। মজা দেখিয়ে ছাড়বে।

ধনহরি ওর হাত ধরে টানে। দুগাছি কাচের চুড়ি ঠুনঠুন করে ওঠে। দূর পাগলী মেয়ে! তোর মা এ্যাদ্দূরে কি ঝগড়া করতে আসবে? আর একটা কথা বলি শোন্। মাঠঘাট জায়গায় সব ভালো-মন্দ কথা হাওয়ায় উড়ে যায়। গায়ে লাগতে পারে না। আয় দিকিনি পা ফেলে।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে চিরুনী গোঁ করে। ধনহরি পিছিয়ে এসে বলে, অত রাগ করে না। তোর নাম চিরুনী কে রেখেছিল বলদিকিনি? চল্, তুই এবারে আগে আগে চল্।

বলে সে সুর ধরে ছড়া গায়, 'দোল দোল দুলুনি/রাঙা মাথায় চিরুনী/বর আসবে এখুনি...'

বুড়ো মোড়লের গলায় ছড়া শুনে মেয়েটার মনের কুটো ঘুচে যায়। আগে হনহন করে হাঁটতে থাকে। মনটা ভাল হয়ে যায়। ছোটবেলায় নাকি সে মায়ের মুখে এই ছড়া শুনে দুলত আর খিটখিট করে হাসত। তাই তার নামটা চিরুনী হয়ে গিয়েছিল। তার আসল নাম যে সাবিত্রী, তা আর যেন কারুর মনে নেই। শুধু বাবা মাঝে মাঝে সাবি বলে ডাকত। এখন বুঝতে পারে, বাবা বেঁচে থাকলে এতদিনে সে সাবিত্রী হয়েই যেত। চিরুনী নামটা তার তো পছন্দ নয়।

এখন ক্রমে ক্রমে বেলা বেড়েছে। রোদের হলুদ রঙটা ফিকে হতে হতে একটু সাদাটে হয়েছে। তাত বেড়েছে। চার পাশে এখন নতুন দেশের মাঠ। অচেনা মুখ। ধানক্ষেতের মুনিশরা তাকে দেখতে মুখ তুললেই চিরুনী চমকে উঠেছে, এই বুঝি ফের অকথা কুকথা বলে রসিকতা করে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। ধনারি মোড়লকে এরা চেনে না। তবু মোড়ল মাঝে মাঝে থেমে ধানের শীষ, হাওয়া-বাতাস, আর গত বৃষ্টির খবর নিতে ছাড়ছে না। সার নিয়ে কথাবার্তাও বলছে। এখন কিছুক্ষণ ধনহরি মণ্ডল খাঁটি চাষা।

জিরাণ্ডা-হরিপুরের বাঁয়ে পড়ল হরিণমারা বিল। বিলের মাঝ বরাবর উঁচু বাঁধ। বাঁধে উঠে ধনহরি বলল, আর পাক্কি তিনক্রোশের মাথায় ধামালিতলা। এই বাঁধটাই অন্ততপক্ষে ক্রোশ দুই। এবারে আস্তে-সুস্থে হাঁটি আয়। তারপরে একখানে গাছতলায় বসে গুড়মুড়ি খাব। নিচে টলটলে জল। দু' আঁজলা খাব। বাস্!

বলে সে হাওয়া বাঁচিয়ে এতক্ষণে দ্বিতীয়বার বিড়ি জ্বালে। উঁচু বাঁধের দুধারে গাছগাছালি ঝোপঝাড় রয়েছে। দু পাশে আদিগন্ত বিল—সবুজ, ধূসর, কোথাও কালচে। দূর গ্রামরেখা জুড়ে ঘন কুয়াশা লেগে আছে এখনও। জন নেই, মানুষ নেই, বড় নিরিবিলি এই দেশ। চিরুনী ভাবে, মাকে নিয়ে এখানে এলে কত মাছ ধরতে পারত। কত পাটকাঠি কুড়িয়ে নিয়ে যেত। এখানে আসতে পারলে মানুষের অভাব ঘুচে যায়। কত শাক, কত মাছ শামুক ঝিনুক! হরিণমারা বিলের গল্প ফিরে মাকে গিয়ে বলবে সে।

কী রে? কথা বলছিস না যে? ধনহরি মোড়ল শুধোয়। কী হল তোর? ও চিরুনী?

চিরুনীর মুখে হাসি ফোটে। বলে, চিরুনী-চিরুনী কোরো না তো বাপু! আমার নাম সাবিত্তিরি!

সাবিত্তিরি! ধনহরি বিড়ির ধুঁয়ো উড়িয়ে হাসে। ভাল ভাল। তা অমন ঝিম মেরে গেলি যে?

চিরুনী চঞ্চল হয়ে বলে, ও মোড়লমশাই! এদেশের নাম হরিণমারা ক্যানে গো?

ধনহরি বলে, বলছি। বলব। আস্তে সুস্থে হাঁট দিকিনি। সে বড় মজার গল্প।

বাঁধের মাথায় পায়ে চলা একফালি সংকীর্ণ রাস্তা। ধনহরি পাশাপাশি হাঁটে। চিরুনী সরতে গেলে সে সাবধান করে দেয়, কাঁটা! কাঁটা দেখছিস না—কত কাঁটানটের ঝাড়?

হরিণমারা ক্যানে তাই বলো না মোড়লমশাই?

ধনহরি মোড়ল কথকঠাকুরের ভঙ্গীতে মুখ তুলে ভরাট গলায় বলে, সে অনেক কাল আগের কথা। এই বিল তখন বিল ছিল না। ছিল এক গহীন জঙ্গল। বাঘ থাকত। কত জন্তু থাকত। আর থাকত হরিণ। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাজা লাট-বেলাট এসে বন্দুকে বাঘ মারে। হরিণ মারে। মারতে মারতে জঙ্গল উজোড় করে দিলে। তো সেবারে এক লাট-

বেলাট না কালেক্টর এসেছেন শিকারে। জঙ্গলে তখন মোটে এক থাকে হরিণ। তাড়া খেয়ে ছুটল সে হরিণ। ছুটল, ছুটল, ছুটল...

চিরুনী দেখল মোড়লমশাই তার কাঁধে একটা হাত রেখেছে। লাঠিটা বগলে সামলেছে। চিরুনী আনমনে বলল, তাপরে?

হরিণ তো ছুটছেন। ইদিকে এক চাষা পুরুষ জঙ্গল কেটে ক্ষেত করেছেন। কুঁড়ে বেঁধেছেন। নিরিবিলি তিনি সেখানে আছেন। হরিণ গিয়ে তেনার কুঁড়েতে আশ্রয় নিলে। তখন বন্দুকবাজ সাহেব এসে তাকে বললে, কৈ হরিণ? চাষা বললে, মারলে আমাকেই মারুন। হরিণ পাবেন না।

চিরুনী মুগ্ধ হয়ে বলে, তা'পরে? ও মোড়লমশাই। তাপরে কী হল?

ধনহরি মোড়ল বলে, সায়েব তাকেই গুলি মারলে।

মানুষকে? চিরুনী চোখ বড় করে বলে।

হুঁ, বলছি শোন্ না। ধনহরি রহস্যময় হাসে। যেই না গুলি মেরেছে, দেখে কী—মানুষ কি? চাষা কৈ? এটাই তো হরিণ।

মানুষটা হরিণ হয়ে গেল? আর হরিণটা কী হল মোড়লমশাই?

হরিণ তখন কুঁড়ে থেকে মানুষ হয়ে বেরিয়ে বললে, আরে রে পাপিষ্ঠ! আমার হরিণাকে তুই গুলি মারলি! তোর হাত থেকে বন্দুক খুলবে না। বাস্! আর খুলল বন্দুক। কলকেতা যেয়ে হাত দুটো কেটে তবে বন্দুক খুলেছিল ডাক্তারবাবুরা। বুঝলি তো?

চিরুনী কিছু বুঝতে পারে না। ধনারি মোড়ল তার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে, এরও কিছু বুঝতে পারে না। গল্পটার চেয়ে পেটে খিদের টান বেশি। মোড়ল বলেছে গুড়মুড়ি খাবে গাছতলায়। সেই গাছটা কখন সামনে আসবে, তার প্রতীক্ষায় ধুকুপুকু হাঁটে সে।

ধনহরি বলে, এ বড় কঠিন জায়গা রে চিরুনী! এখানে কে কোন বেশে আসে-যায়, ঘুরে বেড়ায়, তার নির্ণয় নাই। একবার ধামালিতলা থেকে আসছি। বনমালী বললে, রেতের বেলা যেয়ে কাজ নাই। আমার কি থাকলে চলে? বেরিয়ে পড়লাম। মাঝ বরাবর এসে দেখি...

থামতে দেখে চিরুনী বলে, কী?

ঠিক তোর বয়সী একটা মেয়েছেলে আগে আগে হনহন করে হাঁটছে। ধবধবে জোসনা। পষ্ট দেখছি। সঙ্গ ধরার চেষ্টা করছি। পারি না।

চিরুনীর হাসি পেল। ঠোঁট উত্তুরে হাওয়ায় শুকিয়ে চিমসে। ফেটে আছে। ক্লান্তিও এসেছে খিদের সঙ্গে। কষ্টে হেসে বলে, ও মোড়ল! আমি যদি সে হই?

ধনহরি তার কাঁধ সাবধানে টিপে বলে, তবে পরখ করে দেখি। মানুষ, না অমানুষী?

কাতুকুতু লাগছে মোড়লমশাই!

ধনহরি মোড়ল বলে, আহা শোন না গল্পটা! শেষে ছুটতে লাগলাম। তাপরে বেটিকে এমনি করে দু হাতে ধরে ফেললাম।

চিরুনীকে জুতোশুদ্ধ অন্য হাতেও পেঁচিয়ে মোড়লমশাই এত জোরে ধরে যে মেয়েটা হাঁসফাস করে। ছটফট করে নড়ে। ধনহরি হাসতে হাসতে ছেড়ে দিয়ে বলে, বেটি কিন্তু তখন একেবারে বাতাস হয়ে গেছে। বুঝলি?

চিরুনী ছাড়া পেয়েই এগিয়ে গেছে। ধনারি মোড়লের গায়ে এত জোর, সে ভাবতে পারে নি। হবে বৈ কি। ভাতের কষ্ট তো পায় নি আজীবন। তার ওপর কত দুধ-ঘি খেয়েছে। পুকুরে কত বড় বড় মাছ ওর। না ছেলে, না পুলে—অত সব খাদ্য মাগ-ভাতারে সাবাড় করে। চিরুনীর মনে দুঃখ হয়। দুঃখে সে মুখ নিচু করে হাঁটে। কিছুক্ষণের জন্যে গুড়মুড়ি কিংবা মাসির বাড়ির শীতের ধানের ভাপওঠা স্বাদু অন্নের কথাও সে ভুলে যায়। তার চোখে জল এসে যায় ধনহরি মোড়লের সুখের কথা ভেবে।

ধনহরি ডাকে, অ চিরুনী! নাকি সাবিত্তিরি বলব? সাবিত্তিরি!

উঁ?

তখন গুনুটির মাঠে ছুটে এসে সঙ্গ ধরলি, হঠাৎ ঘুরে তোকে দেখে আমি চিনতেই পারিনি।

চিরুনী কিছু বলে না। হেঁট হয়ে একটা ঝোপের পাতা ছিঁড়ে কামড়ায়।

বিশ্বেস কর্। চিনতেই পারি নি। ধনহরি ভারি গলায় বলে। আর ছামুতে হেঁটে যাচ্ছিস—মাঝে মাঝে ভরম লাগছে, না জানি এ মেয়েটা কে।..
ধনহরি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, গেরস্থ জমিজিরেতওলা ঘরের মেয়ে অনেক আছে বটে। কিন্তুক মুনিশখাটা মানুষের ঘরে এমন সোনা কোথা আছে? দেখি না সংসারে। রোদে সোনা যখন ঝলমল করে, তখন এ বুড়ো চোখে বড় বাজে।

মাথা দোলায় ধনহরি মোড়ল। গলার ভেতর বলতে থাকে, বয়স তো কম হল না। কত দেখলাম। আর তার চেয়ে বড় কথা, এ বিল-বাদাড় নিরিবিলি জায়গায় এসে খালি ভাবি, ই কি মানুষ, না অমানুষী? দিনে তো জোসনা ওঠে নি রে! নাকি উঠেছে?

চিরুনী বলে, ও মোড়ল! অমন করে কথা বলো না বাপু! আমার ভয় লাগে।

ভয়! কিসের ভয় সাবিত্তিরি? ধনহরি একটু হাসে। আমি মানুষ বটি। তবু মনটা কেমন লাগে। কী ভাবি। কী হুলুস্থুলুস মনের ভেতর! শরীলটা বড় ভারি লাগে। ক্যানে এমন লাগে কে জানে!

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে সে বগলের লাঠিটা এতক্ষণে হাতে নেয়। তারপর বলে, ওই গাছটার তলায় বসে আমরা মুড়ি খাব। দুপহর হয়ে এল। খিদে পেয়েছে। তোর পায় নি?

চিরুনী ঘুরে কাতর হেসে বলে, হুঁউ।

সকালে কী খেয়ে বেরিছিস?

চিরুনী আস্তে বলে, পান্তা।...

নিচে হরিণমারা বিলের জলে শালুকপাতার ভেতর ঘুরে ঘুরে খেলছে পানকৌড়ি। দূরে ওড়াউড়ি করছে বালিহাঁসের ঝাঁক। ঝাঁকড়া জামতলায় বাঁকা রোদে এসে খটখটে ন্যাড়া মাটির ওপর শুয়ে আছে। তার চারদিকে ঘন ছায়া। জাম জিয়ালা হিজলের জড়াজড়ি বাঁধের দুধারে। ধনহরি বলে, বড় ভাল জায়গা। সে পা ছড়িয়ে রোদে বসে। লাঠি জুতো যত্ন করে পাশে রাখে। এণ্ডির চাদর কোমরে জড়ায়। তারপর ব্যাগ থেকে ন্যাকড়ার পুঁটুলি বের করে। তার ফুলো চোখ দুটো, তার ভরাট গাল, পুরু গোঁফ ডগমগ করে আহ্লাদে। বলে, দাঁড়িয়ে ক্যানে? আয় ইখেনে আয়। পাশাপাশি বসে দুই জনাতে গুড়মুড়ি খাই। আর ওই দ্যাখ, নামুতে টলটলে জল। ভাল না?

চিরুনী জলটা আড়চোখে দেখে নিয়ে বসে। আঁচল পেতে বলে, কৈ দাও!

পাগলি! ধনহরি হাসে। আজ আমরা এক পথের পথিক। এক ঠাঁই খাই। সঙ্গে খা।

পুঁটুলি খুললে চাপ চাপ সোনালী গুড়ের জমাট পিণ্ড আর লম্বাটে ঝকঝকে সাদা মুড়ি দেখে চিরুনীর ঘোর লাগে। তবু সে দোনামনা করে। মোড়ল-মশাই। একসঙ্গে খাব ক্যানে? আঁচলে দাও।

ওর দুটো চুড়িপরা হাত টেনে পুঁটলির মধ্যে গুঁজে দেয় ধনহরি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, জাত খেলে যায় না, বললে যায়। আর এই নিরিবিলি ঠাঁই জাতের কথায় কাজ কী মানিক? খা। পেরানে যত চায়, খা।

তারপর নিজের মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বলে, আউৎকুলি ধানের নাম শুনেছিস? সেই ধানের মুড়ি।

গুড়টা বুঝি গত মরসুমের। স্বাদে আপ্লুত মেয়েটা কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় মোড়লমশাইয়ের দিকে। মোড়লমশায়ের দু' চোখে অগাধ হাসি। গোঁফ দুলছে। মাঝখানের ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে মুড়ির কণা। তার মধ্যে কথাবার্তাও বলছে। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। ক্রমশ চিরুনীর মনে হতে থাকে, মাঠে ঘুরে ঘুরে তার মা যে মাঠের দেবতার কথা বলে, যে দেবতা গরীব-দুঃখী মানুষকে খাদ্য দেয়, পাখপাখালিও যার দয়ায় শস্যদানা খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকে, আজ বড় ভাগ্যে আদ্যিকালের সেই মাঠ-ঠাকুর তার সামনে এসেছে। পরম সুখে তার হৃদয় টলটল করে।

আর ধনহরি মোড়ল বাঁ হাতে তার কাঁধ ধরে টানে। বলে, কাছে বসে খা। কাছে বসে খা!

সেই টানে কৃতজ্ঞ মেয়েটা ধনহরি মোড়লের থলথলে গতরের সঙ্গে সেঁটে যায়। মোড়লের সেই হাতটা তার কাঁধ পেরিয়ে বুকের দিকে নামতে থাকে। মোড়ল ঢোক গিলে বলতে থাকে, লজ্জা করিস না। খা। যত মন চায়, খা।

তার বুকের মাংসের ডেলায় পড়ে মোড়লের থ্যাবড়া হাতের মোটা আঙুলগুলো। মোড়ল ফের বলে, লজ্জা করিস না। খা—যত মন চায়।

চিরুনী একবার ভাবে, সরে বসবে—আবার ভাবে, মোড়লবুড়োর মুড়ি আর গুড়টা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তবু তার মুখে লালচে ছটা ফোটে। লজ্জা-দ্বিধা-শঙ্কা তার বুকের ভেতরটা কাঁপায়। সে সরে বসে না। বাধা দিতে পারে না। যতক্ষণ খাদ্যটা না ফুরোয়, ধনহরি তার শরীর নিয়ে খেলে। তারপর সে ফুলো চোখদুটো ও পুরু ভুরু নাচিয়ে বলে, বেশ ডাগর হয়েছিস সাবিত্তিরি! আমি বুড়ো না হলে তোকে স্যাঙা করে পালিয়ে যেতাম।

চিরুনী আস্তে বলে, ছাড়ো! তারপর দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে যায় জলের ধারে। শুকনো পাটকাঠির পাঁজার ওপর বসে সামনে ঝুঁকে আঁজলাভরে ঠাণ্ডা হিম জল গিলতে থাকে। একটু পরে তার গায়ে ছায়া পড়ে ধনহরি মোড়লের। মোড়ল তার পাশে বসে তেমনি করে জল খায়। বলে, জলটা বড় ভাল।

চিরুনী ঢেকুর তোলে দাঁড়িয়ে। তৃপ্তির চোখে সে হরিণমারা বিলাঞ্চল দেখতে থাকে। দূর ধূসর সীমায় হটিটি পাখির ডাক শোনে টি টি টি টি টি টি! ফাঁকা জলটার ওপর জল-মাকড়সার ছুটোছুটি দেখতে দেখতে তার মনে হয়, হঠাৎ বয়সটা তার বেড়ে গেছে। মাসির বাড়ির দাওয়ায় বসে শীতের ধানের সুগন্ধ ভাপওঠা ভাতের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সে ডাগর যুবো মেয়েটি হয়ে উঠবে।

আর ধনহরি মোড়ল মুখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে ফের তার কাঁধে হাত রাখে। আস্তে বলে, এবার চল একটুখানি জিরিয়ে নিই। পা দুখানা ধুয়ে বড আরাম লাগছে। তুই পা ধুলেও পারতিস সাবিত্তিরি! কথায় বলে, কোশ অন্তর ধুয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

বলে সে হেঁট হয়ে চিরুনীর পা দেখে। বলে, বড সুন্দর তোর পা। ধো। ধুয়ে নে।

চিরুনী আনমনে বলে, থাক। সে দেখে, মোড়লমশাই ওপর থেকে জুতো-লাঠি তো এনেছেই, তার গুটিয়ে রাখা ফ্রকটাও এনেছে। চিরুনী ফ্রকটা নিতে হাত বাড়ালে ধনহরি হেসে সেটা নিজের ব্যাগে ভরে। তারপর ঢালু ঘাসের ওপর তার কাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে। বাঁধের রাস্তায় না উঠে ধনহরি সামনে এগিয়ে শেয়াকুল নাটাবনের কাছে যায়। মিইয়েপড়া ধূসর ও হলুদ ঘাসের ওপর ধুপ করে বসে পড়ে। রোদের আরাম আছে এখানে। চিরুনী বসে বলে ধামালিতলা আর কদ্দূর মোড়লমশাই?

ধনহরি বলে, ধামালিতলা কি পালিয়ে যাচ্ছে? সে এণ্ডির চাদরটা ঘাসে বিছিয়ে নেয়।

চিরুনী বলে, ও কি মোড়লমশাই? তুমি শোবে নাকি গো?

ধনহরি হাসে···আয়, তুইও শো। রোদটা মিষ্টি।

চিরুনী মাথা দোলায়। মুখ ঘুরিয়ে দূরে দৃষ্টিপাত করে। হটিটি পাখিটা তার মাথার ভেতর ডাকতে থাকে। নাকের ফুটো ফুলে-ফুলে ওঠে। ক্রমে কী এক অজানা ভয়ে তার শরীরটা কাঠ হয়ে যায়।

ধনহরি তার হাত ধরে কাছে টেনে ফিসফিস করে ফের বলে, আয়। শুই!

সে চিরুনীর বুকের মাংসে ফের হাত ঢোকাতে চেষ্টা করে। এবার চিরুনী ছটফট করে বলে, না।

লজ্জা কী? ধনহরি মোড়ল সাপের মতো শব্দ করে। ক্ষেতিটা কী? আমি বুড়োমানুষ! আমি বুড়োমানুষ।

চিরুনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে একটু একটু ফুঁপিয়ে কাঁদে। বার বার বলে, ম্না-ম্না-ম্না।

ধনহরি মোড়লও ছটফট করে বলে, আমার মনে সুখ নাই। শান্তি নাই। সাবিত্তিরি রে। মাথায় ঘায়ে আমি কুকুর পাগল। আমাকে একটুখানি শান্তি দে। তোর পায়ে পড়ি সাবিত্তিরি রে!

তারপর সে হাঁফাতে হাঁফাতে চিরুনীর পরনের কাপড়টা টানাটানি করে। চিরুনী চেরা গলায় চেঁচিয়ে কাঁদে—ম্না। কিন্তু ধনহরি মোড়লের গায়ের জোরে সে পারে না। মোড়লের থ্যাবড়া হাতটা তার মুখে পড়ে। মোড়ল সমানে গোঙায়—একটুখানি···এটুকুন···আমি বুড়োমানুষ। সাবিত্তিরি রে, তোর পায়ে পড়ি। এবং ধনহরি তার পায়েই পড়তে যায়।···

এ্যাই শালো!

শীতের রোদে গায়ে ঠাণ্ডাহিম লম্বাটে এক অতর্কিত ছায়া পড়েছে ধনহরি মোড়লের। সে ঝটপট নড়ে বসে। ছিটকে ঘোরে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

এ্যাই বুড়ো শালো!

ঢ্যাঙা উঁচু একটা কালো লোক, পরনে প্রায় কপনির মতো ন্যাকড়া, হাতে একটা কাস্তে—তার মাকুন্দে মুখে সূর্যটা জ্বলছে। তার মাথায় একটা ঘাসের বোঝাও আছে। কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে এবার কাস্তেটা বাড়িয়ে বলে, কেটে বিলের জলে ভাসিয়ে দোব।

চিরুনী ছাড়া পেয়ে শাড়িটা গুছিয়ে পরছে। ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। তাকে দেখে নিয়ে ঘাসকাটা লোকটা ফের বলে, বুড়ো ঢ্যামনা!

ধনহরি গোমড়া মুখে উঠে বসেছে। ঘড়ঘড় করে বলে, সম্পর্কে নাতনি। এটুকুন ঠাট্টাইয়ার্কি করছিলাম। তা তোমার কী বাপু?

চো-ও প! কাস্তে তুলে গর্জায় ঢ্যাঙা ভুতুড়ে চেহারার লোকটা। বলে, বাড়ি কোথা?

ধনহরি দাঁড়িয়ে পায়ে জুতো ভরতে ভরতে বলে, গুমুটি। গালমন্দ কোরো না—ভাল হবে না। আমার শালা ধামালিতলার বনমালী!

সে-কথায় কান না করে লোকটা চিরুনীকে বলে, ওগো বাছা। এ বুড়ো-শালার সঙ্গে জুটেছিলে ক্যানে?

চিরুনী ফুঁপিয়ে বলে, আমি মাসির বাড়ি যাব ধামালিতলা। মোড়লমশায় বললে যাবে—তাই।

ধামালিতলায় কে তোমার মাসি? নাম কি মেসোর?

চিরুনী চোখ মুছে বলে, বিন্দাবন।

ও বিন্দাবন! লোকটা লাল চোখে ধনহরিকে দেখে নিয়ে বলে, আর ই লম্পটের সঙ্গে যেও না। যাবে তো এস—আমি থাকি গড্ডাতে। ধামালিতলার পাশের গাঁ। যাবে আমার সঙ্গে? বিন্দাবনের বাড়ি আমি তো যাব না। ঘাস বেচতে যেতে হবে মেদিপুর বাজারে। তবে বউটা আছে ঘরে। সঙ্গে করে রেখে আসবে। যাবে?

চিরুনী মাথা দোলায়। তারপর বুক ফেটে কেঁদে বলে, যাব।

ধনহরি মোড়ল থপথপ করে বাঁধের ওপর উঠে যাচ্ছে। মোষের মতো ঝোপঝাড় ভেঙে। চিরুনী গড্ডা গাঁয়ের ঘাসকাটা লোকটার পেছন পেছন হাঁটে। লোকটা বলে, আমার সঙ্গেতে নির্ভয়ে এস মা-জননী। ভয় রেখো না। তবে কথা কী আমার সঙ্গেতে সুপথ পাবে না। জলকাদা ঝোড়-জঙ্গল ভাঙতে হবে। কষ্ট হবে এট্টুকুন।

লোকটার পিঠে দাদ। এ শীতেও ঘাম জমেছে। ঘাসের কুটো আটকে আছে। পাছার ফাঁক দিয়ে ন্যাকড়ার কপনি বেঁকে গেছে এব দুটো তাল উদোম। দুই ঢ্যাঙা জোরালো পা এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে। চিরুনীর খালি ভুল হয়, এই যেন তার মরা বাপের পেছন দিক। ওই তো সেই রকম দাদ, ঘামে ঘাসের কুটো, পাছার তালদুটোতে ঘষটানো কালো ছোপ। চিরুনী ধরা গলায় বলে, আমার কষ্ট হবে না। আমার কিছু •বে না।

আসলে সে বলতে চায়, এ রকম মাঠঘাট খালবিল বনবাদাড় ভেঙেই তো সে বেড়ে উঠেছে। এ রকম ভাবেই তো তার বাপের পেছন পেছন হেঁটেছে গুমুটির বিলের মাটিতে। লোকটার উদ্দেশে তার মাথা কুটতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার বাপটা! আমার মরা বাপটা। আবার কতদিন পরে তেমন নির্ভয়ে ও সুখে হাঁটছে চিরুনী!

লোকটা বলে, আমার নাম ভূষণো। গড্ডার ভূষণো। তোমার মেসো বিন্দাবনও আমাকে চেনে। এই তো সেদিন ওর জমিতে ধানকাটার মুনিশ হয়ে খাটলাম। এবার ধামালিতলায় ধানের খবর ভাল।

চিরুনী পাখির গলায় কলকলিয়ে বলতে থাকে, মাসির বাড়ি নতুন ধান উঠেছে তো। তাই মা বললে মাসির বাড়ি যা। নবান করে আয়। নবানের দিন বেউলোর পালা হয় ধামালিতলায়।

হয় বটে। হবে।

আমাদের জমিজিরেত নাই তো। তাই নবান করতে মাসির বাড়ি যাই। আঘুন মাসে নতুন ধান ওঠে। উঠোনে গোবরছড়া দেয় মাসি। আঙা মাটি দিয়ে ঘরের দেয়াল লাল করে। নতুন আতপ চালের আটা গুলে পদ্ম ফুল আঁকে মাসি। মা লক্ষ্মীর পা আঁকে। আম্মোও সেবার মাসির সঙ্গে এঁকেছিলাম।

তুমি এঁকেছিলে?

ঢোক গিলে শুকনো ঠোঁট চেটে চিরুনী বলে, হুঁউ। তারপরে... বলেই সে চুপ করে যায়। দূরে বাঁধের দিকে তাকায়। লোকটা ঘুরে বলে, কী?

আমার ফক!

ফক?

ফকটা মোড়লমশায়ের বেগে আছে।

থাক্। মাসিকে বললে নতুন ফক কিনে দেবে না?

দেবে।

তাইলে আর কথা কী? ও ফক ছুঁয়ো না।

ফকটা ছেঁড়াখোঁড়া।

তাইলে আর কথা কী? বলে ঘাসকাটা ভূষণো হলুদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হাঁটে। তারপর চলার গতি বাড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটু-খানি কষ্ট করে পা চালাও মা-জননী। মেদিপুর বাজারে যেতে বেলা হয়ে গেল।

পেছনে পাখির মতো উড়ে চলে মেয়েটা। মাসির বাড়ির রাঙানো দাওয়ায় বসে শীতের ধানের ভাপওঠা সুগন্ধ ভাতের কথাটা তীব্রভাবে আবার মনে পড়ে গেছে।

আলো

হরিমাটির কদমতলায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে শিবু রানাকে ইশারায় বলে যায়, দেরি হবে না। রানা বোবা-কালা ছেলে। শিবুর হিসেবে বছর বিশেক বয়স। তাগড়াই চেহারা। আড়াইমণী বস্তা একা ট্রাকের খোলে ওঠাতে-নামাতে একটুও হাঁফায় না। শিবু চলে গেলে সে আপন মনে নিঃশব্দে হাসে।

ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে হেমলতার বাড়ি যেতে যেতে শিবু ঠিকই টের পায় রানা হাসছে। ঘুরে গিয়ে দাবড়ানি দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সময় নেই।

একটেরে হেমলতার বাড়িটা একতলা পুরনো দালান। বারান্দা জুড়ে গ্রিল লাগানো হয়েছে চোরডাকাতের ভয়ে। উঠোনের ধানের মরাই আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হেমলতার কাছে নিজের প্রাণটার দাম বেশি। তার স্বামী তারানাথ ছিল রোগা মানুষ। চল্লিশের আগেই তার শরীরের ভাঙা খাঁচা গলিয়ে প্রাণপাখি আকাশে উড়ে গেছে। হেমলতা কোমরে আঁচল জড়িয়ে জোরালো-ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। স্বামীর মতোই সে যথেষ্ট সুদ খায়। তার মরাইয়ের একমণ ধান চাষীর খামার থেকে দেড়মণ হয়ে ফিরে আসে। তারানাথ যে ট্রাকটা লাখটাকায় কিনে রেখে গেছে, সেটার ভাড়ার হিসেবে পাইপয়সা শিবুর কাছে বুঝে নিতে হেমলতা কোমল হয় না। তার কাছে ব্যবসা হল ব্যবসা। ব্যবসার সঙ্গে ভাব-ভাল বাসার সম্পর্ক নেই।

একদিন শিবু দেখল, হেমলতার মেজাজ আর চেহারা দুইই কোমল। সরু নকশিপাড় একরঙা ফিকে নীল শাড়ি পরে বারান্দার খাঁচার ভেতর বসে আছে চেয়ারে। শিবুকে দেখে হাসল সে। আহা রে সুখের ময়নাপাখি!

শিবু সোজা বারান্দায় ঢুকে বলে, লোহাপুরে কাল গোটা দিনটা গচ্চা গেছে। টায়ারের অবস্থাও শোচনীয়। রাত ন'টায় গ্যারেজ থেকে বেরোলাম। তখন আর কী করব? থেকে গেলাম বদ্রীদাসের গদিতে।

চৈত্রের সকালবেলায় নিঃঝুম হয়ে আছে চারদিক। কোত্থেকে নিমফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। হেমলতা যেন কিছু শোনে নি, এমন ভঙ্গীতে বলে, বসো। চা-ফা খাবে নাকি?

নাঃ। একটা কথা বলতে এলাম।

গাড়িতে রানা নেই?

আছে।

তাহলে বসো। হেমলতা ওঠে। হাল্কা পায়ে উঠোনে নেমে যায়। তারপর শিবু দেখে, সে সদর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

শিবুর শরীরটা কেমন করে ওঠে। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। জুলপিতে পাক ধরেছে। এ বয়সে শরীরটা খুব মূল্যবান হয়ে ওঠে নিজের কাছে। ভেবেচিন্তে বাছাবিচার করে সে খাটাতে ইচ্ছে করে। সে হাসবার চেষ্টা করে বলে, রতন কোথা গেল?

বাজারে গেছে। ফিরতে দুপুর হবে।

নেত্যর মা?

ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ি গেছে—সেই রূপপুরে।

তাই বলো! শিবু সিগারেট বের করে।···তা অমন করে দরজা খুলে রেখেছিলে যে? চোরডাকাত ঢুকতে পারত।

হেমলতা চোখে হেসে বলে, দরজায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আসতে দেখছিলাম।

ও। বলে শিবু সিগারেট ধরায়। তার হাত কাঁপছিল। বরাবর কাঁপে। হেমলতা তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে দেখতে দেখতে বলে, তোমার আজ কী হয়েছে?

কী হবে? একটা কথা বলতে এলাম।

আজ আমার কথা শোনার মন নেই।

শিবু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে মুখ নামিয়ে বলে, মনের কথা যদি বলো, আমারও নেই। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মশা ছিল না। কিন্তু চারদিকে বস্তাভর্তি খন্দের গন্ধ। ভাবলাম গাড়িতে গিয়ে শোব। তো রানাকে ওঠানো কঠিন।

হেমলতা আস্তে বলে, এবেলা ঘুমিয়ে যাও। বিছানা করে দিই।

রানা?

রানা মরুক! বলে হেমলতা ঘরে ঢুকে যায়।

শিবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে ঘামে। তারানাথের গন্ধ এ বাড়িতে এখনও মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে আসে। সেটা ওই নিমফুলের মতো নয়। ঘাম ও রক্তের কটু গন্ধ। শিবুর বাবা ভরত তারানাথের বাবা ক্ষেত্রনাথের মাহিন্দার ছিল। জমিজমা গরুবাছুর দেখাশোনা করত। প্রয়োজনে বাড়ির জন্য ইঁদারা থেকে জলও তাকে তুলতে হত। খাটতে-খাটতে ভরত যক্ষ্মারোগে মারা পড়ে। ক্ষেত্রনাথ কালীতলায় তার নিজের বাড়িতে রেখে এসেছিল। মাঝে মাঝে গিয়ে দু'চার টাকা দিয়ে আসত। কখনও কয়েকটা

কল-পাকড়। সে শিবুকেও চেয়েছিল। শিবু বাড়ি পালিয়ে এই রুটে মোটর-গাড়ির ড্রাইভারদের সঙ্গে ঘুরত। তাদের পা টিপে দিত। পাকা চুল তুলত। কেউ-কেউ তাকে রাতবিরেতে জড়িয়ে ধরে শুয়েও থাকত। শিবুর চেহারাটা তখন ভারি নরম আর মেয়েলি ছিল। সেই সব কষ্ট, শারীরিক অপমান আর জলবায়ুর ঘা খেয়ে শিবু পরবর্তী সময়ে খুব পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

এখন শিবু কালীতলায় সব চেয়ে পয়সাওলা লোক। দশ বিঘে ধানী জমি, ছোটখাট পুকুর, একটা জাঁতাকলের মালিক। তারানাথের এই ট্রাকটা শেষপর্যন্ত কিনে নেওয়ার স্বপ্নও দেখে সে। একটু ধৈর্য ধরলে স্বপ্নটা সফল হবে ভেবে হেমলতার খেয়াল বরদাস্ত করতে পিছপা নয়। এখনও সে নিজে ড্রাইভারি করে। এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় মাল পৌঁছে দিয়ে ভাড়া কামায়। ফি-মাসে হেমলতাকে শুধু হাজার চারেক টাকা গুণে দিয়েই খালাস। মেরামত, ডিজেল সব খরচ তার। কিন্তু দৈবাৎ চাইলে হেমলতা ধার হিসেবে হাত উপুড় করে এবং এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে হেমলতা সুদ চায় না।

চায় না, কিন্তু অন্যভাবে উসুল করে তো নেয়ই। শিবুর শরীর। ভাব-ভালবাসার কথা অবান্তর। শিবু ওসব কথা আদপে ভাবে না। তাছাড়া হেমলতা কিছু আহামরি চেহারার মেয়ে নয়। খুব সাবধানে সে যৌবনের দড়ি ধরে একটা মারাত্মক সাঁকো পেরুচ্ছে, তলায় গভীর খাদ। গায়েগতরে যতখানি ছিল, তারানাথ—রোগা, কিপটে, সন্দেহপ্রবণ তারানাথ সেটুকু জ্বালিয়ে ছাই করে গিয়েছিলো। সেই ছাই থেকে আবার সবুজ ঘাসের মতো কিছু একটা গজিয়ে উঠেছে হেমলতার শরীরে। তবু শিবুর চোখে তত রঙ ধরে না।

হেমলতার ডাকে শিবুকে যেতে হল। সিগারেট ঘসটে মেঝেয় নিভিয়ে ঘরে ঢুকে সে দেখল বিশাল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হেমলতা আলগোছে চুলটা বেঁধে নিচ্ছে। বলল, ঘুমিয়ে নাও। রান্না চাপাই গে। খেয়েদেয়ে যাবে। রানাকেও ডেকে আনবে'খন।

শিবু বিছানায় তারানাথের সেই গন্ধটা পায়। কিন্তু কী আর করা! পা ঝুলিয়ে বসে বলে, চারটে টায়ার না বদলালে নয়। নৈলে গাড়ি বসে যাবে। কী গাড়ি কিনেছিল মাইরি তারাদা! সেই নতুন থেকে হাল্লাক করে দিলে।

হেমলতা কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর ঝাঁপির তলা থেকে চাবি বের করে। আলমারি খুলে সে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করে ড্রেসিং টেবিলে রাখলে শিবু বোতলটা দেখে বলে, যা ছিল তাই। খাওনি দেখছি।

ঘুম এলে একটু খাই।

মনে তো হয় না।

মাসখানেক আগে ব্র্যাণ্ডির পাঁইটটা শিবু এনে দিয়েছিল। ঘুম হব না বলেই তখন ওষুধ-খাওয়া করে খায়। শিবু বলেছিল, জল মিশিয়ে নিও। প্রথম-প্রথম একটু খারাপ লাগবে। তারপর সয়ে যাবে।

হেমলতা তাকে অবাক করে দিয়েছিল। শিবুর সন্দেহ হত, তারানাথের বউ কোন ঘরের মেয়ে?

শিবু দেখেছে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা সবকিছু ঝটপট শিখে নিতে পারে। হেমলতা কাচের গ্লাসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সঠিক পরিমাণে জল মিশিয়ে শিবুকে দেয়। শিবু বলে, তুমি?

আমি কি ঘুমুব নাকি?

শিবু হাসে। তুমি কি ভেবেছ এটা ঘুমের ওষুধ? এ তো মদ।

জানি।

শিবু গেলাস এগিয়ে বলে, তুমি প্রসাদ করে দাও।

হেমলতা আস্তে বলে, বাব্বা। তারপর একচুমুক গিলে খাটের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। শিবুর খাওয়া দেখে। চোখে হাসি।

গেলাস শেষ করে শিবু বলে, খেলাম তো ভাল করেই খাই। দাও…

কিছুক্ষণ পরে হেমলতার বুকের ওপর শুয়ে শিবু বলে, হাজার বিশেক টাকা দেবে?

কী?

চারটে টায়ার বদলাতে হবে। আরও কিছু টুকিটাকি কাজ আছে। মাইবি বলছি।

অত টাকা কোথায় পাব? সেই তিন হাজার তো এখনও শোধ দিলে না।

ওটা ধান বেচে এমাসেই দেব। দর বাড়ার পথ তাকিয়ে আছি।

হেমলতা চোখ বুজে তার পিঠে হাত বোলায়। শিবু টের পায়, আনমনা হাত। একটু পরে হেমলতা চোখ খুলে বলে, শুধু কি টাকার কথা বলতেই আসো তুমি?

না। গাড়িটা যে…

বেচে দাও।

বেচলে লোহালক্কড়ের দামও আসবে না।

আমার মতো?

যাঃ। কী বলছ? অনেক দাম তোমার।

সে তো বুঝতেই পারছি!

শিবু তাকে ভালবাসা বোঝাতে থাকে সারা শরীর দিয়ে।…

বেলা গড়িয়ে আট কিলোমিটার রাস্তা আস্তে-সুস্থে গড়াচ্ছিল শিবুর খালি ট্রাক। মনটা তেতো। টায়ার না বদলালে গাড়ি যেকোনো সময় বসে যাবে যেকোনো জায়গায়। পরের লাখটাকা দামের মাল বোঝাই থাকবে। আজকাল রাহাজানি যা বেড়েছে।

কালীতলা দুই রাস্তার চৌমাথায় ছোট্ট গাঁ ছিল। এখন একটা বাজার-মতো হয়েছে। বিদ্যুৎ এসে রাতটা ঝলমলিয়ে তুলছে ক'বছর থেকে। লোড-শেডিংয়ের দৌরাত্ম্য আছে। তখন অন্ধকারে আগের সময় ফিরে আসে। চার-পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। পুরনো বটগাছ ঘন কালো হয়ে পুরনো কথা বলতে থাকে ফিসফিসিয়ে। এটাই ছিল ঠ্যাঙাড়েদের ঘাঁটি—নির্বংশতলা। বড় ভয়ের জায়গা। পরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নাম দেওয়া হয়েছিল কালীতলা।

শিবু জানে, চৌমাথার আনাচে-কানাচে জমি কিনে রেখেছে বড় ব্যবসায়ীরা।

শিবুর শ্বশুর ঘনশ্যাম এসে মেয়ের শিয়রে না দাঁড়ালে শিবুকে ট্রাক ছেড়ে দিতে হত। মাসের মধ্যে আদ্ধেকদিন না বসে গেলে ট্রাকটাও তাকে হাজার বারো ফিমাসে যোগাত। লাল হয়ে যেত শিবু।

তার জাঁতাকলের পাশে ফাঁকা জমিটাতে গাড়ি রেখে শিবু বাড়ির দিকে হাঁটে। রানা এখন চায়ের দোকানে গিয়ে লোকের সঙ্গে নিজের ভাষায় ফক্কুড়ি করবে। ক্যারিকেচার দেখাবে চেনা লোকের। ও খুব জনপ্রিয়।

বাড়ি ঢুকে শিবু হাই তুলে এবং আড়ামোড়া দিয়ে বলল, চান করব।

এই ভিটেতে বাঁকাচোরা মাটির দেওয়ালের মাথায় টুটাফাটা খড়ের চাল ছিল একসময়। খড়গুলো অনেক বর্ষার জল খেয়ে শাদা হয়ে গিয়েছিল। শিবুর মা কঞ্চি হাতে নিয়ে সারাক্ষণ পাখি তাড়াত। বৃষ্টির রাতে শিবুকে তুলে দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদত। শিবুর বাবা ভরত তখন হরিমাটিতে ক্ষেত্রনাথের বাড়ির খড় কাটা ঘরে চটে শুয়ে ঘুমুত। ঘুম কি আসত? নিশ্চয় না।

এখন একতলা ঝকঝকে দালান তুলেছে শিবু। চারটে ঘর, একটা কিচেন—

ডাইনিং টেবল পর্যন্ত। উঠোনে টিউবেল আর ফুলের গাছ। আড়ালে লোকেরা বলে, তারানাথের পয়সা। কে না জানে, তার বিধবা শিবুর রক্ষিতা। দু' হাত উপুড় করে ভালবাসার দাম মেটায় শিবুকে।

শিবুর বউ কুসুম স্কুল ফাইনাল ফেল করা মেয়ে। বছর দশেকের তফাত বয়সে। শিবু কষ্টেসিষ্টে নাম সই করতে পারে। খিটিমিটি বাধলে বলে, জানই তো আমি মুর্খ ইলিটারেট লোক। শুদ্ধ কথা মুখে আসে না বলেই হাত চলে।

কিন্তু মেয়েমানুষের বড় চাওয়া তো ভাতকাপড়। সে তুমি পুষিয়ে পাচ্ছ। হাজার-হাজার টাকা নাড়াচাড়া করচ—এই তোমার ভাগ্যি। চুপ করে বসে থাকো।...বলে শিবু বেরিয়ে যেত।

কখনও বলত, হুঁ—মেয়েমানুষের আরও একটা জিনিস চাইবার থাকে। সেটা হল খোকাখুকু। কিন্তু সেকি আমার দোষ? তোমার পেটে যদি না সয় আমি কী করব?

তিন-তিনবার পেটে এসে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা ঘুরে এসে কুসুম এখন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। শিবু জানে না, এখনও দেব-দেবতা বা পীরের থানে যায় কিনা কুসুম। হয়ত যায়। তার কিছু করার নেই।

বেলা পড়ে আসছিল। মাঠের দিকে ফিকে লাল রোদের ছটা খেলছিল। ইটভাটার কাছে শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ু হাতে। খিড়কিতে উঁকি মেরে দেখে শিবু ফের বলল, চান করব। শালা। গা ঘিনঘিন করছে সারাটা দিন। কুসুম বলে, হরিমাটিতে চান করে এলেও পারতে।

শিবু খুকখুক করে হাসে।...পারতাম। মাগীকে হাজার বিশেক টাকা চাইতে গিয়েছিলাম। ছট পাততেই দিল না। নেবে তো ডাকাতে লুটেপুটে। ওটা আবার কাকে জোটালে?

একটা অচেনা মেয়ে টিউবেল থেকে জল ভরছে সিমেন্টের চৌবাচ্চায়। ওটাই শিবুর বাথটাব। গলা ডুবিয়ে বসে থাকবে।

কুসুম বলে, জোটালাম। অত করে বলি, নানা জায়গায় ঘোরো—একটা দেখে এনো। খাটতে খাটতে আমার এদিকে হাড়ির হাল।

শিবু দেখছিল। বছর পনের-ষোল বয়স হবে মেয়েটার। সম্ভবত ফ্রক পরে থাকত। কুসুম তাকে নিজের শাড়ি পড়তে দিয়েছে। পরার ভঙ্গিতে অনভ্যাসের গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। গোলগাল মুখ, শরীর ঈষৎ চ্যাপ্টা। এসব মেয়েরা যেমন হয়—তেমনি।

শিবু কাছে গিয়ে বলে, কী নাম গো তোমার ?

মেয়েটা অদ্ভুত নির্বিকার মুখ করে আস্তে বলে, আলো।

আলো। শিবু হাসতে হাসতে শার্ট গেঞ্জি, তারপর প্যাণ্টটা খুলে ফেলে দেয়। আণ্ডারউয়্যার পরা অবস্থায় চৌবাচ্চায় নামে। কুসুম সাবানের কৌটো আর তোয়ালে রেখে বলে, আলো! কেটলিতে জল চাপিয়ে এসেছি। সকালে যেমন করে দেখালাম তেমনি করে চা করবি। যেন তেতো না হয়। আর শোন, দুধটা গরম করে তবে মেশাবি। যেমন করে দেখালাম তখন।

শিবু বলে, উরে বাস! পেয়েই তালিম দিতে শুরু করেছ। কোত্থেকে জোটালে ?

কুসুম চৌবাচ্চার পাড়ে বসে চাপা গলায় বলে, বণ্টুবাবু এসেছিল সাঁইথে থেকে। মাসখানেক রাখল। তারপর বণ্টুবাবুর বউ কাল রাতে ঝাঁটা মেরে বের করে দিয়েছে।

সে কি! চুরিচামারি করেছিল বুঝি ?

কান না করে কুসুম ফিসফিসিয়ে বলে, সারারাত কালীতলায় কাটিয়েছে। ভোরে বাবা গিয়ে দেখেন, বসে আছে ওখানে। বাবার স্বভাব তো জানো ?

শিবু লম্বা চৌবাচ্চার দু'ধারে দুটো হাত রেখে আকাশে মুখ করে বলে, তা এত লুকোছাপা করে বলছ কেন ?

কুসুম একবার ঘুরে আলোকে দেখে নেয়। রান্নাঘরে কেটলির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কুসুম বলে, বণ্টুবাবুর বউ প্রায় দেখত আলোর দিকে রণ্টুবাবু কেমন চোখে তাকায়। কাল রাতে ঘুম ভেঙে দেখে, বাবুমশাই পাশে নেই। আলো থাকে বারান্দায়। রণ্টুবাবু ওর কাছে গিয়ে শুয়ে ছিল নাকি। সত্যিমিথ্যে জানি না—তবে···

শিবু একটু হাসে। ···মেয়েটা চ্যাচামেচি করেনি ? কী যে বলো! অতটুকু মেয়ে—ভয়ে লজ্জায় চুপ করে না থেকে পারে ?

বলা যায় না, হয়তো নিজেরও সায় ছিল।

কুসুম এক খাবলা জল তুলে ওর মুখে মারে। ···ছিল! অতটুকু মেয়ে! লোকটা তার বাপের বয়সী!

শিবু রসিকতার সুরে বলে, রণ্টুবাবুর বউ কী অবস্থায় দেখেছিল দুজনকে ?

রাগ করে কুসুম উঠে যায়। শিবু চৌবাচ্চার ভেতর ব্যাঙের মতো ভেসে থাকে কিছুক্ষণ। দম আটকে এলে চিত হয়। আকাশের দিকে তাকায়।···

অনেকদিন পরে একটা কাজের মেয়ে পেয়ে কুসুম বর্তে গেছে যেন। শিবু জানে, এসব কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেমেয়ের জাতের কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কিন্তু কুসুমের কীভাবে বিশ্বাস হয়ে গেছে, আলো ভাল জাতের মেয়ে। হয়তো সেটা রণ্টুবাবুদের দরুন। কুসুমের খবর হল, আলো ওদের বাড়ি রান্নাবান্না করত। সবাইকার পাতে পরিবেশন করত। তখন আর কথা কী? কুসুম তার হাতে রান্নাঘর ছেড়ে দিয়েছে। একটু তফাতে মোড়ায় বসে শুধু ফরমাস।

কিন্তু রানার ব্যাপারে কুসুমের খুঁতখুঁতেমি এখনও যায় নি। তার বিয়ের আগে থেকে রানা শিবুর অনুচর। শিবু তাকে ছোটবেলায় কুড়িয়ে এনেছিল কাঁদির বাসস্ট্যাণ্ড থেকে। হয়তো নিজের জীবনের সঙ্গে কিছু মিল দেখে থাকবে। শিবুকে বোঝা কঠিন।

রানাও টের পায়, শিবুর বউ তাকে একটু ছি-ঘেন্না করে। সে উঠোনে বসেই খাওয়া পছন্দ করে। খাওয়ার জায়গায় সে জল ছেটায়। নিজের থালাবাটি গেলাস নিজেই পুকুর থেকে ধুয়ে আনে। যে-ঘরটা শিবু গুদোম হিসেবে ব্যবহার করে, সেই ঘরের তাকে সেগুলো যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। তারপর থ্যাবড়া হাতের আঙুলে সিগারেট বাগিয়ে টান দিতে দিতে আপনমনে দোলে। এই এক অভ্যাস।

কদিন পরে শিবু লক্ষ্য করল, আলোকে মেজেঘষে চকচকে করার তালে আছে কুসুম। কিন্তু মেয়েটা সেইরকম নির্বিকার। মানুষ যখন, তখন সে হাসতে পারবে তো। আলো হাসতে পারে না। প্যাটপ্যাট করে কেমন তাকায়। আস্তে কথা বলে—সেও নেহাত দরকারে। নতুন শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সে জড়ানো পায়ে কষ্টে হাঁটছে। কুসুম মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

ট্রাকে যেতে-যেতে রানা আলোর ব্যাপারটা চমৎকার অভিনয় করে দেখাল। শিবু হেসে খুন। তারপর ইশারায় বলল, বিয়ে করবি আলোকে?

রানা কেমন গুম হয়ে গেল। শিবু যতবার ওর দিকে তাকায়, চোখে চোখ পড়লে রানা চোখ নামায়। কিছু বঝতে পারে না শিবু। এত বছর ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, তার এই হাবভাবের মানে আঁচ করা যায় না। শিবু খাপ্পা হয়ে বলে, কী? তারপর স্টিয়ারিং থেকে ডান হাতটা তুলে থাপ্পড় দেখায়।

খানিক পরে রানা গোঁফ এবং টাক দেখায়। তারপর অশ্লীল একটা ভঙ্গি করে। তখন শিবু বঝতে পারে, টেকো এবং গুঁফো একটা লোক—তার মানে রণ্টুবাবু যাকে নষ্ট করেছে, তাকে রানা বিয়ে করবে না। শিবু

অবাক হয়ে যায়। বোবা-কালাদেরও তাহলে এই নীতিবোধ আছে? কিন্তু রানা কীভাবে জানল ব্যাপারটা?

শিবুর পক্ষে এ রহস্য বুঝতে দেরি হল না। কালীতলার ছোট্ট বাজার জুড়ে ঘটনাটা জোর রটে গিয়েছিল। কেউ রানাকে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে শিবু কেমন একটা খারাপ গন্ধও পাচ্ছিল। একে তো তার চরিত্রের কিছু বদনাম বরাবর আছে, তার ওপর অমন একটা নষ্ট হওয়া মেয়ে তার বাড়িতে জুটেছে—লোকেরা মুখরোচক খিস্তির সুযোগ পেয়ে গেছে। আজকাল তাকে দেখে লোকেরা মুখ টিপে যে হাসে, তার কারণ তাহলে এই!

শিবু রেগে গেল ভেতর-ভেতর। মেয়েটাকে তাড়াতেই হবে। প্রেম না করুক সে, এ জীবনে অনেক মেয়েমানুষ ভোগ করেছে—তারা আহামরি ধরনের সুন্দরী না হলেও ফেলনা নয়। তবে অনেক পুরুষের মতি টলাতে পারত। তাদের তুলনায় এই ষোল বছরের ঢ্যাপসা বেঢপ নাবালিকা। শিবুর মনে আগুন জ্বলে ধিকিধিকি। লোকেরা এত ছোট এত বাজে মানুষ ভাবে শিবুকে! নাকি সে মুনিশ-মাহিন্দার ভরতের ছেলে বলেই এমন তুচ্ছ জীব এ পৃথিবীতে? তার যেন রুচি থাকতে নেই! হুঁ, সে লেখাপড়া জানে না। কিন্তু কী আছে লেখাপড়ায়? লেখাপড়া-জানা লোকের চেয়ে পৃথিবীর অনেক কিছু সে কি কম বোঝে? লেখাপড়া জেনে হাতে চাকরির দরখাস্ত নিয়ে কারু পেছনে তাকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত। তা বেড়ায় নি, রক্ত জল করে খেটে পয়সা জমিয়েছে, বুদ্ধিসুদ্ধি কম খাটিয়েছে? তাই তার জমিপুকুর জাঁতাকল হয়েছে। এমন একটা সুন্দর বাড়ি হয়েছে। ভবিষ্যতে সে কালীতলায় একজন বড় আড়তদারও হবে। গদিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকবে বদ্রীদাসজির মতো। গুদাম থেকে বস্তা এনে মুটেরা তারাজু-কাঁটায় চাপাবে। কয়াল ওজন হাঁকবে সুর ধরে, রাম রাম…রামোকে রাম…দুই দুই…দুয়েকে দুই…তিন তিন…তিনো তিন…

ওদিকে শিবুর ঘানিকলের সামনে ট্রাক থেকে সরষের বস্তা নামবে—সে এক পাহাড়। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে 'শিবচরণ অয়েল মিল'।

স্পষ্ট দেখতে পায় শিবু। সেই দেখার ওপর ধ্যাবড়া আলকাতরার মতো কলঙ্ক লেপতে চাইছে লোকেরা। ভাবছে, ভরতের ছেলের যে এতসব হয়েছে তা হরিমাটির এক 'রাঁড়ীর' টাকায়। শিবুর ভেতরে এই এক পুরনো জ্বালা—তার ওপর রন্টুবাবুর নষ্টকরা মেয়েটার জন্য ফিসফিস গুজব আগুন চাপিয়ে দিল।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে শিবু কথাটা সরাসরি তুলল কুসুমের কাছে। কুসুম পাশ ফিরে শুয়ে ছিল—ওইরকম থাকে সে। শিবু আস্তে বলে, ওকে কাল চলে যেতে বলো।

কাকে?

তোমার আলোকে।

কুসুম চিত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বলে, কী বললে?

ঠিক বলছি। শিবু গলার ভেতর বলে। একটা নষ্ট মেয়েকে জায়গা দিয়ে বড্ড কেলেংকারি রটেছে।

কে নষ্ট? আলো? কুসুম বালিশে কনুই রেখে মাথা তুলল। সাপের ফণা তোলার মতো। ···ছিঃ! তুমি না ওর বাপের বয়সী! এসব কথা মুখে বলতে তোমার বাধল না? একটা মা-বাবাহারা অনাথ মেয়ে—মাথা গোঁজার এতটুকু জায়গা নেই। যেখানে যায়, রাক্ষসের পালের নোলা দিয়ে নাল গড়ায়!

আঃ! চুপ করো তো। এত কথার কী আছে? ওকে ভাগিয়ে দাও।

কুসুম অন্ধকারে শিবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হিসহিস করে বলে, বেশ। আলো যাক ওই দোর দিয়ে, আমিও যাই এই দোর দিয়ে।

তার মানেটা কী?

যাব না তো কী করব? এই রোগা শরীরে তোমার সংসারে খেটে মারা পড়বার জন্য জন্মেছিলাম?

আহা। কান্নাকাটির কী আছে? আমি কাজের লোক এনে দেব।

সে তো পনের বছর ধরে শুনছি।

এবার ঠিক এনে দেব। ওকে বিদেয় করো। ভালর জন্য বলছি।

কুসুম ফের কাত হয়ে শোয়। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শক্তভাবে বলে, না।

শিবু বলে, রানার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখা যেত। কিন্তু রানা ওকে বিয়ে করবে না।

দিচ্ছি ওই ভূতের সঙ্গে বিয়ে। জাতের ঠিকঠিকানা নেই···

মানুষের আবার জাত! শিবু বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট নেয়। সিগারেট ধরিয়ে ফের বলে, বেশ। তাহলে আমিই বরং বাড়ি আসা ছেড়ে দেব।

দেবে সে তো ভালই জানি। নেহাত বাবার খাতিরে। তুমি যে একদিন হরিমাটিতে থাকবে, কে না জানে এ কথা? তোমার ভবিষ্যৎ ওই খানকির বাড়িতে বাঁধা। সবাই জানে।

শিবু আস্তে বলে, ছিঃ! আগের মতো সে এত ঝগড়া করতে পারে না বউয়ের সঙ্গে। তার ওপর শ্বশুরমশাই পাশের ঘরে আছেন। ঘনশ্যাম এ বাড়ি আসার পর শিবু একটু সাবধানে মেজাজ করে। ঘনশ্যাম পাঠশালায় মাস্টারি করতেন। জামাইয়ের সংসারের হাল সামলাতে ছুটে এসেছিলেন। শিবু ভবিষ্যতের কথা ভাবতে মন দেয়। কালীতলায় আড়তদার মহাজন হবে। গদিতে ফোমের ম্যাট্রেস শাদা চাদরে ঢাকা। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে বদ্রীদাসজির মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি। হাতে কয়েকটা ধাতুবসানো আংটি। খন্দের বস্তা, তেলের পিপে, ঘানিকল, বিশাল তারাজু।

শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, পয়মন্ত মেয়ে। এবার জোর বর্ষা আসবে। কোথায় কী? ধুধু মাঠে লু হাওয়া বয়ে যায় দিনমান। তার মধ্যে কাঁদি থেকে খবর এল কুসুমের দিদি মরণাপন্ন। ইউটেরাসে ক্যান্সার। কলকাতার ডাক্তার জবাব দিয়েছে। ঘনশ্যাম মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই গেলেন।

যাবার সময় কুসুম আলোকে পইপই করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল সংসারের খুঁটিনাটি। বাবু কী খেতে ভালবাসে, কতটা ঝাল-ঝোল, সে-সবও। আলো নির্বিকার মুখে বলল, আচ্ছা।

কুসুম ফাঁকিবাজ রাখাল ছোঁড়াটার দুষ্টবুদ্ধিগুলোও ফাঁস করে গেল আলোর কাছে। আর ঘনশ্যাম বলে গেলেন জামাইকে, কালু বড্ড ময়দা চোর। কলে গিয়ে একটু বসে থেকো।

ময়দাকলে রানাকে পাঠায় শিবু। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে গুম হয়ে সিগারেট টানে। আলো কোমরে আঁচল-বেঁধে সংসারে ঘুরে বেড়ায়। পেছনে গোয়ালঘরে গিয়ে রাখালটার সঙ্গে কী সব কথা বলে। ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। শিবু অবাক হয়ে ভাবে, এ কে তার সংসারে খবরদারি করে বেড়াচ্ছে? ভারি অদ্ভুত তো!

মেয়েটাকে এতদিনে খুঁটিয়ে নিরাপদে দেখার সুযোগ পেয়েছে শিবু। কুসুম থাকতে সোজাসুজি তাকাতে কেমন বিব্রত বোধ করত। এখন দেখে, যতটা কুৎসিত ভেবেছিল, ততটা কিন্তু নয়। গোলগাল মুখের গড়ন, সরু নাক। বড়-বড় চোখ, ছোট্ট চিবুক। রঙটা ফর্সা না হলেও চেকন-চাকন। একটা দীপ্তি ঝকঝক করছে—সেটা শিবুর সংসারের সুখের প্রতিফলনও হতে পারে।

শিবুর চোখে ঘোর লাগে। তার বাড়ি সত্যি ঝকমকিয়ে তুলেছে মেয়েটা। ঠোঁট কামড়ে বঁটিতে তরকারি কুটছে গিন্নির মতো। শিবু ডাকে, আলো!

উঁ?

বেশি কিছু ঝামেলা কোরো না। আমার খাওয়া তো দেখেছ।

আলো মাথাটা একটু নাড়ে। দেখেছে।

শিবু একটু হেসে বলে, তুমি এত মুখচোরা কেন গো? কথাবার্তা বলো না কেন?

আলো আপনমনে মুখ নিচু করে ঝিঙের খোসা ছাড়ায়। কিছু বলে না।

সাঁইথেতে কোথায় থাকতে?

একটা বাড়িতে।

চলে এলে কেন?

আলো আস্তে বলে, লোক খারাপ।

খারাপ লোক? রণ্টুবাবুর মতো? হা হা করে হেসে ওঠে শিবু।

আলো কিছু বলে না। পেতলের গামলায় জল ঢেলে তরকারি ধুতে থাকে।

শিবু বলে, আর আমি? আমাকে কেমন লোক মনে হয়?

ভাল।

শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! শিব আরও জোরে হাসে।

দুপুরে বেশ গিন্নির মতো শিবুকে খেতে দেয় আলো। শিবু তৃপ্তি পাচ্ছে এমন ভঙ্গী করে খায়। খাওয়ার পর যখন ভাতঘুমের জন্য বিছানায় গড়াচ্ছে, কাত হয়ে দেখে, গালে এক হাত রেখে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসেছে আলো। ঢোক গেলার সময় চোখ বুজছে প্রতিবার। এত আস্তে খায় কেন মেয়েটা?

রাতেও সেইরকম। কথা বলার চেষ্টা করেছে শিবু। ওর বাবা-মায়ের কথা জানতে চেয়েছে। কিছু জবাব পায় নি। বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে শিবু। রানার অভ্যাস ট্রাকে শোয়া। বাড়ি নিঝুম। জ্যোৎস্না শাদা হয়ে পড়েছে উঠোনে। ফলসফলের গাছ হাওয়ায় তোলপাড় হচ্ছে। শিবুও।

খাটের তলায় এটাচির ভেতর লুকিয়ে রাখা হুইস্কির পাঁইটটা বের করে সে। অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খায়। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! বিড়বিড় করে বলে শিবু। খিকখিক করে হাসে। তারপর কী এক হিংসায় ফুঁসে ওঠে।

একটু পরে কুসুমের সাজানো সংসার লাথি মেরে ভেঙে ফেলার ভঙ্গিতে টলতে টলতে সে ওঠে।

পাশের ঘরে আলো শোয়। শিবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে আস্তে ডাকে, আলো! আলো।

একটু পরে ভেতর থেকে সাড়া আসে ঘুমভাঙা গলায়—কী?

দরজা খোল।

শিবুর মুখের ওপর দরজা খুলে যায়। অমনি শিবু অবাক হয়। আবছা আঁধারে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর গলার ভেতর বলে, বললাম আর খুলে দিলি? তুই তো ভারি অদ্ভুত মেয়ে মাইরি।

আলো চুপ করে থাকে।

কথা বলছিস না যে? আমি বললাম আর তুই দরজা··আমাকে তোর ভয় করছে না?

না।

করছে না? এই যে আমি এত রাতে তোকে ডাকলাম, তোর ভয় করল না? কেন? কেন করল না বল্! শিবু চৌকাঠ দুধারে আঁকড়ে ধরে ঘরের ভেতর ঝুঁকে পড়ে। তোর মুখ থেকে আগে জবাব শুনে তবে কথা। এই শিবচরণ একজন লম্পট। শিবচরণ একটা শুওরের বাচ্চা। এই শিবচরণকে—ভয় করল না?

আলো আস্তে বলল, আপনি আমার বাবার মতো।

এ্যাই। শিবু চেঁচিয়ে ওঠে, এ্যাই! ঠিক এই কথাটা তোর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ—বাবার মতো। মতোই বা কেন? আমি তোর বাবা। বাবাকে ভয় করতে নেই বলেই রাত বিরেতে ডাকলাম আর ব্যস! দরজা খুলে দিলি। কেন দিবি না? আলবাৎ দিবি। বাবা ডাকবে আর দরজা খুলবে না মেয়ে—এ কি কথা!

বাবা, আপনি মদ খেয়েছেন।

শিবু কানে নেয় না। রাতের জ্যোৎস্না আর হাওয়া তোলপাড় করে বলে, এই কথাটা শালাশালীদের শোনাতে হবে। কাল বাজারে লোক ডেকে জড়ো করব। তুই সবার সামনে আমাকে বাবা বলে ডাকবি তবে কথা!

আলো তার হাত ধরে টেনে বলে, ঘুমোবেন—চলুন তো! মা বলে গেছে, তোর বাবা যদি বদমাইসি করে, তাকে কষে থাপ্পড় লাগাবি। সত্যি বলছি, আপনি না শুলে···

থাপ্পড় লাগাবি? হা হা করে হাসতে হাসতে শিবু বসে পড়ে। লাগা থাপ্পড়। এই বেজন্মা শিবুকে যত খুশি থাপ্পড় মার। আমি তোর হাতের মার খেতে খেতে মরে যাই। আমার শালা মরাই উচিত। আমি মাইরি কী! এ্যাঁ?

এতদিন পরে মাতাল শিবু মেয়েটার হাসি শোনে। আলো হাসতে হাসতে তাকে টেনে ওঠায়। গায়ে জোর আছে তো মেয়েটার। তাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ঠেলে ফেলে। আছাড় খাওয়ার মতো পড়ে শিবু ককিয়ে ওঠে। তারপর ভাঙা গলায় বলে, এ শিবু আর হরিমাটি যাবে না। গাড়ি চালাবে না। কালীতলায় খিতু হয়ে বসবে। শিবুর বউ জন্মো দিতে পারে নি তো কী হয়েছে। ওই রানাটা আমার ছেলে আর আলোটা আমার মেয়ে।...ওই রানাটা আমার ছেলে আর এই আলোটা আমার মেয়ে। ওই রানাটা আমার ছেলে আর আলোটা...

বিড়বিড় করতে করতে সে থেমে যায়। বুকে হাত চেপে শুয়ে থাকে। আলো আস্তে বলে, ঘুমোন।

দিনচারেক পরে বাড়ি ফেরে কুসুম একা। ঘনশ্যাম বড়মেয়ের মৃত্যুর পর বড় জামাইকে সান্ত্বনা দিতে থেকে গেছেন। কুসুমের মন পড়েছিল নিজের সংসারে। বাড়ি এসেই ধুপধুপ পা ফেলে হন্তদন্ত আলোর কাছে গিয়ে চুপিচুপি বলে, ভালো ছিলিস তো তোরা? কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো? বদমাইসি করে নি তো তোর বাবা?

আলো একটু হাসে।

কুসুমের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এই প্রথম হাসি দেখছে আলোর মুখে। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বলে, করেছিল? তোকে যে বলে গেলাম কষে গালে থাপ্পড় মারবি। ওর মা-মাসি জ্ঞান থাকে না! বলে গেলাম না হারামজাদী মেয়ে?

আলো কিছু বলার আগেই ঘর থেকে শিবু ভরাট গলায় ডাকে, মা আলো! কার সঙ্গে কথা বলছ গো?

আলো বলে, মা এসেছে।

শিবু বেরিয়ে এসে বলে, খারাপ খবর পরশু সন্ধেয় পেলাম। রমণীদা বললেন। তো ভাবলাম, যাই। কিন্তু মেয়েটা আবার একা থাকবে—যা দিনকাল পড়েছে। কুসুম ভারি গলায় বলে, একবেলার জন্যে গেলেও পারতে। দিদি

তোমাকে দেখতে চেয়েছিল। গাড়ি নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ আর ওইটুকু রাস্তা।

শিবু আড়মোড়া ছেড়ে বলে, গাড়ি ফেরত দিয়েছি। কাঁহাতক আর গচ্চা দেব? আজ দেখলাম ধনেশকে দিয়েছে। মরুক গে!

কুসুম বড় করে শ্বাস ফেলে বলে, রানা কোথায় গেল?

শিবু গলার ভেতর বলে, যতই করো, পর পর। নেমকহারাম। এতটুকুন করে পেলে এত বড়টা করলাম। সঙ্গে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ালাম। মুখে পেচ্ছাপ করে ধনেশের কাছে গিয়ে জুটল। গাড়িই ওর কাল হবে।

কুসুম বলে, আপদ গেছে। আলোকে দুচোখে দেখতে পারত না ছোঁড়াটা। আলো আসাঅব্দি দেখছি, মুখ ব্যাজার করে খেতে আসছে। এমন করে তাকাচ্ছে ওর দিকে, যেন পায় তো এখুনি গলা টিপে মারে।

হুঁ। আমিও দেখেছি। শিবু অভ্যাসমতো আকাশে মুখ তুলে বলে, যাক্। এখন আমার ভাবনা, কবে আড়ত করে গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসব। শালাদের দেখিয়ে দেব এই শিবুরও দাম আছে। হাজার কুইন্টাল খন্দের বস্তা, বড় বড় তেলের পিপে, পেল্লায় তারাজু—কয়াল গোঁফে তা দিয়ে হাঁকবে, একো এক···দুইও দুই···তিনো তিন···

হা হা করে হাসে সে। কুসুম আর আলো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এই লোকটাকে তারা এতদিন দেখেনি। এ এক আলাদা মানুষ।

বর্ণপরিচয়

মফস্বল শহরেও আজকাল ঘরের এত আকাল। বাইরে থেকে এসে কেউ ডেরা পাততে চাইলে তার ভোগান্তির শেষ নেই। স্বরজিৎ ক'দিন থেকে পর্ণার পেছনে লেগে আছে। 'দিন না মাসিমা আপনাদের ওই ঘরখানা। খামোকা তালা আটকে ফেলে রেখেছেন। দিলে তো এ বাজারে মাস-মাস কিছু টাকাকড়ি আসে।'

পর্ণা গোড়ার দিকে পাত্তা দেন নি। পরে একদিন বললেন, লোকটা কে, স্বরজিৎ ?'

'লোকটা !' স্বরজিৎ খুব হাসল। 'লোকটা কী বলছেন মাসিমা ! আমার বয়সী ছেলে। তবে আমার মতো গবেট নয়, বিদ্বান। হরিমোহন বিদ্যাপীঠে মাস্টারি করতে এসেছে।'

'তোমার বন্ধু বুঝি ?'

তা বলতে পারেন। এখানে এসে তারপর চেনাজানা। একটা বাজে মেসে আপাতত আছে। তবে মাসিমা, আমাদের এখানকার মতো তিলেখচ্চর নয়। খুব ভদ্র নিরীহ ধাতের ছেলে। বলেন তো নিয়ে আসব ওবেলা।'

আজকাল এই রকম হয়েছে, পর্ণা জানেন। কম বয়সী ছেলেমেয়েরাই স্কুল-কলেজে মাস্টার হয়ে যাচ্ছে। হিমশ্রী সেদিন তাদের কলেজের এক অধ্যাপিকাকে নিয়ে এসেছিল। পর্ণা দেখে তো অবাক। এই একরত্তি মেয়ে ! হিমশ্রী বয়সের তুলনায় একটু এগিয়ে গেছে গায়েগতরে। অধ্যাপিকাকে দেখাচ্ছিল ওর ছোট বোন। কেউ কেউ অবশ্য শরীরে ছোটবেলাকে আটকে রাখতে পারে।

পর্ণা গুম হয়ে ভাবছিলেন। স্বরজিৎ বলল, 'কোনো অসুবিধে হবে না মাসিমা ! তা ছাড়া, ওঘরের সঙ্গে আপনাদের এই ভেতর-বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ পেছনে। এপাশের দরজা আটকে দিলে একেবারে সেপারেট হয়ে গেল। অমৃতেন্দু পেছনটা দিয়ে যাতায়াত করবে।'

তা ঠিকই। তবু পর্ণা দোনামনা করছিলেন। 'স্বরজিৎ, তুমি তো জানো…'

কথা কেড়ে স্বরজিৎ বলল, 'জানি, জানি। আপনি ছাড়ুন তো মাসিমা। ওসব একেবারে বোগাস ব্যাপার। আজকাল কেউ মানে নাকি ?'

পর্ণা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'তা নয়। তোমার বন্ধুকে কি বলেছ ?'

'কী বলব ?'

'দয়ালবাবুর ব্যাপারটা।'

সুরজিৎ হোহো করে হাসল একচোট। 'আপনিও যেমন। অমৃতেন্দুর ওসব সুপারস্টিশান একেবারে নেই।'

'না—তুমি বলেছ কিনা ?'

'বলিনি মাসিমা। কী দরকার ? ওর এখন যা অবস্থা, একটু সেপারেট মাথা গোঁজার জায়গা পেলেই কৃতার্থ হয়ে যায়।'

পর্ণা শক্ত মুখে বললেন, 'উঁহু। তুমি দয়ালবাবুর ব্যাপারটা ওকে বলবে। তারপর যদি রাজি হয়, তখন কথা।'...

সুরজিৎ সেদিন আর এল না। পর্ণা মনে-মনে একটু চটে গেলেন। এ তো জানা কথাই যে ব্যাপারটা শোনার পর কেউ ওঘরে এসে থাকতে চাইবে না। এক বছর ধরে ঘরটা তালা আটকানো রয়েছে। এত যে ঘরের আকাল, কেউ তো এতদিন আসেনি। তার একটাই মানে দাঁড়ায়। কোনো-না-কোনো সূত্রে জানাজানি হয়ে যায় ব্যাপারটা। পাড়ার লোকই নিষেধ করে।

পরদিন সকালে পর্ণার কেমন যেন জেদ, অথবা নেহাত খেয়াল হল, ঘরটা খুলে দেখবেন। অনেক খুঁজেপেতে চাবিটা পাওয়া গেল টেবিলের ড্রয়ারে রাশীকৃত জিনিসের ভেতর। অরীন্দ্রনাথ বড় আগোছাল মানুষ ছিলেন। গুছিয়ে দিতে গেলেই হইচই বাধাতেন। ওঁর টেবিলে বসে হিমশ্রী পড়াশুনা করে। কিন্তু যেমন বাবা ছিলেন. তেমনি তাঁর মেয়ে। ড্রয়ারটা ব্যবহার করে, অথচ অকেজো জিনিসগুলো বের করে ফেলে দেয়নি। কয়েকটা লাইটার, একগাদা কলম, নষ্ট রিস্টওয়াচ গোটা দুই, একগুচ্ছের দোমড়ানো কাগজ, শ্যাওলাধরা কয়েকটা পুরনো মুদ্রাও। তার সঙ্গে হিমশ্রীর কলম, ঘড়ি, ক্রিমের তোবড়ানো টিউব, খুচরো পয়সা, রুমাল এই সব।

যে ঘর দিয়ে ঢোকা যায়, সে ঘরে অব্যবহার্য ভাঙাচোরা আসবাব ঠাসা। খিড়কির দরজা দিয়ে পর্ণা গেলেন। ভাঙা নিচু পাঁচিলে ঘেরা একটুকরো জমিতে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে গেছে। দয়ালবাবু ওখানে ফুলবাগান করার চেষ্টায় ছিলেন। সে-সব গাছ ঢাকা পড়েছে আগাছার ভেতর। শুধু কোনার দিকে শিউলিগাছটা ঝাঁকড়া হয়ে মাথা তুলেছে। পর্ণা বিস্ময় ও লোভমেশানো চোখে গাছটা দেখছিলেন। শিউলিফুলে গাছটা ভরে গেছে। সারারাত গন্ধে ম' ম' করে এদিকটা। আগাছা সাফ করে অন্তত সবজিক্ষেত করলে তো দারুণ হত। বাড়ির এই পেছনের কথা ভুলে না গেলেও বড় অবহেলা করা হয়েছে।

হয়তো অবচেতন আতঙ্কে, কিংবা ঘৃণায়। পিছু ফিরে দেখা সব সময় সুখের নয়। তার চেয়ে বড় কথা, আত্মহত্যাকারীকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় জীবিতদের।

তালাটাতে মরচে ধরে জ্যাম হয়ে গেছে বুঝি। পর্ণার হাতে যত ময়লা জমল, তত রক্তের ছোপ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘেমে যাচ্ছিলেন। চাবি ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে কিছুতেই তালাটা খুলতে পারছিলেন না। সেই সময় হিমশ্রী এসে অবাক হয়ে বলল, 'ও কী মা! ও কী করছ তুমি?'

চমকে উঠেছিলেন পর্ণা। এমন করে সাড়াশব্দ না দিয়ে আসতে আছে? রাগতে গিয়ে একটু নার্ভাস হাসলেন। 'দ্যাখ তো হিমি, খুলতে পারিস নাকি।'

হিমশ্রী কিন্তু খুব সহজে খুলে ফেলল তালাটা। তারপর কপাট ঠেলে দিয়ে নাক ঢেকে সরে দাঁড়াল। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কী একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। কিংবা মা মেয়ে দুজনকারই মনের ভুল। মানুষ যে ঘরে বাস করতে করতে মরে যায়, সে-ঘরে তার জীবনের গন্ধের মতো মৃত্যুর গন্ধও ছড়িয়ে থাকার কথা। এ কি দয়ালবাবুর মৃত্যুর গন্ধ? হিমশ্রী সন্দিগ্ধ দৃষ্টে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। পর্ণার মুখে ক্লান্তির ভাবটা শক্ত হয়ে বসে আছে। বাইরে আশ্বিন মাসের উজ্জ্বল রোদ। ঘরের ভেতর চমকে-ওঠা অন্ধকার খানিকটা পিছিয়ে গাঢ় হয়ে আছে। পর্ণা দেখছিলেন দয়ালবাবুর রেখাচিত্র। ঢ্যাঙা, কালো এক মানুষ। শক্ত শরীর। একরাশ এলোমেলো চুল মাথায়। মুখ জুড়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। যেমন-তেমন ধুতিপাঞ্জাবি-পরা সাদাসিধে এক মানুষ। হিমশ্রী দুষ্টুমি করে বলত, 'দয়ালজেঠু যেন ছবির মানুষ, মা!' নিঃশব্দ, কণ্ঠস্বরহীন প্রকৃতির লোক ছিলেন দয়ালহরি। কিন্তু যখন হাসতেন, সে যেন এক সূর্যোদয়।

হিমশ্রী বলল, 'খুললে কেন, মা?'

পর্ণা জবাব না দিয়ে হঠাৎ জোরালো ভঙ্গীতে ঢুকে গেলেন ঘরে। তারপর অস্বাভাবিক দ্রুততায় তিনটে জানালাই খুলে দিলেন।

ঘরের ভেতরটা আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন। পেছনের দিকে বলে ধুলোময়লা ঢোকে না। আর মৃত্যুর কিছুদিন আগে দয়ালবাবু ফিকে সবুজ রঙ করিয়েছিলেন দেয়ালে। পুরনো বাড়ি বলে জায়গায়-জায়গায় ছোপ ফুটে আছে। দেয়ালে বাল্বটার ওপর মাকড়সার সামান্য জাল ছাদের মাঝখানে শূন্য আংটাতেও একটু ঝুল জমেছে। ওখানে একটা ভাড়াকরা ফ্যান ছিল। সারা রাত অদ্ভুত

শব্দ করত। তার নিচে ছিল দয়ালবাবুর তক্তাপোশে সাদাসিধে একটা বিছানা। দেয়ালের হুকে ছিল একটা বাঁধানো ফোটো। ফোটোতে একগাদা লোকের ভেতর দয়ালবাবু। সেটা অরীন্দ্রনাথ কী করেছিলেন, পর্ণা জানেন না। তক্তাপোশ, বিছানা, কয়েকটা জামাকাপড় ডোমকে দান করেছিলেন। একটা টিনের তোরঙ্গ ছিল যেন। কী হল, পর্ণার মনে নেই। তারপরের দিনগুলো বড় অশান্তিতে কেটেছিল। তাই খুঁটিয়ে কিছু লক্ষ্য করেন নি—মনেও পড়ে না। তোরঙ্গটা পাশের ঘরে আবর্জনার গাদায় চাপা থাকতেও পারে।

পর্ণা অন্যমনস্কভাবে সুইচ টিপেই চমকে উঠলেন। আশ্চর্য লাগল, বাল্বটা জ্বলে উঠেছে দেখে। কানেকশান কেটে দেওয়ার কারণ ছিল না। তবু এমন করে বাতি জ্বলে উঠলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ঘরে যেন জীবন ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল একমুখ হাসি নিয়ে।

অরীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বলতেন, 'ঘরখানা গঙ্গাজল ঢেলে ধুয়ে ফেলতে হবে।' শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি। এদিকে উনিও আর পা বাড়াতেন না। কেউই না। পর্ণার সেই কথাটা মনে পড়ল। বেরিয়ে এসে একটু হেসে বললেন, 'হিমি, ধুয়ে-টুয়ে সাফ করে ফেললে দারুণ হয়। না রে? এদিকটা বেশ নিরিবিলি। ধর, তুই এসে দিব্যি পড়াশুনা করতে পারিস। আর জঙ্গল সাফ করে ফুলগাছ লাগিয়ে দিলে তো কথাই নেই। খামোকা এমন একটা ভাল ঘর ফেলে রাখার মানে হয় না। কী বলিস?'

হিমশ্রী ভুরু কুঁচকে বলল, 'হুঁ। এ ঘরে আমি খুব আসছি।'

'কেন? ভয় করবে তোর?'

'তুমি এসে থেকো না।' হিমশ্রী হাসতে লাগল। 'দয়ালজেঠুর ভূতের পাল্লায় পড়ে কী হয় দেখবে।'

'ছিঃ। বলতে নেই।'

'পারবে তুমি থাকতে?'

'কেন পারব না?'

'রাত্তিরে।'

'হ্যাঁ, রাত্তিরেও।' মেয়ের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠলেন পর্ণা। 'আমার ভূত-টুতের ভয় নেই।'

'মানো না! তাই বলো, রাত্রিবেলা কী সব শব্দ শুনতে পাও। ভয়ের চোটে এদিকের জানালাটাও খুলতে পারো না।'

পর্ণা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর দয়ালজেঠুর আত্মা আমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

হিমশ্রী আস্তে বলল, 'দয়ালজেঠু কেন সুইসাইড করেছিল মা?'

পর্ণার মুখের হাসি নিভে গেল। হিমশ্রী এই প্রথম প্রশ্নটা তুলেছে এতকাল পরে। এক বছর হয়ে গেল প্রায়। হিমশ্রী এতদিন এমন প্রশ্ন করেনি। কেন করেনি কে জানে। হয়তো প্রশ্নটা তার মাথায় আসেনি—অথবা মনে মনে একটা জবাব খুঁজে নিয়েছিল। চাপা নিঃশ্বাস ফেলে পর্ণা বললেন, 'কে জানে! তারপর ঘরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যে ঘরে মানুষ আত্মহত্যা করে, সে ঘরটা যেন পৃথিবীর সব ঘরের চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। পর হয়ে যায় চিরকালের মতো।...

সুরজিৎ সেদিনই বিকেলে এল। সঙ্গে অমৃতেন্দু। 'হঠাৎ বাইরে যেতে হয়েছিল, মাসিমা! আপনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন...' বলে সে তার বন্ধুর দিকে চোখ নাচিয়ে হাসল।

পর্ণা দেখছিলেন অমৃতেন্দুকে। পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে শ্যামবর্ণ শীর্ণ এক যুবক। চোখ দুটো কেমন শান্ত, ভাসা-ভাসা দৃষ্টিপাত। চেহারার তীক্ষ্ণতা যে আছে, হঠাৎ করে তা ধরা পড়ে না। একটু দেরি হয়। কিন্তু কেমন যেন চেনা লাগছিল। হয়তো রাস্তাঘাটে ইতিমধ্যে দেখে থাকবেন।

অমৃতেন্দু বলল, 'সুরজিৎ আমাকে বলেছে। কিন্তু তাতে কী? ব্যাপারটা অন্যদিক থেকে ভেবে দেখা যায়, মাসিমা! এ পৃথিবীতে তো অসংখ্য সাংঘাতিক-সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে, তবু পৃথিবী ছেড়ে মানুষের যাওয়া চলে না।' সে শান্তভাবে একটু হাসল। 'তা ছাড়া, আমরা কেউ জানি না, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে কী ঘটেছে অতীতে। জানি কি মাসিমা? কিংবা ধরুন জানলেন। জেনেও আপনার কী করার আছে?'

পর্ণার ভাল লাগছিল কথাবার্তা শুনে। ছেলেটি বেশ। মুখ নামিয়ে বললেন, 'তোমার আপত্তি না থাকলে—তুমি বলছি, রাগ কোরো না বাবা!'

'না বললেই রাগ করতুম।' অমৃতেন্দু বলল। 'আমি সব ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্ক, মাসিমা। ভাড়াটাড়ার ব্যাপারে কিন্তু খোলাখুলি বলবেন।'

পর্ণা মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তো। আগে ঘর দেখ, পছন্দ হয় নাকি।'

'কী যে বলেন! মাথার ওপর ছাদ থাকলেই হল।'

খিড়কির দরজা দিয়ে ঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন পর্ণা। দরজা সেই সকাল থেকেই হাট করে খোলা ছিল। দুপুরে কাজের মেয়েটিকে বাড়তি পয়সা দিয়ে ধুইয়ে ঝাড়ু দিয়ে সাফ করিয়ে রেখেছিলেন। আলোটাও জ্বেলে দিলেন। অমৃতেন্দু প্রথমে পরিবেশ দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করল। তারপর দরজায় উঁকি মেরেই বলল, 'অপূর্ব! আমার পক্ষে স্বর্গ, মাসিমা!'

পর্ণা একটু হেসে বললেন, 'স্বর্গে কিন্তু জলের অসুবিধা হবে। বাইরে থেকে আনতে হবে কষ্ট করে।'

'আনব। আমি সব কাজ পারি, দেখবেন।'

তারপরই পর্ণা গম্ভীর হলেন। 'বাইরে থেকেই বা আনবে কেন? যদি থাকোই, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। কিন্তু তুমি রেঁধে খাবে, নাকি হোটেলে?' আসলে পর্ণা চাইছিলেন, ও নিক ঘরটা। যা দেয়, দিক না। ক্ষতি কী?

অমৃতেন্দু বলল, 'হোটেলে খাচ্ছি। দেখব যদি রেঁধে খেতে পারি। না পারার কারণ কী? কী বলো, সুরজিৎ?'

সুরজিৎ বলল, 'মাসিমাকে তুমি চিনতে পারছ না। এমন মানুষ কোথাও পাবে না কিন্তু। ও মাসিমা, পেয়িং গেস্ট হয়ে থাক না। আপনারা যা খান, অমৃতেন্দু তাই খাবে। ও তো লাটসায়েব নয়। কী অমৃতেন্দু?'

অমৃতেন্দু তাকাল পর্ণার দিকে। পর্ণা ভাবছিলেন। ছেলেটিকে কেন যেন আপন লাগছে। একটু পরে বললেন, 'হিমিও তো কলেজে যায় দশটা নাগাদ। কাজেই সকাল-সকাল রান্নাটা করতেই হয়। আমার তাতে অসুবিধে হবে না। দুমুঠো চাল ধরিয়ে দেব। কিন্তু তোমার অসুবিধে হতে পারে।'

'কোনো অসুবিধে হবে না। একটা ট্রায়ালও দিতে পারেন।' অমৃতেন্দু হাসল। 'শুধু ফ্র্যাঙ্কলি বলুন, কত দিতে হবে।'

পর্ণা বিব্রত বোধ করছিলেন। সুরজিৎ তা লক্ষ্য করে বলল, 'শোনো। যা বাজারের অবস্থা, সব কনসিডার করে আমার বিচারে অন্তত আড়াইশো টাকা তোমায় দেওয়া উচিত। মাসিমা, কী বলেন? ঘরভাড়া প্লাস খাওয়া-দাওয়া। কী?'

অমৃতেন্দু বলল, 'দেব।'

পর্ণা বললেন, 'আচ্ছা।'...

আগাম সব টাকা দিয়ে চলে গেল ওরা। টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন পর্ণা। ঠিক করলেন কি না বুঝতে পারছিলেন না। ছেলেটিকে তো ভালই লাগল। তা ছাড়া, সুরজিৎ ওর জন্য দায়ী রইল। বাড়িতে কোনো পুরুষ-মানুষ নেই বলে কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে থাকতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে। শুধু একটু খুঁতখুঁতেমি এসে দাঁড়াচ্ছে। হিমশ্রীর কারণে। দোষী ঘরটার দোষ খণ্ডাতে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল হয়তো। আগু বাড়িয়ে খাওয়ার কথাটা না তুললেও পারতেন।

তবে ছেলেটিকে সচ্চরিত্র বলেই মনে হয়। খারাপ হলে সুরজিৎ কখনও ওর জন্য এমন তাগিদ দিত না। শেষ পর্যন্ত পর্ণা আশ্বস্ত হলেন। হিমশ্রী কলেজে ছুটির পর রোজই সেই অধ্যাপিকার সঙ্গে সন্ধ্যা অবধি কাটিয়ে আসে। যেদিন দুপুরের পর ক্লাস থাকে না, সেদিন একবার বাড়ি ঘুরে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে সব শুনে বাঁকা মুখ করে বলল, 'খামোকা কী সব ঝামেলা জোটাও, বুঝি না। তুমিও অবিকল বাবার মতো। দয়ালজেঠুকে জুটিয়ে শেষে ওই হল।'

পর্ণা হাসতে হাসতে বললেন, 'সবাই তো তোর দয়ালজেঠুর মতো বিবাগী পুরুষ নয়। তুই কি ভাবছিস ও ঘরে যে থাকবে, সেই সুইসাইড করবে?'

'কেলেঙ্কারি হবে, জানো? পাড়ায় মুখ দেখানো যাবে না সেবার-কার মতো।'

পর্ণা কড়া মুখে বললেন, 'হিমি। বাজে বকিস নে তো।'

হিমশ্রী শাড়ি বদলাতে গেল। দয়ালবাবুর আত্মহত্যার পর খানিকটা ঝামেলা হয়েছিল বটে। অরীন্দ্রনাথ সামলে নিয়েছিলেন। ঝামেলা হত না, যদি দয়ালবাবু কাগজে লিখে রাখতেন কিছু। দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা-বাঁকা বড়-বড় হরফে লিখেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

লেখাটা মোছা হয়েছিল পরে। কিন্তু ভালভাবে মোছা হয়েছিল তো? এখন হিমশ্রীর কথার সূত্রে সেটা মনে পড়ে গেল। আজ লক্ষ্য করেননি দেয়ালটা।

তবে এ নিয়ে চিন্তা করার কারণ নেই। অমৃতেন্দু তো দেখেশুনেই

থাকছে। পর্ণা ঘরে ঢুকে বললেন, 'ছেলেটা দুটো সাবজেক্টে এম এ। জানিস হিমি?'

হিমশ্রী চুলে চিরুনি টানতে-টানতে বলল, 'ইশ্‌। দুর্ধর্ষ পণ্ডিত। তাই বিদ্যাপীঠের খোঁয়াড়ে ঢুকেছে।'

'কী করবে—তেমন কিছু না পেলে? যা চাকরির অবস্থা।'

হিমশ্রী হঠাৎ ফিক করে হাসল। 'একটা রাত্তির থাকলেই টের পাবেন। দয়ালজেঠুর ভূতের পাল্লায় পড়ে দেখবে কী হয়।'

পর্ণা সকালের মতো আস্তে বললেন, 'ছিঃ। বলতে নেই।'

অমৃতেন্দু কিন্তু চমৎকার টিকে গেল। মা ও মেয়ে দুজনেই দুদিক থেকে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। আর হিমশ্রী তো মুখ টিপে হেসে বলত 'দয়ালজেঠুর সঙ্গে লড়িয়ে দিয়েছ ভালো।' পর্ণা রাগ করতেন না একথায়। বলতেন, 'ট্রায়াল দিচ্ছি রে হিমি!' পর্ণার পুরনো হাসিখুশি ভাবটা ফিরে এসেছিল। একটা বছর যা গুমোট পরিবেশ গেছে। দয়ালবাবুর আত্মহত্যার পর অরীন্দ্রনাথের অসুখবিসুখ, তারপর মৃত্যু। দুটোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আবার ছিলও হয়তো। অরীন্দ্রনাথের মনে একটা গুরুতর ধাক্কা লেগেও থাকতে পারে। কথাটা ভাবতে গেলে পর্ণার মনে হয় যেন আলকাতরা মেখে তুলোর গুদোমে ঢুকেছেন। ঝটপট সামলে নেন নিজেকে।

তবে যেদিন থেকে অমৃতেন্দু ও-ঘরে ঢুকেছিল, প্রথম রাতটা তো ভাল ঘুমুতেই পারে নি পর্ণা। পরের অনেকগুলো রাতও খুব অস্বস্তিতে কাটাতেন। পেছনদিকের জানালা আগে পারতপক্ষে খুলতেন না—রাতে তো নয়ই। অমৃতেন্দু আসার পর সেটা খুলতে শুরু করেন। ভোরবেলা ওই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ওদিকটা দেখতেন। একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় অমৃতেন্দু। সকালে পর্ণা চা দিয়ে আসতেন। তাকে দেখে আশ্বস্ত হতেন। জিগ্যেস করতেন, 'অসুবিধে হয় না তো?' অমৃতেন্দু জোরে মাথা নেড়ে বলত, 'মোটেই না। রাজার মত আছি মাসিমা!'

পর্ণা ভাবতেন, ভাল কিছু জুটলে তো ও চলে যাবেই, কিন্তু ঘরটার দোষ কেটে বাসযোগ্য হয়েছে, এটাই শেষ পর্যন্ত লাভ। এর পর ভাড়াটে জুটতে দেরি

হবে না। আজকালকার দিনে একটা বাড়তি পর। আয়ের কোনো রাস্তা নেই সংসারে। অরীন্দ্রনাথের সঞ্চয় থেকে দুজনের ছোট্ট সংসার কোনো রকমে চলে যায়।

অমৃতেন্দু বলেছে, সব কাজ পারে। ওকে দেখলে তা মনে হয় না বটে, কিন্তু সত্যি পারে। পেছনদিকটা কী জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল! মাসখানেকের মধ্যে তা সাফ করে ফুলের গাছ পুঁতেছে। বিকেলটা বেশ কাটানো যায় ওখানে। নিচু এক ইঁটের পাঁচিল। জায়গায়-জায়গায় ভাঙাচোরা হয়ে আছে। তার ওধারে রেলের নয়ানজুলি। তারপর রেলইয়ার্ড। হেমন্তের রাতে গাছপালায় কুয়াশা ঝোলে। বৃষ্টি-সন্ধ্যায় জোনাকি জ্বলে। শান্টিং করতে করতে ইঞ্জিন চেরা গলায় শিস দেয়। দূরের ট্রেনের চাপা শব্দ অনেক রাতে। বাড়ির পেছনের এই সব ব্যাপার পর্ণার জীবনে ফিরতে শুরু করেছিল। এক বছর সামনে তাকিয়ে থাকার পর আবার পিছু ফিরে দেখার মতো। ছেলেটার খানিকটা যেন দয়ালবাবুর স্বভাবও। কথা বলতে বলতে সেই রকম হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, দূরে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে তাকানো, অথবা জ্যোৎস্নায় চুপচাপ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা। ঘরের জানালা থেকে পর্ণা দেখেন, অমৃতেন্দু সাদা হয়ে অত রাতে দাঁড়িয়ে আছে। হিম পড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পরই শিশিরে ঘাস ভিজে চবচবে হয়ে যায়। কিন্তু আর চমকান না পর্ণা। বাগানে রাতবিরেতে যাকেই দেখুন, জানেন সে অমৃতেন্দু। সকালে গিয়ে বলেন, 'অমন করে হিমে দাঁড়িয়ে থাকো। অসুখ করবে যে!' অমৃতেন্দু হাসে। 'আপনি দেখতে পান? আমার ইনসমনিয়া আছে, মাসিমা। বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করলে ঠিক হয়ে যায়।'

হিমশ্রী গোড়ায় পাত্তা দেয় নি ওকে। কথাবার্তা বড় একটা বলতে চাইত না। কিন্তু ক্রমশ পর্ণা লক্ষ্য করলেন, হিমশ্রীরও চোখ পড়েছে বাড়ির পেছন-দিকে। ওখানে তারও অনেক স্মৃতি আছে। সেও কি তাঁর মতো নেপথ্যের দিকে হেঁটে যেতে চাইছে? একটু অস্বস্তি হয় পর্ণার। একটা ছোট্ট কণ্টকিত ক্যাকটাসের পেছনে বড় সর্বনাশ লুকিয়ে থাকতে পারে।

কলেজ থেকে ফিরেই হিমশ্রী খিড়কির দরজা খুলে ওদিকে যায়। পর্ণা ঘরের ভেতর থেকে সেই জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারেন। অমৃতেন্দু গুঁড়ি মেরে বসে ঘাস ছেঁড়ে, কিংবা খুরপি দিয়ে মাটি খোঁড়ে। পেছনে হিমশ্রী দাঁড়িয়ে। একটু পরে অমৃতেন্দু টের পেয়ে ঘোরে। হাসে। চোখ জ্বলে যায় পর্ণার।

অবিকল দয়ালবাবুর মতো! চমকানো গলায় একমুখ হেসে বলতেন, 'পর্ণা দেবী, তোমার স্বভাব আততায়ীর মতো।'

একদিন হিমশ্রী হাঁফাতে হাঁফাতে এল 'মা, মা! দয়ালজেঠুর ছাতাটা পাওয়া গেছে। ঘাসের ভেতর পড়ে ছিল। শিক-টিক সব আস্ত আছে। শুধু কাপড়টা পচে গেছে। ইশ! কী ওয়াণ্ডারফুল ডিসকভারি মা! ভাবতে পারো?'

পর্ণা গলার ভেতর বললেন, 'এতে নাচবার কী হল?'

'বাজে বলো না।' হিমশ্রী রেগে গেল। 'একটা স্মৃতিচিহ্ন না? বুডোদা ওটা রেখে দিল।'

'বুড়োদা?' হেসে ফেললেন পর্ণা। 'ওর ডাকনাম বুঝি বুড়ো? বলে নি তো?'

হিমশ্রীও খুব হাসল। তারপর বলল, 'বুড়োদা দয়ালজেঠুর কথা খুঁটিয়ে এত জানতে চায় কেন মা? যখন যাব, তখনই খালি ওই কথা। কী করত দয়ালজেঠু, কী বলত, ওঁর কোনো জিনিসপত্র আছে নাকি—এই সব। সারাক্ষণ।'

'তুই বুঝি সব বলিস?'

'কেন?' হিমশ্রী মায়ের দিকে অবাক চোখে তাকাল। 'বললে দোষ কী? আমাকে কত আদর করতেন দয়ালজেঠু। আচ্ছা মা, দয়ালজেঠুর কোনো জিনিসপত্র নেই আমাদের ঘরে?'

পর্ণা নিষ্পলক চোখে হিমশ্রীর দিকে তাকিয়ে আস্তে ঘাড় নাড়লেন। বলতে পারলেন না আছে। একটা ছোট্ট তোরঙ্গ অরীন্দ্রনাথ কোথায় যেন রেখেছিলেন। কী আছে ওতে দেখার দরকার মনে করেন নি। পর্ণারও দেখার ইচ্ছে ছিল না। এখন মনে হল, খুঁজে বের করে দেখলে হত।

শীত আসতে আসতে অমৃতেন্দুর লাগানো গাছগুলোতে ফুল ফুটল। মা ও মেয়ের খুব আনন্দ। হিমশ্রী তো হিমভোরে চলে যায় বইখাতা নিয়ে। অমৃতেন্দুর ঘুম ভাঙায়। পর্ণাও প্রায় পেছনে পেছনে আসেন চায়ের ট্রে নিয়ে।

কুয়াশাব ভেতর রোদ ফুটতে ফুটতে খোলা চত্বরের মতো একটুকরো বারান্দায় বসে চা খাওয়া হয়। ইদানীং সকাল-সন্ধ্যা এটাই বিলাস। ঠিক আগের দিনের মতো জীবন নিয়ে বাঁচা।

এক রাতে বিছানায় শুয়ে পর্ণা বললেন, 'কী অত কথা বলিস রে তোরা?'

হিমশ্রী একটু চমকে উঠল। 'কখন?'

'সব সময়। কখন আবার?'

হিমশ্রী লেপে মুখ ঢেকে বলল, 'তুমি ভীষণ গোয়েন্দা, জানি।'

পর্ণা কনুই ভর করে উঁচু হলেন। 'দুপুরবেলা অত হাতমুখ নেড়ে কী বোঝাচ্ছিলি ওকে?'

লেপ থেকে মুখ বের করে হিমশ্রী রাগী চোখে তাকাল। 'কী ভেবেছ তুমি? বুড়োদা জিগ্যেস করছিল কেন দয়ালজেঠু স্যুইসাইড করেছিল।'

'কী বললি তুই?'

'যা জানি বললুম।'

'কী জানিস?'

হিমশ্রী পাশ ফিরে বলল, 'বললুম, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। বাবা চড় মেরেছিলেন।'

পর্ণা ভাঙা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'হিমি! তুই ওকে তাই বললি?'

'বলো না মিথ্যে বলেছি?'

'তুই দেখেছিল চড় মারতে?'

'হ্যাঁ। শুধু চড়? ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল বাবা।'

পর্ণা চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বেশ করেছিল। পরের ঘাড়ে বসে থাকবে—খাবে। আবার কুৎসা গেয়ে বেড়াবে। রাতবিরেতে মাতলামি করবে।'

হিমশ্রী পাশ ফিরে থেকে বলল, 'বাজে বলো না। আমি সব জানি।'

পর্ণা লেপ ঠেলে উঠে বসলেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কী জানিস? এত যে জানিস-জানিস করছিস, বল কী জানিস, শুনি।'

হিমশ্রী নির্বিকার স্বরে বলল, 'বাবা অনেক টাকা নেয়নি দয়ালজেঠুর কাছে? আমাকে দিয়ে চেয়ে পাঠাত না বাবার কাছে? বাবার হয়ে তুমি বলতে যেতে না দয়ালজেঠুকে? বলো না মিথ্যা বলছি?

পর্ণা ওর মাথায় থাপ্পড় মারলেন। হিমশ্রী ফুঁপিয়ে উঠল। 'হুঁ, সত্যি কথা বললেই মার।'

পর্ণা হাত বাড়িয়ে টেবিলবাতিটা অফ করে দিলেন। তারপর ভারি শরীর টেনে সেই জানালার কাছে গেলেন। জানালাটা খুলে পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে রইলেন। শীতের জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে প্রকৃতি। অমৃতেন্দুর ঘরে এখনও আলো। দরজা খোলা। একটু পরে হঠাৎ চমকে উঠলেন পর্ণা। সাদা জ্যোৎস্নায় কালো হয়ে যেন দয়ালবাবুই বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ ফেটে জল এল পর্ণার।···

হিমশ্রী আজ ওঠেনি অন্যদিনের মতো। পর্ণার ঘুম হয় নি ভাল। বুঝতে পারছিলেন পেছনদিকটায় ফিরতে গিয়ে ভুল করেছেন। জায়গাটুকু বেচে দিতে হবে। যে কিনবে, সে সব মিশমার করে ঘরবাড়ি তুলবে। ঘরবাড়ির জন্য জায়গাজমির যে আকাল পড়ে গেছে, বেচতে চাইলে কত লোক দৌড়ে এসে সাধাসাধি করবে।

কড়া কথাটা বলার জন্য তৈরি হয়েই গেলেন পর্ণা। হাতে চায়ের পাত্র ছিল না রোজকার মতো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে ডাকলেন। সাড়া এল না। কড়া নাড়লেন। তবু অমৃতেন্দুর সাড়া নেই। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে পর্ণা দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। দয়ালবাবুর বেলাতেও তো এমনি হয়েছিল! ভেতরে এমনি আলো জ্বলছিল। আবার কি কোন সর্বনাশ ঘটল তাহলে?

কিন্তু অমৃতেন্দু দরজা খুলে দিল। চোখ দুটো লাল। ভিজে দেখাচ্ছে। পর্ণা গম্ভীর মুখে কড়া কথাটা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। ঘরের ভেতর বাল্বটা জ্বলছে। তারই নিচে ফিকে সবুজ দেয়ালে দয়ালবাবুর হাতের সেই লেখাটা আবার অক্ষরে-অক্ষরে ফুটে বেরিয়েছে: 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

পর্ণা রূঢ় কণ্ঠস্বরে বললেন, 'এ কী করেছ?' তারপর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেন করেছ?'

অমৃতেন্দু একটু হাসল। 'বাবার হাতের লেখাটা উদ্ধার করছিলুম মাসিমা।'

'বাবা! দয়ালবাবু তোমার বাবা?' পর্ণা নিঃসাড় হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলেন। অমৃতেন্দুকে তাই এত চেনা লেগেছিল। ওর চলাফেরা, কথাবার্তার ভঙ্গী, তাকানো, খাওয়াদাওয়া। অমৃতেন্দুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকালেন পর্ণা। এতক্ষণে ওই লেখাটার মতো দয়ালহরি ফুটে উঠেছেন ওর চেহারায়। পর্ণা ধরা গলায় বললেন, 'এতদিন বলতে কী হয়েছিল?'

অমৃতেন্দুর আঙুলের দিকে চোখ রেখে বলল, 'বলতে সাহস পাইনি, মাসিমা। বললে কি ঘরটা দিতেন আমাকে? নিশ্চয় দিতেন না।'

পর্ণা চুপ করে থাকলেন। সত্যি তো। দিতেন না। এই ঘরের ভেতর গোপন-গভীর কলঙ্ক আছে। দয়ালবাবুর ছেলেকে সেখানে ঢুকতে দিতে বিবেকেও তো বাধত।

অমৃতেন্দু মুখ তুলে বলল, 'আপনি বসুন মাসিমা।'

পর্ণা এগিয়ে এসে তক্তাপোশের বিছানায় বসলেন। 'দয়ালবাবুর ছেলেটেলে ছিল আমরা জানতুম না। উনি বলেন নি।'

অমৃতেন্দু লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবাকে আমি দেখিনি। কাকার কাছে শুনেছি, রাজনীতি করে বেড়াতেন। ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

'তোমার মা?'

'মা আমাকে নিয়ে দাদামশাইয়ের কাছে থাকতেন। আমার ছ' বছর বয়সে মা মারা যান। দাদামশাইও মারা যান। তখন কাকা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'কীভাবে জানলে তোমার বাবা এখানে থাকতেন?'

'জানতুম না। এখানে এসে ঘর খুঁজছিলুম। সুরজিৎ বলল, সুইসাইডকরা ঘরে থাকতে পারব নাকি। বললুম, কেন পারব না? তখন আমাকে ও সব বলল। নাম শুনে ভীষণ চমকে গেলুম। তারপর হিমশ্রীর কাছে...'

পর্ণা দ্রুত বললেন, 'কী শুনেছ হিমির কাছে?'

'মেসোমশাই আর বাবা নাকি একসঙ্গে জেলে ছিলেন। সেই থেকে বন্ধুতা। একই পলিটিক্যাল পার্টির লোকেদের মধ্যে এটা তো স্বাভাবিক। মাসিমা, আমি আরও জানতে চাই বাবার সম্পর্কে। হিমশ্রী তো অনেক কিছু জানে না।'

পর্ণা মুখ নামিয়ে বিছানার চাদরে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে বললেন, 'পরে ওঁরা পার্টি-ফার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন অবশ্য। ব্যবসা করার প্ল্যান করতেন। কিন্তু এসব মানুষ কি ব্যবসা করতে পারে? খালি পাগলামি।'

'বুঝতে পারছি।'

'তুমিও তো দেখছি কম পাগল নও।' পর্ণা একটু হাসলেন। 'রাত জেগে ওসব কেন করেছ?'

'লেখাটা?' অমৃতেন্দুও একটু হাসল। 'হিমশ্রী কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ বলল,

ওখানে বাবার হাতের লেখা আছে নাকি। খুঁজে দেখলুম, ঠিক তাই। একেবারে মোছা যায় নি। হিমশ্রীকে বললুম একটুকরো কাঠকয়লা এনে দিতে। ভীষণ ইচ্ছে করছিল বাবার হাতের লেখা দেখতে। বাবাকে তো কখনও দেখি নি, মাসিমা।'

'তোমার বাবার একটা ছবি ছিল। গ্রুফ ফোটো। কোথাও আছে হয়তো। দেখব খুঁজে।' পর্ণা উঠে দাঁড়ালেন। 'একটা কথা বলি শোনো। ওই লেখাটা মুছে ফেলো। শিগগির এক পোঁচ রঙ করিয়ে দেব বরং। আর···'

পর্ণা কী একটা বলতে গিয়ে ভুলে গেলেন। 'বসো, চা নিয়ে আসি আগে।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

হিমশ্রী কুকার জেলে কেটলি চাপিয়ে দিয়েছে। চুল আঁচড়াচ্ছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। পর্ণা ব্যস্তভাবে ঢুকে বললেন, 'ও হিমি, জানিস? অমৃতেন্দু দয়ালবাবুর ছেলে। আমি তো তাজ্জব হয়ে গেলুম শুনে। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না রে।'

'বিশ্বাস না হওয়ার কী আছে? তোমার তো সবতাতেই লাফালাফি।'

'তোর অবাক লাগছে না?'

'না।'

পর্ণা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে গেলেন। ওর মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় নেই। নির্বিকার। চুলে চিরুনি চালিয়ে গিট ছাড়াচ্ছে। তারপর আঙুলের ডগায় একটু ক্রিম নিয়ে মুখে ঘষতে ঘষতে বলল, 'কী দেখছ? চায়ের জল ফুটছে না?'

পর্ণা আস্তে বললেন, 'তুই বুঝি জানতিস সব?'

'তোমার মত হইচইয়ের স্বভাব তো আমার নয়।' বলে হিমশ্রী তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে বই বাছতে থাকল। তারপর কয়েকটা বই আর খাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পর্ণা ভারি একটা নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে গেলেন। ছেলেটার এখন মন ভাল নেই। এখন গিয়ে হিমির জ্বালাতন করাটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। পর্ণা খুব সময় নিয়ে চা তৈরি করছিলেন। বুক থেকে কী কষ্ট বা সুখ ঠেলে আসছে শুধু। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে আজ।···

লালীর জন্য

'এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।'

দয়াময় এমন করে বলায় আমার খুব খারাপ লাগল। মড়া না বলে শুধু লালী বললেই পারতেন! যারা মরে যায়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে না পারলেও ঘেন্না থাকা উচিত কি? ধরা যাক, লোকটা বা মেয়েটা কিংবা কেউ হাড়জ্বালানী বদমাস ছিল—কিন্তু মরার পর তো আর কিছু করারই রইল না।

আর মৃত্যু, আজও এক রহস্য। মরে গিয়ে কী ঘটে? কেউ ফিরে এসে তো বলার উপায় নেই। অন্তত মৃত্যুর এই রহস্যময়তার খাতিরেও লালী একটা মূল্য দাবি করতে পারে। বিশেষ করে নিজের বাবারই কাছে। ওর বাবা দয়াময় অবশ্য বরাবর নিষ্ঠুর মানুষ বলে প্রসিদ্ধ। কথায় কথায় চাষীদের বেদম ঠ্যাঙান। লালীকেও সারাজীবন ঠেঙিয়ে গেছেন। লালী বলত—এটা বাবার একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থেকে হয়েছে। সত্যি করে কেউ তো এ পৃথিবীতে দয়াময় থাকতে পারে না।

আমি ঝোপটা খুঁটিয়ে দেখছি লক্ষ করে দয়াময় ফের বললেন—সেই বন্যায় সব উপড়ে ভেসে গিয়েছিল, শুধু এটা বাদে। চিনতে পারছ, এটা একটা শ্যাওড়া ঝোপ? খুব শক্ত শেকড়-বাকড়।

ভাগ্যিস শক্ত এবং উপড়ে যায়নি, তাহলে লালী এই নদী বেয়ে সোজা গঙ্গায় পড়ত। তবে, গঙ্গায় পড়লে লালীর ভালই হত—সব পাপ ঘুচে মোক্ষ পেত তার আত্মা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার। কেন কে জানে, তার পরমুহূর্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। বললুম—তারপর কী হল?

দয়াময় একটু বাঁকা হেসে বললেন—তারপর কী হয়?

—মানে, ওকে কী অবস্থায় পেয়েছিলেন?

দয়াময় ঝোপটা দেখতে দেখতে বললেন—শকুন বসতে পারেনি, জল ছিল। তবে দুটো শেয়াল ওর নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছিল। আর একটা দাঁড়কাক স্তনে ঠোঁট ঢুকিয়ে লাং বের করছিল। আরও শুনবে?

—জ্যাঠামশাই কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

দয়াময় নিষ্ঠুর হেসে উঠলেন।—কেন? তোমাদের আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের বোঝাই দায়—এত সেন্টিমেন্টাল। এস. তোমাদের জমিটা দেখিয়ে দিই।

দয়াময়ের কাঁধে এবার বন্দুকটা উঠল। পা বাড়ালেন। কাঁধে কার্তুজের ঝোলাটা নড়ে উঠল। আমার কিন্তু পা ডুবে গেছে শক্ত পলির তলায়, শেকড় গজাচ্ছে, এবং সেই সব সাদা বিন্দু বিন্দু শেকড়ের আঁকুর ভ্রূকুটির মতন আমার শরীর থেকে পৃথিবীর গভীরতা লক্ষ করতে চায়। খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলুম এটা।

দয়াময় ঘুরে বললেন—কী হল?

—কিছু না। বেচারী লালীর কথা মনে পড়ছে।

দয়াময় ফের হাসলেন—তুমি বরাবর ব্রডমাইণ্ডেড আর মডার্ন। জানি। কিন্তু আমি প্রিমিটিভ ধরনের মানুষ। মেয়ের প্রেমিকদের…

বাধা দিয়ে বললুম—ছিঃ। কী বলছেন?

—মাঝে মাঝে আমি খুব সরল হয়ে যাই, অমিত! একে সেই প্রিমিটিভ সরলতা বলতে পারো। দেখ, ও যখন বেঁচে ছিল—তোমার বাবার কাছে কথাটা তুলেছিলুম। অরবিন্দ বলেছিল, তা কী করে হয়? এখন অমিত পড়াশোনা করছে। তা ছাড়া, বিয়ের বয়সও তো হয়নি। হুম! তোমার বাবা আরও বলেছিলেন, অমিতের অনেক অ্যামবিসন আছে!

—জ্যাঠামশাই, প্লীজ! ওসব ভুলে যান।

—ভুলেছিলুম তো। তুমি আবার মনে করিয়ে দিলে। চলো, এগোনো যাক।

—আজ থাক বরং। জমি তো উঠে পালাচ্ছে না। কাল যাব বরং।

দয়াময় আমার দিকে কেমন দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—ও, আচ্ছা! তাহলে তুমি বসে-বসে অশ্রুপাত করো। আমি বরং দেখি দুএকটা তিতির পাই নাকি।

বলেই উনি বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন। বিশাল ওই মানুষ, পায়ে গামবুট, কাঁধে বন্দুক ও কার্তুজের ঝোলা, মাথায় টুপি। বাঁয়ে ঘুরে চরে নামলেন। কিছুক্ষণ নদীর তলায় হারিয়ে রইলেন। তারপর ওপারে বাঁধে বিরাট আকাশের গায়ে তাঁকে আবার দেখতে পেলুম। অমন একলা ওঁকে কখনও এর আগে মনে হয়নি। এখন একটু ভয় হল। চারদিকে ওঁর শত্রু। এভাবে একটা বন্দুক নিয়ে কি আত্মরক্ষা করতে পারবেন? এলাকায় তিনজন জোতদার ইতিমধ্যে খুন হয়েছে। উনিও যে-কোনও সময় খুন হতে পারেন। তখন লালীর মা বলবেন, অমিতই ষড়যন্ত্র করে ওঁকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিস বলবে, তাই তো! হঠাৎ এই ছোকরা আচমকা শহর থেকে বাবার সম্পত্তি দেখার ছলে গ্রামে এল এবং…

বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। তারপর বাঁ চোখের কোণ দিয়ে যেন লালীকেই দেখতে পেলুম। —কী অমিত, কেমন আছ?

—তুমি ভাল আছ তো লালী? মৃত্যুর পর জায়গাটা কেমন বল তো? প্রেমিক পেয়েছ কি এখানকার মতো? কথায়-কথায় তাদের সঙ্গে কি শুয়েপড়া এখনও সহজ? লালী, আমি কিন্তু সেদিক থেকে এখনও ব্যর্থ।

—তুমি যে ভীতু! মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারো না। অথচ, তোমার সারা দেহে তীব্র কামনা পোকার মতন কিলবিল করে। অমিত, তোমাকে তাই পোশাক খুলতে বলেছিলুম, মনে পড়ছে তো? ওই ওখানটায় জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে তুমি আবিষ্কার করেছিলে আমি উলঙ্গ, আর বলেছিলে—এ কী লালী! তোমার শাড়ি কোথায়? আমি বলেছিলুম—কেড়ে নিয়েছে। তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে—কে? কে? তখনই বৃষ্টি আর বাতাস বেড়ে গেল। আমার জবাব তুমি শুনতে পেলে না।

—কী বলেছিলে লালী?

—বলেছিলুম, যে কাড়বার সেই কেড়েছে। এতদিনে আমার সম্পূর্ণতা। এবার তাই ভেসে গেলুম। বিদায়, অমিত! বিদায়!

—আর বলেছিলে, হাসতে হাসতে বলেছিলে, তুমিও প্যাণ্টটা খুলে ফেল। পারিনি। আমার সাঁতার দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তবু জলের তলায় সভ্যতাকে বাঁচাতে চাইলুম!

—অথচ……

—অথচ কি লালী?

—অথচ পোশাক খুলে ফেললেই কত সহজেই মানুষ সম্পূর্ণতা পায়।

—সে কী লালী, সম্পুর্ণতাটা কী?

—তার নাম স্বাধীনতা।……

স্বাধীনতা! আমার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে উঠল। লালী খুব ছেলেবেলা থেকেই তাহলে আমাকে এই স্বাধীনতার দিকে ডেকেছিল। তখন বুঝতুম না। পরেও কোনদিন বুঝিনি! নাটাকাঁটা কুঁচফল শ্যাওড়া-ঝোপের গুহায় ছায়ায় নির্জনে শুয়ে পড়ার মানে আরেক জন্মের দিকে লখীন্দরের মতো ভেসে যাওয়া—শিয়রে বেহুলা। জানতুম না। পদ্ম-শালুক-

কোটা ঝিলের জলে সেই স্বাধীনতার ডাক ছিল। চৈত্রের নির্জন মাঠে সেই স্বাধীনতার হাওয়া ছিল। নদীর চড়ায় জ্যোৎস্নায় গা এলিয়ে পড়ে থাকত সেই সোনালী রুপোলী স্বাধীনতা। কী বোকা ছিলাম এতদিন!

আমি ভালবাসতুম ব্রিজে শব্দকারী বেলগাড়ি, গলায় নীল রুমাল জড়ানো দাড়িওলা ফায়ারম্যান, পাহাড়ের চূড়ার ওদিকে ব্লাস্ট ফার্নেসের ছটা, সবুজ ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়ি, রাতের আকাশে এরোপ্লেন আর গালিভারস ট্রাভেল এক খণ্ড। ভালবাসতুম পুরনো কালের সাহিত্য, কিংবা পিকাসো আর দালির ছবি রবিঠাকুরের কবিতা হেনরি মুরের ভাস্কর্য। ক্লাসিকে-রোমান্টিকে মাখামাখি এক বিরাট সভ্যতাকে জানতুম শ্রেয় ও প্রেয়। সভ্যতার কয়েক হাজার বছর আমার মগজে ঢুকে পড়েছিল।

আর লালী ভালবাসত কুঁচ ফল, বিষাক্ত ধুঁতুল, লালপোকা নীলপোকা নির্জন গলিয়াড়ির পাখি, জ্যোৎস্না রাতে পরীর নাচ, মাঠের বিশালতা।

দুইয়ে কোন মিল ছিল না। আমি শহর থেকে নিয়ে যেতুম জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্বমূলক গল্প। লালী কুড়িয়ে আনত মাঠের নিঃসঙ্গ চাষা ইরাজ সখের রূপকথা। লালী গাইত প্রাচীন লোকসঙ্গীত, আমি আওড়াতুম আধুনিক কবিতা। কোনও মিল ছিল না, কোনও মিল!

অথচ লালীকে দয়াময় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ক' বছর দিব্যি আধুনিক মেয়ে সেজে সে মফঃস্বল শহরের কলেজে বাসে যাতায়াত করত।

একদা লালী নদীর ধারে জায়গাটে আমাকে বলেছিল— তোর সঙ্গে একটা ভারি দরকারি কথা আছে, অমরু।

বলেছিলুম— কী কথা রে? এক্ষুনি বল্ না।

হঠাৎ চাপা গলায় ও বলেছিল— এখন বলা যাবে না। বলব'খন।

এই ছিল লালীর স্বভাব। কৌতূহলকে ফুটিয়ে দিয়েই নিঃশব্দে হেসে চলে যেত। তখন তাকে মনে হত সবে ফল ফুটবে এমন টানটান শাখা-প্রশাখার উত্তেজনা দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। এবং তার ওই না-বলা কথাটা আমাকে তারপর কতদিন উত্ত্যক্ত করেছিল বলার নয়। ভাবতুম—কী কথা বলবে লালী? কোনো গুরুতর শরীর-বিষয়ক নাকি তার আর সব উদ্ভট কথামালার অন্তর্গত? সে কি বলবে তার হাঁটুর নিচে আকর গজাচ্ছে উদ্ভিদের? তার শরীরে কোথাও ফুল ফোটানোর ষড়যন্ত্র চলেছে সেই গূঢ় খবর জানাবে?

মাঝে মাঝে ওকে দেখতুম কত সহজে মিশে যাচ্ছে উদ্ভিদের রাজ্যে। জড়িয়ে

পড়ছে দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক সব খেলাধুলায়। কেন যে চলতে চলতে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল মাঠে এবং দৌড়ুতে শুরু করল দিগন্তের দিকে, বুঝতেই পারতুম না।

ওর কাছে ছিল গভীর অথৈ কোন জলজগতের খবর, যেখানে মানুষেরা মৃত্যুর পর ঝিনুক হয়ে যায়। ও শোনাত, পাহাড়ের ওপর কোথায় আছে ডাকিনীর গুহা, যেখানে ঘণ্টা বাজলেই পৃথিবীতে রাত্রি আসে।

লালী একদিন বলেছিল, গ্রামের এই নদীর চড়ায় দেবদূত নেমেছিল। কেমন তার চেহারা? তাও সে বর্ণনা দিয়েছিল। গলায় রেশমি রুমাল, নীল চোখ, হলুদ দুই ডানা কাঁধে, লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর সেই দেবদূত লালীকে কী একটা ভাল খবর দিয়েই কেটে পড়েছিল। এ খবরটা অনেক পরে বলেছিল লালী। বাড়ো বউদির অর্থাৎ দয়াময়ের ভাইপো সুধাকান্ত—যে সেটেলমেণ্টের বড় অফিসার, তার বউয়ের ছেলে হবে।

এই সুধাকান্ত সারাক্ষণ আমাকে লালীর ব্যাপারে সন্দেহ করত। সে সেই বন্যার পর শহরে চলে গেছে। আর সে গ্রামে আসবে না। কারণ, লালীকে পাহারা দেবার দরকার ফুরিয়ে গেছে। লালীকে সভ্যতার দিকে টানতে তারই কারচুপি ছিল। দয়াময়কে ফুঁসলে বদলে ফেলেছিল। অথচ দয়াময়ের ইচ্ছে ছিল, লালীকে তিনি খাঁটি মেয়েজোতদার করে ছাড়বেন। অল্পস্বল্প লেখাপড়াই সেজন্য যথেষ্ট।

দেখতে দেখতে লালী বড় হল। কিন্তু তবু তার ওই বন্যতা গেল না। সভ্যতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সে ঘুরে বেড়াত বিষাক্ত ধুঁতুল, লালপোকা, নীল-পোকা, পাখি, প্রজাপতি, কুঁচফলের পৃথিবীতে। আমাদের এই পাড়াগাঁর পাশে কাঁচা রাস্তাটায় ইতিমধ্যে পিচ পড়েছিল। মাঠে বিশাল ফ্রেমে টাঙানো হয়েছিল বিদ্যুতের ভারি তার। ফ্রেমের গায়ে লাল ফলকে সাদা মড়ার মাথা ও দুটো আড়াআড়ি হাড় আঁকা ছিল। তাতে নাকি লেখা ছিল: সভ্যতা। অতএব সাবধান!

অবশ্য এ কথা লালীর। আমি পড়তুম: এগারো হাজার ভোল্ট সাবধান। ও পড়ে বলত—সভ্যতা। অতএব সাবধান।

একদিন লালী বলেছিল—কেন আমার পিছনে ঘুরঘুর করিস বল্ তো?

তখন সে নদীর ধারের বাঁধে যেতে যেতে হঠাৎ জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। আমি তার পিছু ছাড়িনি। জারুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে

দয়াময় মাথা নাড়লেন—নাঃ!

লালী বাঁধের দিকে যাচ্ছিল? আমার মধ্যে একটা তীব্র উত্তেজনা জাগল। এক ঝাঁকে নিচে নামলুম। কেউ আমাকে কোন প্রশ্নও করল না—কোথায় যাচ্ছি। প্রশ্ন করার এটা সময় নয়।

উঠোনের জল এক-বুক। তীব্র স্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। বেরিয়ে যেতেই রাস্তায় জল বেড়ে গেল। সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকে। নদীর বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলুম। চিতসাঁতার দিচ্ছিলুম। স্রোতের সপক্ষে ভেসে যেতে যেতে যখন একটা নিচু জায়গায় পৌঁছলুম, টের পেলুম, বাঁধের এই অংশটাই যা টিকে আছে। জায়গাটা আন্দাজ কুড়ি ফুট-বাই-ছ ফুট এবং লম্বাটে, তার গায়ে অনেক জড়াজড়ি গাছ। তার নিচে ঝোপগুলো ডুবে গেছে। দ্রুত সন্ধ্যা আসছিল। আমি উথাল-পাথাল জলের শব্দের ওপর তার-তীব্র কিছু শব্দ ছুঁড়ে দিলুম—লালী! লালী!

পরক্ষণেই খুব কাছে সাড়া পাওয়া গেল—আছি!

আশ্চর্য! লালী আমার খুব কাছেই একটা হিজল গাছের ছড়ানো ডালে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। ভিজে শাড়িটা গায়ে জড়ানো। শেষ আলোয় ওকে দেখে মনে হল এক প্রাগৈতিহাসিক কোন সত্তা—হয়তো প্রাণী নয়, অন্যকিছু—মানুষের ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—লালী! ওখানে কী করছ?

লালী হাত তুলে ডাকল।—চলে এস অমিত।

শশব্যস্তে গাছে উঠে যেই তার দিকে এগিয়েছি, ও লাফ দিয়ে জলে পড়ল। মুহূর্তের ঝোঁকে আমিও ঝাঁপ দিলুম। ও দ্রুত এগোচ্ছিল। ওকে অনুসরণ করলুম। আর সেই সময় আবার বৃষ্টি নামল। আরও ধূসর হয়ে গেল সব কিছু। তবু মরিয়া হয়ে ওকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ডাকলুম—লালী! এই লালী!

লালী বার বার সাড়া দিয়ে গেল।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ হাতে কী একটা শক্ত ঠেকল। অমনি সেটা ধরলুম। মনে হল একটা প্রকাণ্ড লোহার রেলিং। সেটার ওপর পা রেখে উঠে বসলুম। তারপর শুনলুম লালীর কণ্ঠস্বর।—অমিত।

—লালী!

লালীকে রেলিঙের অন্যপ্রান্ত দিয়ে উঠতে দেখলুম। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে

সন্ধ্যাব আবছায়ায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে কাছে এসে বলল—সাঁকোটা উপড়ে গেছে দেখছ? এখানে এসে আটকেছে!

আমরা পাশাপাশি বসে আছি, হঠাৎ লালী বলে উঠল—এই অমিত, আজ তোমাকে সেই পুরনো কথাটা বলব।

আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধবেই প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললুম—একি লালী! তোমার কাপড়চোপড় কোথায় গেল?

—সাঁতাব দেওয়া যায় না। তাই ফেলে দিয়েছি। তুমিও সব ফেলে দাও।

সেই রাতে পৃথিবী আমাদেব দুজনকে শোবার মতো একটুও জায়গা দেয়নি। তা পেলে আমরা দুটি প্রাচীন সরীসৃপের মতো অন্ধ ভালবাসায় ঘনীভূত হতে পারতুম।

আমরা সেই বেলিঙে অতিকষ্টে বসে থাকলুম—অনেক অনেকক্ষণ। কথা খুঁজলুম। এবং এক অদ্ভুত বন্য গন্ধে আমাদের শরীবেব ভিতবে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কিছু ফুল ফুটল। নাকি আমাদের দুই সভ্যতাবর্জিত নগ্ন শরীর থেকে অজস্র আঁকুর গজাল শেকড়বাকড়ের ষড়যন্ত্রে? তাই তখন দরকাব ছিল একটুকবো মাটি। অথচ কোথাও তখন মাটি নেই।

এক সময় বললুম—লালী, তোমার সেই কথাটা?

—হ্যাঁ, কথা।

বলে সে কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকল। তাবপব খুব আস্তে বলল—কথাটা হয়তো ফুরিয়ে গেছে। নেই আর।

—লালী, হেঁয়ালি করো না।

হঠাৎ সে হেসে উঠল। কথাটা ফুরিয়েছে। তবু কথা আবো থাকে, অমিত। সে কথা শুনতে হলে আরো দূরে যেতে হবে। চলে এস।

সে তক্ষুণি অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দিল জলে। চেঁচিয়ে উঠলুম—লালী!

লালীর ডাক শোনা গেল।—চলে এস!

অসম্ভব। এই দুর্যোগে আর ঝাঁপ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। পারলুম না। কাকুতি মিনতি করে ওকে ডাকতে থাকলুম। ও শুধু দূর থেকে দূরে যেতে যেতে বলল—চলে এস!

আমি রাগ উত্তেজনা দুঃখে অস্থির হয়ে বসে থাকলুম। ওই ডাকে সাড়া দিয়ে এগোবার সাহস আর শক্তিও আমার ছিল না।···

এখন বুঝতে পারি, ওই ছিল লালীর মুখে স্বাধীনতার ডাক। যে স্বাধীনতায় অতিক্রান্ত হয় দিনরাত্রি, সূর্য ওঠে, চাঁদ জ্যোৎস্না দেয়, এই ব্রহ্মাণ্ড চলে যেতে থাকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের ভেগা নক্ষত্রের দিকে, বুদ্বুদের মতো প্রসারিত হয় স্পেস, সময় হয়ে ওঠে গতিবান—আর যে স্বাধীনতায় মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদ আসে, ফুল ফোটে, প্রাণীরা জন্ম নেয়, লালী সেই খাঁটি স্বাধীনতাকে জেনেছিল। তার দিকে চলে যাচ্ছিল আমৃত্যু। ওই যাওয়াই তার জীবন।

হায়, সেই স্বাধীনতার ডাক কেউ শোনে, কেউ জানে—অনেকে শোনে না, অনেকেই জানে না! জন্মের পরই ইতিহাস চোখে পরিয়ে দেয় সভ্যতার ঠুলি। লালী ছিল আমারই স্বাধীনতার টান। আমি ভাসতে পারিনি। সভ্যতায় আছি। পোশাকে কার্পেটে ফুলদানিতে, পিকাসো রবিঠাকুরে।

—এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।

যেন দয়াময় আবার খুব পাশ থেকে কথা বলে উঠলেন। আবার আমি ঝোপটা দেখতে থাকলুম। দেখলুম, কালো বিষ-পিঁপড়ে, লালপোকা, মাকড়সার জাল, ছত্রাক, সাপের খোলস, শ্যাওলা, ভাঙা ডিম, গিরগিটি, সবুজ সাপের ছায়াধূসর স্যাঁতসেঁতে উর্বর পৃথিবীতে আলুথালু চুলে লালী শুয়ে আছে। ভাঁড়ুলে গাছের নিটোল গুঁড়ির মতো খয়েরি দুই উরু, 'শঙ্খের মতন করুণ যোনি', তার ধূসর দুই স্তনের বোঁটায় হাজার-লক্ষ বছরের মানুষের শৈশব জটিল হরফে লেখা। ফিসফিস করে ডাকলুম—লালী!

আর বাঁধের দিকে পরপর দু'বার শব্দ হল। চমকে উঠে দেখলুম, দয়াময় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন। ঝাঁকটা ভয় পেয়ে আমার মাথার ওপর এসে পড়তেই আমিও ভয়ে মাথা নাড়ালুম। তারপর আড়চোখে দেখি দয়াময় এদিকে বন্দুক তুলছেন। পাখিগুলো দূরে চলে গেল। কাঠ হয়ে বসে আছি। তারপর দয়াময়ের জুতোর শব্দ হল।—এখনও বসে আছ, দেখছি!

—না। ফিরব। আপনি এরই মধ্যে ফিরলেন যে?

—ফিরলুম। তোমাকে একটা কথা বলতে বাকি ছিল।

—বলুন।

—নদীর ধারে সবজিচাষ করত একটা লোক। ওই ওখানটায়। তোমার মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ। গণেশ রাজবংশী। সে নাকি জ্যোৎস্নায় চরে পরী নামতে দেখেছিল।

তার ছেলেকে মনে পড়ে ?

-খুউব। কী যেন নাম ছিল -

—সীতু।

—হ্যাঁ, সীতু। পাঠশালায় আমাদের সঙ্গে পড়েছিল।

দয়াময় ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলেন।—সে রাতে লালী কোথায় যাচ্ছিল জানো ? সীতুর কাছে।

আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে।

-সীতুরা থাকত ওখানেই। আর লালী তাদের খবর নিতে যাচ্ছিল। তাছাড়া আর কী বলব ?

—কেন ?

—বুঝতে পারছ না কেন ? দয়াময় জ্বলে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হল। তারপর বললেন—খুব ছেলেবেলা থেকে এটা চলছিল—একটুও তলিয়ে ভাবি নি। ওই শুওরের বাচ্চাটা লালীকে নষ্ট করেছিল। লালীকে সে······

অনেক কষ্ট পাচ্ছেন দয়াময়, তাই কথা আটকে গেল। চোখমুখ লাল হয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে আবার বললেন—পরে গণেশ বলেছিল আমাকে। লালী বন্যার রাতে ওদের কুঁড়েয় যায়। তখন ছোঁড়াটা ছিল না। রিলিফের নৌকো ডাকতে গিয়েছিল গ্রামের দিকে। ওর বাবা গাছের ডালে বসেছিল। অন্ধকারেও ওর চোখে কিছু এড়ায়নি। ও লালাকে টের পেয়েছিল। খুব বকাবকিও করেছিল। কেন এই দুর্যোগে এভাবে এসেছে ? তারপর ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে এ কি সর্বনেশে কীর্তি ! তারপর—ঘোড়ার মতো মুখ তুলে হাসলেন দয়াময়।

—তারপর ?

—তারপর লালী আবার ভেসে যায়। বুড়ো আর ওকে দেখতে পায়নি।

—তাহলে পথে এই ঝোপের মধ্যে···

কথা কেড়ে দয়াময় বললেন—কী ঘটেছিল আমি জানি না। হয়তো কাপড়ে আটকে গিয়েছিল।

—না। ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল তখন।

দয়াময় আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকালেন।

—আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় ওর দেখা হয়। তারপর ও সাঁতার কেটে ওদিকে চলে গিয়েছিল।

—তুমি জানো, সীতু ছোঁড়াটাকে কী শাস্তি দিয়েছি?

—খুন করেছেন?

—এই ঝোপের তলায় মাটির অনেক নিচে তাকে লালীর জন্যে অপেক্ষা করতে পাঠিয়েছি।

—আর গণেশবুড়ো?

—ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে তার কাছে যাই, লালীর কথা শুনতে। লালীর আরেকটা জীবন ছিল। ও জানত, আমি জানতুম না।

—আমি একবার যাব বুড়োর কাছে।

—যেও। তবে কষ্ট পাবে। আমি বাবা। হয়তো কষ্ট পাই। হয়তো কষ্ট পেতেই যাই। তুমি কি কষ্ট পেতে চাইবে লালীর জন্য? তোমাকে তো ও ভালই বাসে নি!

বলে দয়াময় কেমন একটু হাসলেন। তারপর কিছু না বলে হনহন করে মাঠের দিকে এগোতে থাকলেন।

তা হলে সীতুর জন্যই লালী......আমার গলায় কী আটকে গেল। তাই নিয়ে গণেশ রাজবংশীর কুঁড়েঘরটার দিকে চললুম। আমি এখন লালীর অন্য জীবনের কথা শুনব, যা আমার আজও শোনা হয়নি। সবুজ তেজী উদ্ভিদের ভেতরে এখন বুড়ো চাষা হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। আমাকে দেখলে বেরিয়ে এসে ভিজে ধুলোয় ধূসর শরীর ছায়ায় এলিয়ে রেখে ফ্যাকাসে চোখে পৃথিবীর একটা পুরানো গল্প শুরু করবে। সেই গল্পের কোন শেষ নেই। কারণ সেই গল্প লালী নামে এক মেয়ের—যে স্বাধীনতা জেনেছিল।......

তারাচাঁদের হাসি

আমাদের গাঁয়ের তারাচাঁদ চক্রবর্তী একেবারে রাশভারি না হলেও মোটামুটি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকে বাচালতা করতে কেউ দেখেনি। কথা বলতেন কম। বেশি ঢ্যাঙা হওয়ার দরুন একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতেন। আর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় চোখদুটো আকাশে তুলে রাখতেন। যেন চোখে-চোখে তাকিয়ে কথা বলতেই পারেন না।

কিন্তু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্যাপারটা ঠিক নয়। চোখে চোখ রাখতেও পারেন তারাচাঁদ। আসলে তাঁর চোখদুটো ট্যারা। একবার দারোগা ও চোরের সামনে দাঁড়িয়ে···

না। তার আগে বলা দরকার তারাচাঁদ আদৌ রসিক মানুষ ছিলেন না এবং তাঁর মুখের হাসির সঙ্গে ডুমুরের ফুলের উপমা দিতে হয়। মজার কথা, এই ডুমুরের ফুল কালেভদ্রে সত্যি-সত্যি ফুটতে দেখা যেত আর হুলুস্থুল বাধিয়ে ছাড়ত। অর্থাৎ তিনি যখন হাসতেন, তখন এমন একটা মারাত্মক হাসি হাসতেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। হাসিটা এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি অব্দি চন্দ্রকলা কিংবা ধনুকের মতো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ঝলিক দিয়ে মিলিয়ে যেত এবং তার সূচনায় ফ্যাঁচ করে একটা নাকঝাড়ার মতো শব্দ। তারপর মুখখানা যা ছিল তাই। সেই রকম গম্ভীর।

তারাচাঁদের এই দুর্লভ হাসি কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছিল। প্রতিটি হাসি কীভাবে যে রহস্য আর প্রচুর জল্পনা-কল্পনার কারণ হত, ভাবা যায় না। হিড়িক পড়ে যেত সারা গাঁয়ে, তারাচাঁদ হাসলেন কেন? সহজে যে মানুষ হাসেন না, তাঁর এমন বিদঘুটে হাসির পিছনে লোকেরা ধরে নিত কোনও-না-কোনও গোপন কেলেঙ্কারি আছেই এবং যাকে দেখে হাসতেন, তার প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। একবার নিজেরই জ্ঞাতিভাই অনাদির বিয়ের পর বউ দেখতে গেলেন তারাচাঁদ। সঙ্গে কিছু উপহারও ছিল। বউকে দেখে বললেন, তুমি মধুপুরের অক্ষবাবুর মেয়ে গো! তুমি আমাদের কত আপনজন। তারপর ফ্যাঁচ করে সেই বিদঘুটে হাসি। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একান থেকে ওকান অব্দি ঝলিক। কিন্তু অনাদির বুকে ওটা বাঁকা ছুরিই হল। সে তারাদার পেছন পেছন ঘোরে যখন-তখন। ও তারাদা বলো না গো হাসলে কেন? তারাচাঁদ

ও লাইনে আর যাবারই পাত্র নন। এর ফলটা খুব খারাপ হয়েছিল। অনাদি বউকে তার বাপের বাড়ি রেখে চলে এল তো এলই। বৌকে নিয়ে কত অশান্তি, মামলা মোকদ্দমাও হয়ে গিয়েছিল।

তারাচাঁদ ছিলেন সর্বচর মানুষ। টো টো করে নানা জায়গায় ঘুরতেন। কাজ ও অকাজ দুই-ই তাঁর নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাত। প্রথম জীবনে গাঁয়ের বারোয়ারি দেবী সিংহবাহিনীর পুজোআচ্চা করে মাইনে পেতেন। পোষায় না বলে ছেড়ে দিয়ে একটা পাঠশালা খোলেন নিজের বাড়িতে। চারপাশে পোড়ো ভিটেয় নিমের জঙ্গল। একা মানুষ। মা বেঁচে থাকতে যোলো বছর বয়সেই এক বালিকার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বালিকাবধূ সে-আমলের ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা পড়ে। তারপর থেকে তারাচাঁদ একাই থাকতেন। গোটা সাতেক বাচ্চা জুটিয়েছিলেন বাগদিপাড়ার। তারা চেঁচিয়ে স্বরে অ স্বরে আ করত। আর তারাপণ্ডিত খুঁটিতে ঠেস দিয়ে হুঁকো টানতেন।

এও চলেনি। তখন কবরেজিতে নামেন। তখনও ম্যালেরিয়ার যুগ চলেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে কাঠির মতো গলা আর জালার মতো প্রকাণ্ড পেট নিয়ে বিকট ভুতুড়ে চেহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হঠাৎ-হঠাৎ রোদ্দুরে শুয়ে হিহি করে রামকাঁপুনি কাঁপছে। তারাচাঁদ রুগীর সামনে বসে মাটিতে আঁক কাটেন হেসোর ডগা দিয়ে। তারপর একটা কাঁচকলা এককোপে কেটে বলেন, বল্, নাই! রুগী চিঁচিঁ করে বলে, নাই।

আমরা পিঠোপিঠি চার ভাই। চারজনেরই পেটে এচোঁড়ের মতো পিলে। জেলা বোর্ডের হাসপাতাল থেকে বাবা কুইনিন এনে গেলান। কাজ হয় না। শেষে আমাদের নাস্তিক বাবার মতি টলল। তারাচাঁদকে ডাকলেন। সেদিনই আমরা দুষ্ট-চতুষ্টয় এক কীর্তি করে বসেছি। মাঠের পুকুরে পদ্মফুল তুলতে গেছি। বাবা পাল ডাকিয়ে এনে বাড়ির সামনে প্রকাশ্য রাজপথে পাঁচিলের ধারে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। সবাই ন্যাংটা এবং দু'হাতে দুইকান ধরে দাঁড়িয়ে আছি। লোকেরা রাস্তার ওখানটায় এসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চলে যাচ্ছে। হেন সময়ে তারাচাঁদ এলেন পিলে কাটতে।

এসেই দুষ্টচতুষ্টয়ের দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে সেই অঘটনঘটিয়সী ফ্যাচ হাসিটি হাসলেন।

আজও ভুলিনি। আমৃত্যু ভুলব না ওই হাসি। এখনও তারাচাঁদের সেই হাসিটি দৈবাৎ মনে ভেসে উঠলে লজ্জায় দুঃখে ধরিত্রী দ্বিধা হও গোছের ক্ষত

প্রতিক্রিয়া বর্জরিত করে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারাচাঁদকে ক্ষমা করতে পারি না।

হুঁ, সেই দারোগা ও চোরের গল্পটা।

ট্যারা চোখের বিপদ এই। শ্যামের দিকে তাকালে রাম দেখে তার দিকেই চোখ। তো দারোগা ও চোরের সামনে দাঁড়িয়ে তারাচাঁদ তাঁর কিংবদন্তীর হাসিটি হেসেছিলেন। অমনি দারোগা মহাখাপ্পা হয়ে তারাচাঁদকে বেটনের গুঁতো মেরে বসেন। তারাচাঁদ পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করেন। তারপর দ্বিতীয় গুঁতোর কয়েক ইঞ্চি তফাত গিয়ে ছুটে পালান। সে আমলে পাড়াগাঁয়ে জঙ্গল ছিল আনাচেকানাচে। তা ফুঁড়ে তীরের মতো ঢুকে যান। সেপাইরা হন্যে হয়ে এসে জানায়, ভাগলবা শালালোগ। পূর্ণ চৌকিদার ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করে, কালপরশুর মধ্যে আসামীকে থানায় হাজির করব হুজুর। দারোগার রাগ তবু পড়ে না। তখন বেচারা চোর অর্থাৎ গণশা রাজবংশী বেধড়ক মার খায়।

পরে দারোগাবাবু অনেককে বলেছিলেন, না। ব্যাটা বিটলে বামুন আমার দিকে তাকিয়েই হেসেছে। ওসব ট্যারা-ফ্যারা নেহাত চালাকি। আমি বদমাস চরিয়ে খাই, আমাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

শুনেছি, দারোগাবাবুর মনে খুব আঘাত লেগেছিল। মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন অনেকদিন অব্দি।

আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

কায়েতপাড়ার একটেরে থাকতেন গোপাল সিঙ্গি। সিঙ্গি দম্পতির ছেলেপুলে হয়নি। মোটামুটি ভাল অবস্থা ছিল। সিঙ্গি মশায়ের স্ত্রী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। সবসময় মুখে হাসিটি লেগেই থাকত। স্কুল থেকে ফেরার সময় শর্টকার্ট করতে ওঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসতাম। রোয়াকে বসে সিঙ্গিমশাই তামাক খেতেন আর সুখেশ্বরী তাঁর পাকা চুল তুলতেন চিমটে দিয়ে। আমাকে দেখলেই মিষ্টি হেসে কাছে ডাকতেন। স্বামীকে বলতেন, দেখছ? ছেলেটাকে আমাদের বামুনকায়েতের ঘরের বলে মনে হয়। ও খোকা একটু দাঁড়াও না বাবা!

তারপর দৌড়ে বাড়ি ঢুকে দুটো মোণ্ডা কিংবা নাড়ু এনে ওপর থেকে সাবধানে হাতে ফেলে দিতেন।

আসলে আমাদের মুসলিম পাড়ায় সবাই চাষী। আমাদের পরিবারের শিশু। ওরা লেখাপড়াটা জীবনে ক্ষতিকর ভাবত। বলত, দু'কলম শিখলেই তো মামলাবাজ হয়ে যাবে। তাছাড়া বাচ্চারা হাঁটতে শিখলেই কত সাংসারিক কাজে

লাগে। লেখাপড়া শিখে আলসে-বাবু হয়ে যাবে না? তখন কে করবে গরু চরানো বা চাষবাসের কাজ?

যাই হোক, সুখেশ্বরীর ওকথার মানে তখন বুঝতাম না। বুঝলেও একজন সুন্দরী মহিলা, তাঁর মিষ্টি হাসি, তাঁর মাতৃভাব এবং সন্দেশ আমাব কাছে অনেক জরুরী ছিল।

তো এই গোপাল সিঙ্গি হঠাৎ রাতারাতি ওলাওঠায মারা যান। সকালে উঠোনের তুলসীতলা থেকে যখন তাঁর মড়া ওঠানো হচ্ছে, তারাচাঁদ ব্যস্ত হয়ে হাজির হলেন। শোক প্রকাশ করে বললেন, আহা হা! বড ভাল মানুষ ছিলেন গো। ব্রাহ্মণের প্রতি সদাসর্বদা উপুড়হস্ত ছিলেন গো! যখনই এসে দাঁড়িয়েছি তখনই....

কথা হঠাৎ থামিয়ে তারাচাঁদ চক্কোত্তি তাকালেন সুখেশ্বরীর দিকে এবং বেমক্কা সেই আকর্ণ বিদঘুটে ফ্যাঁচ হাসিটি হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন অভ্যাসমতো।

ব্যাপারটা বাড়িসুদ্ধ লোক দেখেছিল এবং সেটা মৌচাকে ঢিলের কাণ্ড বাধিয়েছিল। পরে তুমুল জল্পনা শুরু হয়ে যায়, তারাঠাকুর সিঙ্গিমশায়েব বিধবাকে দেখে হাসল কেন? কিমিদং? আলবৎ গুহ্যবৃত্তান্ত আছে।

এটা অনেক দূর গড়াল ক্রমশ। গুজব রটে গেল, সুখেশ্বরী আসলে স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন। বিধবাব ওপর জ্ঞাতিদের নির্যাতন শুরু হল। কিন্তু সিঙ্গি তো পুড়ে ছাই। কীভাবে প্রমাণ হবে? এদিকে আইন সুখেশ্বরীর পক্ষে। কারণ স্থাবব অস্থাবর সব সম্পত্তি তাঁর নামে দিয়ে গেছেন সিঙ্গি।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের আমোদগেঁড়ে বয়স্করা একদিন যুক্তি করে তারাচাঁদকে পাকড়াও করলেন। এ রহস্য তাঁকে ফাঁস করতেই হবে। তারাচাঁদ তো অকারণে হাসেন না। ছ্যাবলামির ধাত তাঁব নয়। তাছাড়া তিনি সর্বচর মানুষ। সবার হাঁড়ির খবর নাকি রাখেন।

তাছাড়া গোলমাল এখন অনেকটা চুকে গেছে। এখন বললেই বা ক্ষতি কী? সবাই তারাচাঁদকে সাধাসাধি করতে থাকলেন। লোভ দেখালেন। কেউ কেউ শাসালেনও। কিন্তু তারাচাঁদ গম্ভীর। শেষঅব্দি 'এমনি হেসেছি—হাসি এল, তাই হেসেছি' ইত্যাদি বলে কেটে পড়লেন। সবাই বেজার হয়ে বসে রইলেন বারোয়ারি বটতলায়।

এসব ঘটনা আমার বড় হয়ে শোনা। এইসঙ্গে আরও যা শুনেছিলাম তা

না বললে তারাচাঁদকে নিয়ে এই গল্পের পটভূমি স্পষ্ট হবে না। অবশ্য সে-গল্প খুবই ছোট্ট হবে।

নিমবনের মধ্যে তারাচাঁদের ভিটের কথা আগেই বলেছি। চোতমাসে সারা নিমবন মিঠে নিমফুলের গন্ধে মৌমৌ করত। একদিন তারাচাঁদ উনুনে চাল ফোটাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর গায়ে ছায়া পড়ল। চমকে ঘুরে দেখেন, সুখেশ্বরী। তারাচাঁদ নাকি সেই দারোগার পাল্লায় পড়ার আতঙ্ক কিংবা তারও বেশি আতঙ্কে কাহিল হয়ে যান। বিধবা কায়েতনী শক্ত মুখে সেই হাসির কারণ দাবি করেন। তারাচাঁদ বিব্রত হয়ে 'কিছু না', 'এমনি' ইত্যাদি বলেও রেহাই পান না। সুখেশ্বরী তাঁরই উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত লকড়ি তুলে তাড়া করেন। তারাচাঁদ প্রাণভয়ে ঘরে ঢোকেন।

তারপর কিছু ঘটে থাকবে। তারাচাঁদকে প্রায়ই সুখেশ্বরীর বাড়ি যাতায়াত করতে দেখা গেল। শেষে একদিন তারাচাঁদ নিজের ঘরে ঘুঘু চরতে দিয়ে সিঙ্গি-বাড়ি চলে এলেন। অবিকল গোপাল সিঙ্গির মতো রোয়াকে বসে তিনি হুঁকো খান। তবে তাঁর চুল কুচকুচে কালো। তাই হয়তো সুখেশ্বরীর চিমটে নিয়ে পাকা চুল তোলার উপায় নেই। কিন্তু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকাটি রোজ বিকেলে দেখতে পাই। সন্দেশও পাই।

সে-আমলে গ্রামসমাজে এ অনাচার সহজে মেনে নেওয়া হত না। অনেক হুলুস্থুল চলেছিল। কিন্তু ওঁরা দুজনে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। শেষঅব্দি ওঁদের একঘরে করা হয়। তারাচাঁদকে দেখতাম, সাইকেলে করে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে আনছেন। জমি বরাবর মুসলমান চাষীরা ভাগে আবাদ করত। কাজেই অন্নের কোনো অসুবিধে হত না। বরং ভাগচাষী ফয়েজ সেখ ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। তাকে সবাই ভয় পেত। তাই ওঁদের তেমন ক্ষতি করার হিম্মতও ছিল না কারুর। অবশ্য তারাচাঁদ বেহু খরুচে স্বভাবের বলে সব জমি শেষ পর্যন্ত ন'কড়া ছ'কড়ায় বিকিয়ে গিয়েছিল। খুব কষ্টেসিষ্টে চলত। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সুখেশ্বরী একটি ছেলের জন্ম দিলেন। কিন্তু শিশুটি জন্মান্ধ। লোকেরা হিড়িক তুলে ধর্মের জয়ঢাক বাজাতে থাকল। স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখতাম, মা তাঁর অন্ধ ছেলেকে কোলে নিয়ে হাত তুলে নিমবনে লেজঝোলা পাখি দেখাচ্ছেন। তারপর আমাকে দেখেই বলে উঠতেন, ওই দ্যাখ! ওই দ্যাখ কে আসছে। তোর দাদা রে! তোর মুসলমানপাড়ার দাদা! বল না দাদাকে, একটা পয়সা দাও। জিলিপি কিনে খাই।

কাতুকুতু খেয়ে অন্ধ শিশুর মুখে খিটখিট হাসি সেই প্রথম দেখি। এবং সে-হাসি তারাচাঁদের হাসি নয়।

এবার আমার ছোট্ট গল্পটা বলি।

দেশভাগের বছর। সেদিনই স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করা হবে। তারাচাঁদের ভিটে উজাড় করে ফুলেভরা নিমডাল ভেঙে এনে আমরা স্কুলের গেট সাজিয়েছি। বকুলফুলের মালায় ক্লাসরুম সাজিয়েছি। মর্নিং স্কুল। ক্লাস নাইনে পড়ি। প্রথমে ক্লাস টেনে ঢুকলেন হেডমাস্টারমশাই। হাতে ছুটির রেজিস্টার। জলদগম্ভীর গলায় পড়তে থাকলেন : দা স্কুল শ্যাল রিমেন ক্লোজ ফ্রম...

হঠাৎ অন্যসব ক্লাসের ছেলেরা হইহই করে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। আমরাও দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম গেটে। গেটের ওপাশে রাস্তা। গেট থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ালুম।

কাঁচা রাস্তা। ধুলোয় ভরা। সেই ধুলোর ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন প্রায় আধ-ন্যাংটো তারাচাঁদ। হাতদুটো বুকের ওপর এবং একগাছি দড়িতে বাঁধা। তাঁর গোড়ালিদুটোও বাঁধা এবং বিচুলির দড়ির ডগা স্বপ্নেশ্বরীর হাতে। স্বপ্নেশ্বরী তারাচাঁদের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আলুথালু বেশ ও চুল। দৃষ্টি নিষ্পলক, দূরগামী, রক্তবর্ণ। তাঁর কোলে অন্ধ ছেলেটাও রয়েছে। রাস্তায় ধুলোয় একটা দীর্ঘ টানা ছাপ রেখে চলেছে তারাচাঁদের শরীর।

এটা যে মড়া, বুঝতে একটু দেরি হল। তারপরই একটা মারাত্মক ভুল হল হয়তো। কারণ সব টের পেয়েও অন্তত কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আমি তারাচাঁদের মুখে সেই বিদঘুটে হাসিটা দেখে ফেললাম।

ট্যারা মানুষ—ঠিক কার দিকে তাকিয়ে হাসল, বোঝা কঠিন। কিন্তু হলফ করে বলছি তারাচাঁদ শেষ হাসিটি হাসলেন। একঘরে ও জাতিচ্যুত এক নারী তাঁর প্রেমিককে নদীর ধারে ফেলতে নিয়ে গেলেন। আব পথে প্রেমিক তারাচাঁদ আমাদেব দিকে তাকিয়ে একবার হেসে গেলেন। আমার শরীর শিউরে উঠল। আর তাকাতে পারলাম না।...

এ গল্পের মর‍্যাল কী? সেই উলঙ্গ রাজার গল্প? জানি না।

হরিপুরের বিশু

চন্দ্রকান্ত সকালে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, ওই পোড়ো বাড়িটাতে ভূত আছে জানিস শান্তা? মাঝরাতে হঠাৎ শুনি বেহালা বাজছে। তার মধ্যে আবার বিদঘুটে হাসিও। খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্!

চন্দ্রকান্ত হাসছিলেন না। সবসময় রাশভারি গম্ভীর মানুষ। রসিকতাও গম্ভীর মুখে করেন। সেজ নাতনী শান্তা তাঁর কথা শুনে খিলখিল হেসে বলল, না দাদামশাই। বেহালা নয়, মাউথ অরগ্যান।

ওই হল। চন্দ্রকান্ত বললেন। একটা কিছু বাজছিল তো? তোরাও শুনতে পাস তাহলে।

শান্তা আরও হেসে বলল, ভূত নয় দাদামশাই। ও তো বিশুদা।

সেটা আবার কে?

কণিকা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, হরিপুরের বিশু। ওকে তুমি দেখনি বাবা। ভারি অদ্ভুত ছেলেটা। হঠাৎ কোত্থেকে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, মা! বাবা! এসে গেছি আমি। ধরো, ঘরের ভেতর আছি—চেঁচামেচি শুনে যদি বলি, কে রে? অমনি বিশু বলবে, আবার কে—আমি সেই হরিপুরের বিশু।

চায়ের কাপ হাতে জামাই নন্দলাল বেরোলেন। বললেন, আসলে ওটা একটা হ্যাবিট। ধরুন, এবার আপনার সঙ্গে আলাপ হল। এরপর কোথাও দেখা হলে একমুখ হেসে বলবেই বলবে, চিনতে পারলেন না? আমি সেই হরিপুরের বিশু।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ভাল। তা ওই পোড়োবাড়িতে কেন?

চন্দ্রকান্ত আরামকেদারায় বসে আছেন। নন্দলাল শ্বশুরের পায়ের কাছে মোড়া টেনে থামে হেলান দিয়ে বসে বললেন, গতমাসে নবীনবাবু এসে একটা ঘরের চাবি দিয়ে গেছেন। অমু ওখানে গিয়ে থাকে। হাইকোর্টে এতকাল পরে ডিগ্রি পেয়েছেন নবীনবাবু। নিজে এসে বসবাস করে দখল রাখতে অসুবিধে আছে-টাছে আর কী! তাই রিকোয়েস্ট করলেন আমায়। তো…

কণিকা বললেন, গণ্ডগোলের বাড়ি। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু অমুকে তো জানো। বলল, আমি গিয়ে থাকব। বুঝতেই পারছ, বাড়িতে সেপারেট ঘর নেই যে বন্ধুবান্ধব এলে তাদের বসাবে। ওর তো রাজ্য জুড়ে

বন্ধুবান্ধব আর ওই হরিপুরের বিশু! যখন-তখন এসে একটু অসুবিধায় ফেলত। এইটুকু বারান্দা। অমুর সঙ্গে গাদাগাদি করে এই তক্তপোশটাতে শোওয়া। আবার কুমু এসে পড়লে তো বেচারা করুণ মুখ করে বলত, মা! আমি শুতে চললাম।...কোথায় রে? না—গিরিখুড়োর কাছে। বোঝো কাণ্ড! গিরিকে তুমি চিনবে বাবা! সেই যে পান বেচতে আসে, রোগা-পাতলা করে লোকটা?

চন্দ্রকান্ত বললেন, হুঁ। তা এই বিশুটি কে?

আজ ছুটির দিন। নন্দলালের দশমাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে অফিস যাওয়ার ঝক্কি নেই। লতাকে বাসে চেপে কলেজ যেতে হবে না। শান্তা আর মিতারও স্কুল নেই। বড মেয়ে মমতার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসেনি পাড়ার মেয়েগুলো। সে প্রতিবন্ধী মেয়ে। জন্ম থেকে একটা হাত আর একটা পা কাঠির মতো সরু। স্থানীয় স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে কলেজে পড়তে যাওয়া সম্ভবই হয়নি। সাইকেল রিকশো করে স্কুলে যাতায়াত করত দীর্ঘ বারোটা বছর। নন্দলালের সংসারটা বড়, আয়ের উৎসটা ছোট। সবে বড়ছেলে কমল কলকাতায় একটা চাকরি পেয়েছে। ছোট ছেলে অমল কোনো-গতিকে বি এ পাস করে এখনও বেকার।

এমন একটা বাড়িতে সাংসারিক আবহাওয়া খুব একটা ভাল থাকার কথা না। তবে মাঝে মাঝে চন্দ্রকান্ত কলকাতা থেকে মেয়েকে দেখতে আসায় আবহাওয়া নির্মল হয়ে ওঠে।

আর ওই কোন এক হরিপুরের বিশু। হঠাৎ কোত্থেকে এসে মেঘ-ঝড়-ঝাপটা কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুচিয়ে দেয়। সারা বাড়ির তখন তার দিকেই মন। গল্প করে গান গেয়ে মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে ক্যারিকেচার দেখিয়ে হরবোলার ডাক শুনিয়ে জমিয়ে দেয় একেবারে।

আজ ছুটির দিন, তাতে চন্দ্রকান্ত এসেছেন—তার ওপর হরিপুরের বিশু। সবার মনে খুশির আমেজ। বিশুর কথা বলতে গিয়ে কণিকা হেসে আলুথালু হচ্ছিলেন। মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল দাদামশাইকে।

কণিকা বললেন, বিশু কে—জিগ্যেস করেছ? বিশু কে নয়, তাই বলো।

স্ত্রীর কথায় একটু বিরক্ত হয়ে নন্দলাল বললেন, ওরকম করে বললে উনি কী বুঝবেন? আমি বলছি, শুনুন বাবামশাই। আসলে (এটা নন্দলালের মুদ্রাদোষ) ছেলেটা একটু বাউণ্ডুলে ভবঘুরে টাইপ। বাবা বেঁচে আছে বলে, কিন্তু আমার ধারণা এতেও কিছু গণ্ডগোল আছে।

শান্তা বলে উঠল, বলো না বাবা, বিশুদার বাবার হোটেলের গল্পটা।

নন্দলাল বললেন, সে এক কাণ্ড। বিশু বলত, তার বাবার একটা হোটেল আছে কাঁদিতে। অমুকে তো জানেন। বলল, বেশ। চলো, আমরা ক'জন মিলে খেয়ে আসব তোমার বাবার হোটেলে। তারপর সত্যিসত্যি জনাচার-পাঁচ ছেলে মিলে বিশুর সঙ্গে কাঁদি গেল। হ্যাঁ—হোটেল একটা আছে বটে। সেই হোটেলের মালিককে বিশু বলল, বাবা! এরা আমার বন্ধু। এদের ভাল করে খাইয়ে দাও। তারপর খেলও। খাওয়ার পর ওরা হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়েছে—অমু দেখে কী, বিশু গিয়ে হোটেলওয়ালাকে দাম মেটাচ্ছে। ফিরে এলে অমুরা ওকে চেপে ধরল—কী রে? বাবার হোটেল বললি এবং অতবার বাবা-টাবাও খুব বললি, কিন্তু দাম মেটালি যে? বিশু বলল কী জানেন? বিজনেস! বিজনেসের ব্যাপারে বাবার একটা প্রিন্সিপল্ আছে। ছেলে আছি—আছি। এটা তো বাবার বাড়ি নয়—হোটেল। বিজনেস!

নন্দলাল হোহো করে হাসতে লাগলেন। কণিকাও হাসতে হাসতে বাবার কাঁধের কাছে ইজিচেয়ারের কোনা আঁকড়ে ধরলেন। লতা শান্তা মিতাও হেসে গড়িয়ে পড়ল। তক্তাপোশের কোনায় দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল মমতা। সেও একটা হাঁটুর কাছে মুখ রেখে ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

শুধু চন্দ্রকান্ত গম্ভীর। বললেন, হুঁ। দেখো আবার কোনো...

শ্বশুরের বক্তব্য আঁচ করে নন্দলাল দ্রুত বললেন, না, না। ওসব ব্যাপারে ঠিক আছে। দু'বছর ধরে তো আসা-যাওয়া করছে। বাড়ির ছেলের মতো মিশছে। আমায় বাবা বলে ডাকে— ওকে বলে মা। আসলে ছেলেটার—বুঝলেন, কোথাও একটা ডেলিকেট পয়েন্ট আছে। একটু স্নেহ-ভালবাসা পেলেই খুশি। তাছাড়া আমার স্বভাব তো আপনি জানেন বাবামশাই! ম্যানওয়াচিং আমার হবি। আমি ওকে ভীষণ স্টাডি করেছি। অত্যন্ত সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী।

কণিকা যোগান দিলেন।...লতুদের আপন বোনের মত ভালবাসে। যখনই আসে একগাদা করে সন্দেশ—তোমায় দেখাচ্ছি।

বলে কণিকা ঘর থেকে একটা বড় সাইজের সন্দেশের প্যাকেট নিয়ে এলেন। খুলে দেখিয়ে বললেন, কাল রাত দশটায় এল। তুমি তখন শুয়ে পড়েছ। ওখানে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, বারান্দায় মশারি! তার মানে নিশ্চয় কলকাতার দাদামশায় এসেছেন। অলরাইট মাম্মি, সাইলেন্স! বলে এই

প্যাকেটটা দিল। বলে কি, বর্ধমানের শক্তিগড় থেকে আসছি। শক্তিগড়ের ল্যাংচার নাম শুনেছেন? সেই ফেমাস ল্যাংচা। দাদামশাইকে সবার আগে দেবেন। বললাম, খাবি নে? রাত দশটায় আর খাওয়া বাকি থাকে? বলে অমুর কাছে শুতে চলে গেল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আমাকে চেনে?

শান্তা বলল, বিশুদা কাকে না চেনে তাই বলুন?

নন্দলাল বললেন, না—আপনার কথা শুনেছে আর কী! এরা সবসময় আপনার গল্প করে তো।

কণিকা প্যাকেটটা মুড়ে বললেন, ওর অনেক গুণ, বাবা। আপদে-বিপদে ওকে দেখলে আমার সাহস হয়। সেবারে মিতুর টাইফয়েড। যায়-যায় অবস্থা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় বইছে। সেই দুর্যোগের মধ্যে বেরিয়ে গেল। কাঁদি থেকে ডাক্তার সোমের মতো লোককে টেনে আনল ছ'মাইল রাস্তা। তখন রাত প্রায় নটা। সমানে ঝড়বাদলা চলেছে।

অবিশ্বাস্য! নন্দলাল বললেন। চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না বাবামশাই! বিশুর ইনফ্লুয়েন্স কতটা ভাবতে পারবেন না। একবার একজায়গায় ডি এম উপস্থিত আছেন। আমি আর সব অফিসাররা আছি। হঠাৎ কোত্থেকে বিশু এসে ডি এমকে বলে কী, চিনতে পারছেন স্যার? আমি সেই হরিপুরের বিশু! ডি এম অবাক। আমি তো মুখ নিচু করেছি। ছেলেটা কি নির্বোধ? তারপর বিশু বলল, মনে থাকার কথা স্যার! সেই যে তারাতলার ফাংশনে আপনি চিফ গেস্ট—আমি মাউথ অর্গান বাজালাম। আপনি রিকোয়েস্ট করলেন, 'থরবায়ু বয় বেগে' গানটা বাজাতে। আপনি বললেন, অসাধারণ। হাঃ হাঃ হাঃ।

নন্দলাল আবার হাসতে লাগলেন। চন্দ্রকান্ত পূর্ববৎ গম্ভীর। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, ওকে জোটাল কে? অমু?

আবার কে? কণিকা বললেন। এখানে নতুদের স্কুলের ফাংশানে এসেছিল। কোন দিদিমণির সঙ্গে চেনাজানা ছিল।

শান্তা বলল, বড়দিদিমণির সঙ্গে।

কণিকা প্যাকেটটা ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, তখন অমুর সঙ্গে আলাপ হয়। ডেকে এনেছিল।

মিতা বলল, বিশুদা যা ভূতের গল্প জানে! শুনলে আপনারও ভয় করবে

দাদামশাই। বিশুদা এমন ভূতের গল্প বলেছিল, মা বেরুতে পারতেন না ঘর থেকে।

ভেতর থেকে কণিকা হাসি চেপে বললেন, তোদেব যত বাড়াবাড়ি।

শান্তা প্রতিবাদ করল। বাজে কথা বোলো না মা! তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে।

লতা বলল, তবে বিশুদার ভূতের সঙ্গে ডায়ালোগটা সত্যি অসাধারণ।

ভেন্টি্লিকুইজম। বলে নন্দলাল চায়ের কাপ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বিশু গুণী ছেলে। ওর তুলনা হয় না। ভেরি চার্মিং পারসোনালিটি। আলাপ হলে বুঝবেন।

নন্দলাল উঠোন পেরিয়ে ল্যাট্রিনের দিকে গেলেন। চন্দ্রকান্ত বললেন, হুঁ — বুঝলাম। তো ডাকো তোমাদের হরিপুরের বিশুকে। আলাপ করা যাক।

মিতা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। শান্তা বলল, এখন মোটে সাতটা বাজে। এখন ওদের ওঠাতে পারবে—তাহলেই হয়েছে। ন'টার আগে কিছুতেই উঠবে না।

লতা মুখ টিপে হেসে বলল, আমি ওঠাচ্ছি। তারপর সে উঠোনে নেমে কুয়োতলার চৌবাচ্চা থেকে এক মগ জল নিয়ে বেরিয়ে গেল। মমতা আস্তে বলল, কোনো মানে হয়? রাত জেগে আছে—এখন গিয়ে খামোকা বেচারাকে ডিসটার্ব করবে।

শান্তা দৌড়ে গিয়ে খিড়কির দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, মেজদি! সেদিনকার মতো যেন কানে জল ছেটাবি নে। কানে জল ঢুকে বিশুদা বিপদে পড়বে, আমাদের এনজয় করা হবে না।

কথা শেষ হতে না হতে সদর দরজা দিয়ে বিশুর প্রবেশ ঘটল। গায়ে ফিকে লাল গেঞ্জি, পরনে রঙচটা পাতলুন। বড়-বড় চুল কপাল থেকে সরিয়ে দুচোখ কচলে সোজা চলে এল চন্দ্রকান্তের সামনে। তারপর দাদামশাই বলে দু পা ছুঁয়ে জব্বর এক প্রণাম ঠুকল।

পা সরিয়ে নিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, থাক, থাক। তারপর দেখতে থাকলেন বিশুকে।

বিশু হাসিমুখে বলল, আশীর্বাদ করুন দাদামশাই বিশুকে। আপনার জন্য দেড়ঘণ্টা ঘুম লস করে উঠে এলাম।

খিড়কির দরজা দিয়ে লতা বাড়ি ঢুকে বলল, বিশুদা! জলটা তোমার— বুঝতে পারছ?

বিশু বলল, ইয়ার্কি কোরো না লতু। এখন আমার সঙ্গে দাদামশায়ের ইন্টারভিউ। সিরিয়াস ব্যাপার।

চন্দ্রকান্ত দেখছিলেন বিশুকে। রোদপোড়া তামাটে রঙ, মাঝারি গড়ন, মুখের চেহারাটি মিষ্টি বলা যায়। একটু লাজুক শান্ত চাহনি। চাহনিতে হাসি লেগে আছে। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি আছে মুখে। গড়ন বলিষ্ঠ বলা চলে না, একটু রোগাটে ছাপ আছে—তা সত্ত্বেও কাঠামোর জন্য স্বাস্থ্যবান মনে হয়।

চন্দ্রকান্ত বললেন, হুঁ। তুমিই তাহলে সেই হরিপুরের বিশু। পুরো নামটা কী হে?

বিশু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, বিশ্বনাথ রায়, দাদামশাই।

এ তল্লাটে রায়েরা তো সবাই পশ্চিমা বামুন?

আজ্ঞে না। আমাদের হরিপুরের রায়েরা খাঁটি কায়েত-বাচ্চা। বিশু মিতা-শান্তা-লতাদের দেখিয়ে বলল, এই যে দেখছেন ডাকিনী-যোগিনীর দল—এরা যা, আমিও তাই। কথায় বলে না কায়েতে-কায়েতে ঠোকাঠুকি লেগেই থাকে? আমারও সেই দশা। একটু এনজয় করব বলে আসি বটে, এদের অত্যাচারে আর হয়ে ওঠে না।

মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেল। চন্দ্রকান্ত বললেন, তা হরিপুরটা কোথায় হে বিশ্বনাথ?

বলছি। একমিনিট। বলে বিশু চেঁচাল, মা! ও মা! ল্যাংচা! দাদুকে শক্তিগড়ের ফেমাস ল্যাংচা দিয়েছ?

কণিকা বললেন, তোর দাদামশাইকে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ল্যাংচা দেব। ভাবিস না। এখন আলাপ কর। তখন থেকে তোর কথাই হচ্ছিল।

বিশু বলল, হরিপুর আপনি চিনবেন না দাদামশাই। আপনি কলকাতার লোক।

তবু বলো না শুনি! সেটা এই পৃথিবীতেই তো—নাকি অন্য কোনো প্ল্যানেটে?

বিশু সিরিয়াস হয়ে মোড়ায় বসে পড়ল। বলল, আপনি জ্ঞানী লোক বলেই অন্য প্ল্যানেটের কথা তুললেন। আমাদের হরিপুরের কথা বললে এরা আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। হরিপুর সত্যি একেবারে অন্যরকম দাদামশাই। সেখানকার মানুষজন আলাদা, সবকিছু আলাদা—সে আপনি না গেলে বুঝবেন

না। সেই ছোটবেলায় হরিপুর ছেড়ে এসেছি—এখন মনে পড়লে ভাবি স্বপ্ন নাকি।

খুব ভাল জায়গা বুঝি?

আজ্ঞে। বিউটিফুল!

কী সেন্সে?

সবেতেই। বিশু জোর দিয়ে বলল, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়—কিসে নয় বলুন? হরিপুরের লোকে ঝগড়াঝাঁটি কী জানে না। গাঁয়ে কেউ কখনও পুলিশ ঢুকতে দেখেনি। সবকিছুতে কপারেশান…

চন্দ্রকান্ত শুধরে দিলেন। কো-অপারেশন। তা না হয় বুঝলাম। কোথায় হরিপুর?

বিশু হাসল। আপনি কাপাসী চেনেন?

উঁহু।

ভদ্রখালি বিষ্ণুমাটি এঁড়েদা চেনেন?

চন্দ্রকান্ত মাথা দোলালেন।

ঢোলাইচণ্ডী গড়বাকুলি লোহাডাঙ্গা? বিশু তার স্বাভাবিক খ্যাঁক খ্যাঁক হাসিটা হাসল। তাহলে দাদামশাই? আপনি কেমন করে চিনবেন হরিপুর?

হার মেনে চন্দ্রকান্ত বললেন, ঠিক আছে বাপু! না হয় নাই চিনলাম। কদ্দুর পড়াশোনা করেছ?

বিশু গাল চুলকে বলল, বড় লজ্জায় ফেললেন দাদামশাই। এরা আমায় আর পাত্তা দেবে না। এরা আমাকে গ্র্যাজুয়েট মনে করে। আমি বলি নি কিন্তু। জিগ্যেস করুন! এই বিস্কুট, কেক, নিমকি! সত্যি কথাটা বল্ দাদামশাইকে।

চন্দ্রকান্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, বাচালতা ভাল নয় হে!

বিশু গলা চেপে বলল, দাদামশাই, আমি স্কুলফাইনালে দুবার ফেল করেছিলাম।

মেয়েরা হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। শুনেছি। শু-নে-ছি! স্কুল-ফাইনালে ফেল! দুয়ো!

নন্দলাল এতক্ষণে ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে বললেন, বিশু! বাবামশাই তলাপাত্রে ছিপ ফেলবেন। হুইলটা কী অবস্থায় আছে জানি নে। চার-ফার

যা সব লাগবে, তোর রেসপনসিবিলিটি। ওনাকে নিয়ে যাবি পুকুরে। ঘাট-ফাট নতুন করে হয়তো করতে হবে। বড্ড দাম হয়েছে।

বিশু সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, তলাপাত্রে? ওতে মাছ আছে? বরং নোনাতলায় বসলে হত।

কণিকা রান্নাঘরের বারান্দা থেকে বললেন, না বাবা! ওই সাতশরিকের গণ্ডগুলে পুকুরে নয়। কে কী বলবে। বরং আপন অন্নে কুকুর রাজা। নিজেদের যা আছে, তাতেই যথেষ্ট।

নন্দলাল বললেন, তলাপাত্রে মাছ আছে বৈকি। সব তো ধরা হয় নি।

বিশু উঠে বলল, আমার রিস্ক। নোনাতলায় বসলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। আমি এক্ষুনি গিয়ে ছোটনবাবু-লোটনবাবু-ঘোতনবাবু তিনভাইকে ম্যানেজ করে আসছি। এ বাবা হরিপুরের বিশু। যমকে যদি বলি, কেটে পড়ো বাবা, পরে এস—সে লেজ গুটিয়ে চলে যাবে দাদামশাই! নোনাতলা দারুণ পুকুর। ভেরি লোনলি—কাম অ্যাণ্ড কোয়াইট প্লেস। পাড়ে বসে সিন-সিনারি দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যাবে। কতরকম পাখপাখালির ডাক শুনবেন।

বলে সে ঘুঘু কোকিল শালিখ এবং টিয়াপাখির ডাক শুনিয়ে দিল। চন্দ্রকান্ত চোখ বড় করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ডাক শুনিয়ে বিশু বলল, তবে দাদামশাই, আমাদের হরিপুরের বড়দীঘির কাছে এসব লাগেই না। চার ফেলার পনের মিনিটের মধ্যে জল বুজকুড়ি কেটে ঘোলা হয়ে যাবে। এ্যাত্তো মোটা-মোটা বুজকুড়ি। ওজন কমপক্ষে ধরুন বিশ্‌কিলো। যত ইচ্ছে গেঁথে তুলুন, কেউ আপত্তি করবে না। কেন করবে? হরিপুরে মাছের তো অভাব নেই। বরং আপনার হাতে ছিপ দেখলে লোকে আগ্রহ করে ডেকে নিয়ে যাবে। পুকুরঘাটে বসে চা পাবেন। সিগারেটও পাঠিয়ে দেবে। হরিপুরের লোকের ব্যাপারই আলাদা। হরিপুরের···

কণিকা ধমক দিলেন। থাম দিকি। খুব হয়েছে। মুখ-টুখ ধো গিয়ে। আর অমুকে ওঠা। আর কতক্ষণ ঘুমুবে? খিদেও পায় না তোদের?

বিশু চন্দ্রকান্তের দিকে ঘুরে বলল, আপনি রেডি থাকুন দাদামশাই। দুপুরে খেয়েই নোনাতলায় গিয়ে চুপটি করে বসবেন। আমি ডেকে নিয়ে যাব। কিন্তু সাবধান, ওখানকার মাছ বড় ফিঁচেল।

বিশু লম্বা পায়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেলে চন্দ্রকান্ত ছোট্ট একটা হাই তুলে

মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে বাজিয়ে বললেন, ছেলেটি ভালই মনে হচ্ছে। একটু বাচাল এই যা। বয়স কত হবে? আন্দাজ…

নন্দলাল বললেন, টোয়েন্টি ফোর-টোর হবে। অমুর সমবয়সী।

কণিকা বললেন, মুখের চেহারা দেখে বয়স বলা কঠিন। এবার বোধ করি অমুর মতো দাড়ি রাখার শখ হয়েছে। আমার তো আরও কম বয়স মনে হয়েছিল প্রথমবার দেখে।

চন্দ্রকান্ত রায় দিলেন। অমুর চেয়ে বড় হবে। ধরো ছাব্বিশ কী সাতাশ।

কণিকা ডাকলেন, নতু! শান্ত! এখানে এস সব। লুচি বেলে দাও।

মমতা তার লাঠিটা হাতে নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠোনে নামছিল। কণিকা দেখতে পেয়ে বললেন, তুই গল্প কর না দাদামশাইয়ের সঙ্গে। তোকে কে কষ্ট করতে বলেছে? এমন ভাবভঙ্গী করে যেন ওকেই সব করাই।

মমতা কুণ্ঠিত মুখে বলল, ওরা বেলতে পারে না। এক্ষুনি বকাবকি করবে তুমি।

কণিকা বললেন, থাম্ তো। শিখতে হবে না ওদের? পরের দোরে গিয়ে খোঁটা খাবে—সেটাই বুঝি ভাল?

চন্দ্রকান্ত সস্নেহে ডাকলেন, মমি! এখানে এস। আমরা গল্প করব।…

দুপুরে চন্দ্রকান্ত খেতে বসেছেন। জামাই নন্দলালও বসেছেন। ওঁরা উঠলে ভাইবোনেরা বসবে বিশুকে নিয়ে। খেতে বসে বিশু যা হাসায়, কণিকা ওত পেতে থাকেন ধমক দেবার জন্য। গলায় ভাত আটকে যাবে বলে।

বিশু নোনাতলায় ঘাট করে চার ফেলে দুলেপাড়ার একটা ছেলেকে বসিয়ে রেখে এসেছে। নৈলে গরুমোষ নামিয়ে কে চার নষ্ট করে দেবে। চন্দ্রকান্তের খাওয়া দেখতে দেখতে বলল, দাদামশাই মোচার ঘণ্ট খেতে ভালবাসেন খেয়াল ছিল না কথাটা। নৈলে দুলেপাড়ায় সেই তো গেলাম—ঝুরনবুড়িকে বললে পেল্লায় মোচা কেটে দিত।

চন্দ্রকান্ত বললেন, তুমি কেমন করে জানলে হে?

জানি। বিশু বলল। আপনি আরও কী খেতে ভালবাসেন তাও জানি।

বলো, শুনি।

বেগুনপোস্তর চচ্চড়ি। পুঁইডাঁটার সঙ্গে ইলিশের মাথা। আতপচালের গুঁড়োর সঙ্গে ধনেপাতার বড়া। তারপর···

কণিকা বললেন, বাড়িতে সবসময় তোমার কথা হয় তো!

বিশু বলল, দাদামশাই, আপনি তো কলুটোলায় পোস্টমাস্টার ছিলেন। নাকের ডগায় চশমা রেখে বসে থাকতেন গম্ভীর মুখে। আরও বলব? একবার ডাকাত ঢুকেছিল। আপনি একজনের ঠ্যাং চেপে ধরেছিলেন। তারপর যেই বলেছে ফোঁড়া ফোঁড়া—আপনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ডাকাত-ব্যাটা ভোঁ কাট্টা!

চন্দ্রকান্ত হাসি চেপে বললেন, সেই গল্পটা!

বিশু বলল, দাদামশাইকে যদি আমাদের হরিপুরের ডাঁটা খাওয়াতে পারতাম। ওঃ! সে কী ডাঁটা! অশ্বত্থ গাছ! আর স্বাদের কথা বলতে নেই। শক্তিগড়ের ল্যাংচাকে বলে, তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়। ক্ষুধিত পাষাণ দাদামশাই! রবিঠাকুরের।

চন্দ্রকান্ত চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, পড়েছ?

আজ্ঞে—প্রথমে সিনেমায় দেখেছি। তারপর পড়ে নিয়েছি।

তোমাদের হরিপুরে অশ্বত্থগাছের মতো ডাঁটা ফলে। আর কী ফলে হে বিশ্বনাথ?

যা বলবেন—সব।

ওইরকম সাইজ?

আজ্ঞে।

তাহলে তোমার সাইজ এমন কেন?

বিশু লাজুক হেসে বলল, ছোটবেলায় ছেড়ে এসেছি তো। ওখানে থাকলে আপনার মতো পেল্লাই হতাম দাদামশাই।

খাওয়া শেষ হলে চন্দ্রকান্ত আঁচাতে গেলেন। বিশু জল ঢেলে দিতে দৌড়ুল। চন্দ্রকান্ত আপত্তি করলেন না। এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে আবার সার-সার পাত পড়েছে। বিশু এসে গুণতে থাকল। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ···আর একটা? মা আর একটা?

কণিকা আস্তে বললেন, মম্মি আমার সঙ্গে খাবে।

বিশু বলল, অসম্ভব। মম্মিদি! কাম অন। তুমি না বসলে জমবে না।

শান্তা গলা চেপে বলল, বড়দি রাগ করে আছে। মা সকালে বড়দিকে লুচি বেলতে দেয়নি।

সে কী। বিশু উঠে দাঁড়াল।

কণিকা গুম হয়ে বললেন, চুপচাপ খাও তো সব। ওর সবসময় মুখ বেজার আর রাগ। মলে বাঁচি বাবা। এ কী জুটেছে আমার কপালে।

বিশু জিভ কেটে বলল, ছি মা, ছি! আমি ডেকে আনছি।

সে দৌড়ে উঠোন ডিঙিয়ে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, ওরে বাবা! ভিসুবিয়স হয়ে আছে। লাঠি তুলে তাড়া করল। যাক্ গে বাবা, আমাকে আবার এক্ষুনি দাদামশাইকে নিয়ে বেরুতে হবে। সাড়ে বারোটা বেজে গেল। বিস্কুট! কেক! নিমকি! আজ সব চুপচাপ খাও। নো গপ্প।···

নোনাতলার পাড়ে বেঁটে চ্যাপ্টাপাতাওলা গাছের ছায়ায় বসে চন্দ্রকান্ত তারিফ করে বললেন, ভাল জায়গা। কিন্তু চারে মাছ কোথায় হে বিশ্বনাথ?

বিশু পেছনে একটু তফাতে বসেছে। বলল, একটু ধৈর্য ধরতে হবে দাদা-মশাই! এ কি হরিপুর যে···

সে থেমে গেল। ফাতনাটা হঠাৎ বুজকুড়ির মধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে। বাতাস বন্ধ। স্থির জলের ওপর জল-মাকড়সারা অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছিপের ডগায় লাল এক গাঙফড়িঙ এসে বসল। চন্দ্রকান্ত ছিপের হাতল ধরে একটু ঝুঁকলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ঘোষণা করলেন, চারে কাছিম এসেছে।

বিশু বলল, কক্ষণো না। ওটা অন্তত কেজি পাঁচেক রুই, দাদামশাই!

উঁহু, কাছিম।

বাজি।

চন্দ্রকান্ত ঘুরে বিশুর দিকে তাকালেন। বিশু মুখ টিপে হাসছে। বললেন, তোমার তো স্পর্ধা কম নয় হে, আমার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছ। বেশ, বাজি। বলো কী বাজি ধরবে?

বিশু বলল, দু'কেজি মনোহরা।

সে আবার কী বস্তু?

কাঁদির ফেমাস মনোহরা দাদামশাই! সায়েবদের টুপির মতো দেখতে ভেতরে ক্ষীরের পুর। জিভে পড়লেই গলে যাবে। ইস! বিশু জিভ দিয়ে রস টানার ভঙ্গি করল।

চন্দ্রকান্ত আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, না। আমি ওসব ফালতু জিনিসে নেই। আমার সঙ্গে বাজি ধরতে চেয়েছ—বাজি একটু মোটাসোটাই হবে। এমন বাজি যে হারলে চিরদিন যেন তোমার মনে থেকে যায়।

খিকখিক করে হেসে বিশু বলল, বেশ, তাই।

তুমি হারলে তোমাকে মমতাকে বিয়ে করতে হবে।

বিশুর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। আজ্ঞে?

শুনতে পাও নি? চন্দ্রকান্ত কড়া স্বরে বললেন।

বিশু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিন্তু আমি যে স্কুলফাইনাল ফেল!

চন্দ্রকান্ত জবাব দিলেন না। ছিপের হাতল ধরে ফের ঝুঁকে গেলেন। ফাতনা একটু নড়েছে।

দাদামশাই! চিডখাওয়া গলায় বিশু ডাকল। মমি আমায় বিয়ে করবে না। আমি যদি সত্যি সত্যি করতে চাই, তব না। জানেন? আমাদের হরিপুরে একবার একটা মেয়ে…

চন্দ্রকান্ত খ্যাঁচ মারলেন। শূন্য খ্যাঁচ। ফের টোপ গাঁথতে থাকলেন গম্ভীর মুখে।

বিশু একটু হাসল। আচ্ছা দাদামশাই, আপনি যদি হারেন?

বঁড়শি ফেলে চন্দ্রকান্ত ওর দিকে ঘুরে বললেন, তুমিই বলো এবার।

আপনি তো পোস্টালে ছিলেন। বড়-বড় অফিসারের সঙ্গে ভাব। আমাকে একটা পোস্টম্যানের চাকরি পাইয়ে দেবেন। ব্যস! বিশু ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে নরম গলায় ফের বলল, আমার বড় ইচ্ছে করে দাদামশাই, পোস্টম্যান হতে। কেমন বাড়ি-বাড়ি চিঠি বিলি করে বেড়ায়। কেমন একখানা সুন্দর হলদে ব্যাগ। আমাদের হরিপুরে ঋষি পিওন ছিল দাদামশাই। দুপ্পুর বেলা পথঘাট নিঃঝুম। হঠাৎ এসে দোরে ডাকত, চিঠি! লোকে শুনত, ঋষি! হরিপুরে ঋষি মানেই চিঠি, দাদামশাই! বাবা বলতেন, ঋষি কখনও খারাপ খবর আনে না। আমাদের হরিপুরের ব্যাপার তো? আমি ঋষি হব দাদামশাই!

চন্দ্রকান্ত আস্তে বললেন, কেন হে, তোমার তো শুনি কত বড়-বড় লোকের সঙ্গে ভাব!

বিশু লাজুক মুখে বলল, তা আছে। কিন্তু পোস্টম্যানের চাকরি কে দেবে বলুন—আপনি ছাড়া?

পোস্টম্যানের চাকরি খুব কষ্টের।

হরিপুরের বিশুকে কষ্ট দেখাবেন না দাদামশাই। কষ্টের শেষটাও দেখা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত গলার ভেতর বললেন, আগে বাজি হারি, তবে তো।···

হারজিতের মীমাংসা হতে পারল না। ভাদ্রের বৃষ্টির রকম-সকমই এই। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে এসে কেলেংকারি করল। তারপর আর ছাড়ার নাম নেই। চিক্কুর হেনে কানে তালা ধরাচ্ছিল মেঘ। এলোমেলো বাতাস বইছিল ঝড়ের মতো। ভিজে জবুথবু হয়ে বাড়ি ফিরেছেন চন্দ্রকান্ত। সন্ধ্যাতেও টিপটিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছে। নবীনবাবুর পোড়ো বাড়িতে একটা ঘরে তক্তপোশে চুপ করে বসে আছে বিশু। অমু নেই—কোথায় হয়তো খেলা দেখতে গিয়ে আটকে পড়েছে। বিশু একা।

চন্দ্রকান্তের কথাটা শোনার পর সে পড়েছে অস্বস্তিতে। লজ্জাও কম নয়। বেশ তো এ বাড়ি যাতায়াত করছিল এতদিন—নিঃসংকোচে হাসি-তামাশায় কাটাচ্ছিল। আজ মমতার সামনে যেতেই তার লজ্জা করে। সে তো এমন কথা ভুলেও ভাবে নি।

শান্তা ধুপধুপিয়ে এসে বলল, এম্মা! তুমি এখানে বিশুদা? আলো জ্বালোনি কেন? লণ্ঠনে তেল নেই?

বিশু আস্তে বলল, আছে।

শান্তা চাপা গলায় বলল, তোমায় একটা কথা বলতে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শোনো বিশুদা, দাদামশাই···

সে খিলখিল করে হাসলে বিশু গম্ভীর গলায় বলল, হেসো না তো! সন্ধেবেলা অমন করে হাসতে নেই।

শোনোই না! শান্তা আরও গলা চাপল। দাদামশাই মা আর বাবাকে তোমার সঙ্গে বড়দির বিয়ের কথা বলছিল। মা কালীর দিব্যি বিশুদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বলেন কী, কথাটা আমরাও ভেবেছি। বলতে পারি নে।—ও বিশুদা, করো না বিয়ে বড়দিকে। ওর খুব কষ্ট, জানো?

বিশু চুপ করে রইল।

শান্তা বলল, বাবা বড়দির একটা চাকরির জন্যেও কত চেষ্টা করলেন খোঁড়া, তার ওপর ডান হাতটাও যদি ভাল থাকত। বাঁহাতে কষ্ট করে লিখে অভ্যাস করেছে। ও বিশুদা, করো না ওকে বিয়ে।

বিশু একটু হাসল। ও কি রাজি হবে? আমি আজেবাজে ছেলে। চালচুলো নেই। স্কুলফাইনালে দুবার ফেল!

দাদামশাই তোমার চাকরি করে দেবেন বললেন। বড়দির জন্যে বললেন, হ্যাঁ—এতদিন ওর জন্য ভাবিনি। ভাবা উচিত ছিল। তোমরাও বলোনি কিছু। দেখা যাক, যদি ওরও কিছু একটা করে দিতে পারি। ও বিশুদা, করো না বিয়ে!

শান্তা ওকে খামচে অস্থির করে তুলল। বিশু হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা বাবা, করব। বলছি, করব। ছাড়ো।

আমার গা ছুঁয়ে বলো।

শান্তু, আমাদের হরিপুরের লোকে কক্ষনো কথার খেলাপ করে না।

শান্তা দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ফের ঘুরে এল।…ও বিশুদা, একটু দাঁড়াও না! ভয় করছে।

বিশু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই এক ভূত। এ ভূত থাকতে আর কোনো ভূত আসবে না। চলো।

আজ রাতে খাওয়ার পর হইচইটা খুব জমাট ধরনেরই হল। চন্দ্রকান্তকে অনেককাল পরে হাসতে দেখা গেল। দারুণ মজার মজার গল্প শুনিয়ে বললেন, কী হে বিশু! এমন গল্প তোমাদের হরিপুরের লোকে জানে?

বিশু আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। মাথা নেড়ে বলল, না দাদামশাই!

কৈ, তোমার সেই বেহালা বাজাও। শুনি!

মেয়েরা কলকলিয়ে উঠল।…বেহালা না, মাউথ অরগ্যান! মাউথ অরগ্যান!

বিশু একটা সুর বাজিয়ে বলল, ঠোঁটটা একটু ফেটে রয়েছে। ঠিকমতো আসছে না।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ঠিক আছে। এবার হরবোলার ডাক শোনাও।

মেয়েরা চ্যাচামেচি করে বলল, শেয়াল। শেয়াল!

হুঁ, বৃষ্টির রাতে শেয়ালের ডাক মন্দ হবে না। চন্দ্রকান্ত বললেন। হুঁ, শুরু করো!…

শুতে এসে অমু বলল, তোর কী হয়েছে রে? হাঁড়ির মতো মুখ করে আছিস কেন?

বিশু হাই তুলে বলল, কিছু না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।...

বৃষ্টি ছাড়ে নি। টিপটিপ করে সমানে ঝরছে। বারান্দার তক্তাপোশে মশারির ভেতর শুয়ে চন্দ্রকান্ত ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন। বাইরে গিয়েও বটে, আবার বয়সও একটা কথা, ঘুম সহজে আসতে চায় না। তক্তাপোশের পায়ের দিকে দরজার কাছে মেঝেতে হারিকেন রাখা হয়েছিল দম কমিয়ে। কখন নিভে গেছে। তিনটে কালো-কালো থামের ফ্রেম দিয়ে ঘন অন্ধকার আর গাছপালায় জোনাকি দেখছিলেন চন্দ্রকান্ত। এখানে এসে বরাবর রাত্রিবেলা এরকম অস্বস্তি। ঘুম আসে না।

তারপর কখন একটু তন্দ্রামতো এসেছে, কী একটা শব্দে কেটে গেল। মুখ তুলে মশারির ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কিছু ঠাহর হল না। আবার খুটখাট মচমচ শব্দ। কুকুর নাকি?

শব্দটা এবার উঁচুতে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোথায়। তাঁর মাথা যেদিকে, সেদিকেই কোথাও শব্দটা হচ্ছে। বুক ধড়াস করে উঠল চন্দ্রকান্তের। নিশ্চয় চোর।

সাহসী বলে নামডাক আছে চন্দ্রকান্তের। চুপচাপ উঠে বসলেন। তারপর মশারি তুলে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, চোর! চোর!

সঙ্গে সঙ্গে কী একটা ধুড়মুড় করে পড়ে গেল কোথায়। চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, ধর্ ধর্! মার্ মার্!

দুটো ঘরেই ঘুম ভেঙে গেল। নন্দলালের গলা শোনা গেল প্রথমে। তারপর লতা-শান্তাদের দুর্বোধ্য চ্যাঁচামেচি এবং জোরালো ধরনের কান্নাকাটি। কণিকা চেরা গলায় ডাকছিলেন, অমু! অমু! বিশু!

চন্দ্রকান্ত গর্জন করে বললেন, আলো! আলো জ্বালো! শিগগির!

নন্দলাল হারিকেন জ্বালার চেষ্টা করছিলেন। বর্ষায় দেশলাই কাঠি স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে। সেইসময় খিড়কির কাছে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে পড়ল অমু আর বিশু। অমুর কাছে টর্চ ছিল। বিশুর হাতে একটা আস্ত হুড়কো।

টর্চের আলো সঠিক জায়গায় পড়তেই বাড়িসুদ্ধ লোক থমকে দাঁড়াল—

শেষ থামটার পরে বারান্দার সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে আছে মমতা। কোণঠাসা আহত প্রাণীর ভঙ্গিতে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। কণিকা খাপ্পা হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রকান্ত হাত তুলে বললেন, চুপ! তারপর নেমে গিয়ে মমতার কাছে বসে পড়লেন।

নন্দলাল হারিকেন জ্বেলেছেন। অনবরত কাশছেন। অমুর টর্চের আলো ঘুরছিল। মমতার ওপর থেকে আলোটা এসে বারান্দার কিনারায় একটা মোড়ার ওপর থামল। তারপর ওপরে উঠল সাবধানে—ওপরে দু'থামের মাঝখানে বারান্দার কড়িকাঠে একটা আংটা আছে। বাড়িতে কাজকর্ম-উৎসবে ওখানেই হ্যাজাগ বা ডেলাইট ঝোলানো হয়। মিস্ত্রিরা বুদ্ধি করেই এসব আংটা আটকাতে ভোলে না বাড়ি তৈরির সময়।

সেই আংটায় দড়িপাকানো শাড়ির একটা দিক ঝুলছিল। এইমাত্র নিচে পড়ে গেল। শান্তা ফিসফিস করে বলে উঠল, বড়দির শাড়ি! কণিকা তার দিকে একবার তাকালেন। চোখ নিষ্পলক লাল। নাসারন্ধ্র স্ফীত।

চন্দ্রকান্ত গলা ঝেড়ে বললেন, একটা শাড়ি দাও। তারপর দুহাতে পাঁজাকোলা করে মমতাকে তুলে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলেন। ওঘরে চার বোন শোয়। দুটো খাটে টানা বিছানা। বিশাল মশারি।

বৃষ্টিটা থেমে গেছে কখন। রাত নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ—বাকি দুজন ভেতরে। অমুর টর্চ এতক্ষণে নিবল। হারিকেনের আলোয় জীর্ণ পুরনো বাড়ির ছাদে-ঢাকা বারান্দা হলুদ দেখাচ্ছিল। মৃত মানুষের শরীরের মতো।

সেই গাঢ় স্তব্ধতা ভেঙে ফোঁসফোঁস করে নাক ঝেড়ে ভাঙা গলায় বিশু বলে উঠল, ঠিক এমনি করে একবার আমাদের হরিপুরে···

অমু গর্জন করল, তুই থামবি?

বিশু মুখ নিচু করে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে গেল। তারপর খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

সকালেও বাড়ি তেমনি চুপচাপ। আকাশ কিন্তু পরিষ্কার। টুকরো মেঘ দলছাড়া গরুর মতো ঘুরছে। এই সাতসকালে কোথাও ঘুঘু পাখি ডাকছিল। চন্দ্রকান্ত চা খেতে খেতে কান করে শুনে বললেন, শান্তু! একবার ডাক তো ইয়েকে—ওই যে ছেলেটা। হুঁ—হরিপুরের বিশুকে।

শান্তা মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, কখন চলে গেছে বিশুদা! চা খেয়েও যায় নি।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রকান্ত ওপাশের ঘরে গেলেন। মমতা বালিশে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। চন্দ্রকান্ত পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে ফুঁপিয়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাস আর কান্নায় মিশিয়ে বলল, বিশুদার জন্যে না। বিশ্বাস করুন দাদামশাই, বিশুদার জন্যে না। কাল সন্ধ্যায় শান্ত আর মিতু বলাবলি করছিল, বড়দির বিয়ে হবে না তো—তাই যাকে-তাকে ধরে বিয়ে দিচ্ছে। কী জাত কেউ জানে? শুনতে পেয়ে মা বলল, আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচি। দাদামশাই, আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, জানো বিশুদার জন্যে আমি মরতে চাই নি। আপনি বিশ্বাস করুন···

ফাঁদ

রাত অনেক হলে বাগানের দিক থেকে ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে একটা পেঁচা ডেকে ওঠে। মল্লিকদের কুকুরটা সন্দিগ্ধভাবে দু-একবার ডেকেই সপ্রশ্ন চুপ করে যায়। আমি জানি, এইবার তার আসার সময় হয়েছে।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। লোকজন তত কিছু নেই। ওপরে-নিচে চারটে করে আটটা ঘর। নিচের দুটো ঘরে থাকেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর তাঁদের মেয়ে শ্রাবন্তী। একটা ঘরে পুরনো আসবাবের আবর্জনা। বাকিটাতে বাড়ির সাবেক আমলের চাকর ষষ্ঠীদাস। তার বয়সও প্রায় সত্তর হয়ে এল। সারারাত খকখক করে কাশে আর একটু শব্দ হলেই ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, যাঃ! যাঃ! আমি জানি, কাকে সে এমন করে তাড়াতে চায়।

ওপরের চারটে ঘরে আমার জীবনযাত্রা। আমার আর শ্রুতির। শ্রুতি বড় ঘুমকাতুরে। সে কিছু টের পায় না। এই যে আমি কাকে এত রাতে দরজা খুলে দিই, কার সঙ্গে কথা বলি, কিছু না। আমার আদরের ভেতর শ্রুতি কখন গভীর ঘুমে এলিয়ে যায়। তার শরীরের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে শুনতে হঠাৎ চমক ভাঙে প্রাকৃতিক সংকেতের মতো পেঁচার চিৎকার। তারপর বাগানের দিকে শনশন করে ওঠে বাতাস। গাছপালা দুলতে থাকে। পুরনো জানলাটা খটখট করে শব্দ করে। তারপর সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে আসছে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠি। সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

দরজা খুলে আমি একটু সরে দাঁড়াই। টের পাই তার ঘরে ঢোকা তার শরীরের গন্ধে। গন্ধটা ছেঁড়া ঘাসের মত কিংবা ভিজে মাটির মত, অথবা পাখির বাসার মত ঈষৎ ঝাঁঝাল, সঠিক বলা কঠিন, কারণ তার গন্ধটা যেন খুবই প্রাকৃতিক। হয়তো সে প্রকৃতির খুব ভেতর দিকে চলে গেছে বলেই। জীবজগতের অবচেতনায় এই গন্ধ থাকে কি? বুঝতে পারি না। তার অশরীরী শরীরের কোন গন্ধ থাকার কথা নয়। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে তাই বুঝি? জানি না তো।

তাকে বলি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

সে বলে, আমি তো এরকমই।

না। তুমি এরকম ছিলে না।

সে একটু হাসে।৮ তা ঠিক। ছিলাম না।

কেমন ছিলে সে তো মনে পড়ে তোমার, নাকি পড়ে না?

বোকা। মনে না পড়লে এলাম কেন?

তাহলে তুমি নিজেকে দেখাও। আমারও তো তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

তুমি ভয় পাবে।

তোমাকে আমি ভয় পাব না স্মৃতি। তুমি আমারই অপরাংশ হয়ে ছিলে একসময়।

একটু পরে সে বলে, পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

তাহলে থাক।

বরং চলো আমরা বাগানে যাই।···

আমরা বাগানে গিয়ে বসে থাকি। কথা বলি। পুরনো সব কথা···অতীত থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে। দুঃখের কথা। সুখের কথা। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ষষ্ঠীদাসের ডাক শুনতে পাই। সে লণ্ঠন হাতে আমাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে। সে বড় ধূর্ত মানুষ। সব টের পায়। আমাকে বকাবকি করে। বলে, ঘুম হয় না তো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? এমনি করে হিমে বসে থাকলে যে উল্টে অসুখে পড়বে।···

হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীদাসের দৌরাত্ম্যে অবশেষে বাগানে গিয়ে কথা বলা ছাড়তে হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম, কেন স্মৃতি ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে চাইত না। শ্রুতিকে ও ঈর্ষা করত। ঘুমন্ত শ্রুতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আমার খুব ভয় হত। বলতাম, ওখানে কী করছ? এখানে এস। শ্রুতি জেগে যেতে পারে।

জাগলেও তো আমাকে দেখতে পাবে না।

কে জানে! মেয়েরা হয়তো সব টের পায়।

সে হাসত। হুঁ, পায়ই তো! তুমি যখন শ্রুতিকে আদর কর, দূর থেকে টের পাই। মনে হয়, আমার যদি শরীর থাকত!

ওকে মেরে ফেলতে তো?

হুঁ।

এখন পার না?

না।...একটু পরে বলল ফের, আমি আর কিছু পারি না। শুধু যাওয়া-আসা ছাড়া।

মনে হল, ও কাঁদছে। বললাম, ওকে ঈর্ষা কোর না। ও তোমারই সহোদরা।

শোনো!

বলো।

তুমি কাকে বেশি ভালবাস এখন...শ্রুতিকে না আমাকে?

দুজনকেই।

মিথ্যা! আমি তোমার চারঘরের সংসার ঘুরে দেখেছি, এখন যা-যা যেমন হয়ে আছে, আমার সময়ে তেমন কিছুই ছিল না। ওই ড্রেসিং টেবিলটা পর্যন্ত নতুন! আর শ্রুতির কত শাড়ি! কত বিদেশি সেন্ট! কত...

শ্রুতি একটু বিলাসী প্রকৃতির মেয়ে। আর তুমি জান, তুমি ছিলে সাদা-সিধে। সাজতে ভালবাসতে না। টাকাকড়ি খরচ করতে দিতে না। মনে পড়ে, সেবার তোমার জন্য অত সুন্দর একখানা কাঞ্জিভরম কিনে আনলাম! তুমি শ্রুতিকে পরতে দিলে। আর একবার...

হঠাৎ থেমে গেলাম। টের পেলাম। ও নেই। চলে গেছে। এখনকার মত মাথা ভাঙলেও আর ফিরে আসবে না। কোথায় যায় ও? জীবজগতের সীমানা পেরিয়ে প্রকৃতির কোন গভীরতর স্তরে গিয়ে বসে থাকে ও? আমি যদি ওকে অনুসরণ করে যেতে পারতাম সেখানে!...

একরাতে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি থামল না। মধ্যরাতে একটু কমল মাত্র। তারপর তার আসার সংকেত শুনতে পেলাম বাগানের দিকে। দরজা খুলে দিলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

সেই মুহূর্তে শ্রুতি জেগে গেল। চমকে ওঠা গলায় বলল, কোথায় গেলে?

এই তো!

অন্ধকারে দরজা খুলে কোথায় যাচ্ছ?

সে টেবিল ল্যাম্প জেলে দিল। ভারি হাতে দরজা আটকে দিয়ে বললাম, বৃষ্টি দেখতে যাচ্ছিলাম বারান্দায়।

শ্রুতি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, জানলা থেকে দেখা যায় না?

ছাঁট আসছে যে!

তোমার কী হয়েছে?

কই, কিছু না।

আমার ধারণা, তুমি সারারাত জেগে থাক।

যাঃ! কে বলল?

আমি জানি। তুমি···তোমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না আমার পাশে? শ্রুতি শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, কতবার হাত বাড়িয়ে তোমাকে খুঁজি পাই না।

আশ্চর্য। আমি তো তোমার পাশেই থাকি।

শ্রুতি বালিশে মুখ গুঁজে বলল, কোথায় থাক তুমিই জান।

ওর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বললাম, ঘুমোও।

তুমি?

আমার ঘুম পাচ্ছে না। আর বৃষ্টিটা কী সুন্দর—শোন!

আমি জানি, কেন ঘুম হয় না তোমার। দিদির কথা মনে পড়ে তো?

হঠাৎ ওকথা কেন শ্রুতি?

হাসতে হাসতে বললাম, ছিঃ! যে মরে গেছে তাকে ঈর্ষা করতে আছে?

কে মরে গেছে? দিদি মরে নি। দিব্যি বেঁচে আছে।

পাগল! কী সব বলছ শ্রুতি?

শ্রুতি ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বলল, বেঁচে নেই—তোমার মনে? ষষ্ঠীদা বলে, তুমি রাতে বাগানে গিয়ে বসে থাক—কেন আমি যেতে দিই এমন করে? কেন বাগানে যাও তুমি? বল!

ঘুম আসে না।

এত ভাবলে ঘুম তো আসবেই না। শ্রুতি আবার পাশ ফিরে শুল। ফের আস্তে করে বলল, আরও অনেক কথা জানি। বলব না।

কী জানে, সে কিছুতেই বলল না। কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে ছেড়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল শ্রুতি কেঁদে ফেলবে—অথবা এক নেপথ্যের কান্না ওকে ভিজিয়ে

দিচ্ছে ভেতর থেকে। অবশ্য খুব শক্ত মেয়ে সে, জানি। স্মৃতির একেবারে উল্টো। সে প্রচণ্ড সাহসী। বেপরোয়া। স্পষ্টভাষী মেয়ে। কিন্তু স্মৃতির মতো জেদি নয়।

পরের রাতে আমার উৎকণ্ঠা ছিল স্মৃতির আসা না টের পেয়ে যায় সে! এ রাতে বৃষ্টি ছিল না। নরম চেহারার একটুকরো চাঁদ ছিল বাগানের মাথায়। পোকামাকড় ডাকছিল বৃষ্টির স্মৃতি নিয়ে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভিজে গাছপালা আর ঘাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে রাতের ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল ঘরে। ভাবছিলাম, কাল রাতে ফিরে গেছে অমন বাধা পেয়ে, আজ কি করে আসবে স্মৃতি?

এল—কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নয়। জানালার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, এসেছি।

এ রাতে কোন প্রাকৃতিক সংকেত শুনলাম না। কোন পূর্বাভাষ না। মল্লিকদের কুকুরটাও বুঝি অগাধ ঘুমে লীন। বললাম, ভেতরে আসছ না কেন?

একটা কথা বলতে এলাম শুধু।

কী কথা?

আমি আর আসব না।

জানালার রড শক্ত করে ধরে বললাম, না। তোমাকে আসতেই হবে—আমি যতদিন বেঁচে আছি। আমার রাতগুলো তোমার জন্যেই রেখেছি, আর দিনগুলোকে শ্রুতির জন্য।

সে একটু হাসল। তুমি বড়লোক মানুষ। তোমার কত খেয়াল!

না, না। খেয়াল নয়। এমনটা হয়ে গেছে—তুমি বুঝতে চেষ্টা কর লক্ষ্মীটি! চিরকাল আমার বরাতটাই এরকম। কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে না আমার। আরও দেখ, আমার সব বাস্তব আর কল্পনাও আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। ওরা দুটো দিকে, মধ্যিখানে আমি। টাগ অফ ওয়ারের নিষ্ঠুর খেলা।

ওসব কথা আমার মাথায় ঢোকে না, আমি যাই!

শোন, শোন! একটা কথা বলে যাও।

কী?

তুমি কেন আর আসবে না? শ্রুতির জন্যই কি?

শ্রুতির জীবন আমার মত নষ্ট হয়ে যাক, তা চাইনে। আমি তার দিদি।

শোন, শ্রুতির বদলে তোমাকেই চাই।

এমনি করে একদিন আমার বদলে শ্রুতিকে চেয়েছিলে, মনে পড়ে? কী? চুপ করে গেলে যে?

আমি অনুতপ্ত। ক্ষমা কর।

দেখ আমি যেখানে আছি, সেখানে ক্ষমা বা অনুতাপ বলে কোন কথা নেই। তোমার মনে পড়ে? ওই খাটে আমি শুয়ে ছিলাম। আমার শ্বাসকষ্ট। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি আর শ্রুতি পাশের ঘরে ছিলে। একটু পরে শ্রুতি এল। ওকে দেখেই চমকে উঠলাম। তার শরীরে তোমার ছাপ পড়েছিল। জলের গ্লাস তার হাতে কাঁপছিল।

তুমি ধাক্কা মেরে গ্লাসটা ফেলে দিলে। শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম···

জানালায় কী করছ?

শ্রুতির চমকেওঠা প্রশ্নে আমিও খুব চমকে উঠলাম। সে টেবিলল্যাম্প জেলে বিছানায় উঠে বসল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার তুমি জেগে আছ?

ঘুম আসছে না। দেখ, অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে।

শ্রুতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে বলল, তুমি চাও, আমিও দিদির মত মরে যাই, তাই না?

আঃ কী বলছ শ্রুতি!

তুমি বুঝি ভাবছ আমি কিছু টের পাই না? শ্রাবন্তীর দিকে এবার তোমার চোখ পড়েছে।

ছিঃ! চুপ কর।

শ্রুতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। না—চুপ করব না। তুমি চাইছ, আমিও দিদির মত স্যুইসাইড করি, আর তুমি শ্রাবন্তীকে বিয়ে কর।

শ্রুতি! চুপ কর। কী বলছ তুমি? স্মৃতি স্যুইসাইড করেনি।

করেছিল। আমি জানি। শ্রুতি নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বলল। ক্যাপস্যুলটা খেয়ে রিঅ্যাকশান হচ্ছিল, ডাক্তার সেটা বন্ধ করতে বলেছিলেন। দিদির বালিশের তলায় কৌটোটা দেখেছিলাম। কৌটোটা খালি ছিল।

আশ্চর্য। তুমি বলনি! কেন বলনি শ্রুতি?

তুমি কষ্ট পাবে ভেবে। শ্রুতি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।

তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে সে শুয়ে পড়ল। টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিল। জানলার বাইরে বাগানের দিকে জ্যোৎস্নার

ভেতর কুয়াশার মত কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতিই কি? শ্রুতিকে ডাকলাম, শ্রুতি, শোন!

কী?

শ্রাবন্তীর কথা তোমার মাথায় এল কেন? তার সঙ্গে তো আমার দেখাও হয় না। তেমন কিছু আলাপও নেই। তাছাড়া সে তো তোমার কাছেও আসে না।

বাইরে কী হয় তুমিই জান। সারাদিন কোথায় থাক, কী কর, আমি কি দেখতে যাই?

শ্রুতি, ফুড রিলিফের কাজে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আজকাল। অন্যকিছুতে মন দেবার সময় কোথায়?

তুমি লিডার মানুষ। তোমার মনে কত দয়া। এমনি করে সেবার ফ্লাডের সময় তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে। তখন বুঝিনি, এই বাড়িটা তোমার একটা ফাঁদ।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, ঠিক আছে। ওদের চলে যেতে বলব। ওদের এরিয়া থেকে ফ্লাডের জল নেমে গেছে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে শ্রুতি! নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। কাল রাতে তুমি বললে, স্মৃতিকে ভুলতে পারি নি। আজ রাতে বলছ, শ্রাবন্তীর জন্য…

কথা কেড়ে শ্রুতি বলল, তাই ভেবেছিলাম। পরে মনে হয়েছিল, যে মরে গেছে তার পেছনে কেন তুমি ছুটবে? যে বেঁচে আছে রক্তমাংসের শরীরে, তার পেছনে ছোটাই স্বাভাবিক। নয়? বল তুমি।

কিন্তু তুমি তো আছ! তুমি তো জীবিত।

আমি বাসি হয়ে গেছি। দিদিও তোমার কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। তাই তুমি আমার পেছনে ছুটেছিলে। কিন্তু জেনে রাখ, আমি দিদির মত বোকা নই।

তর্ক করে লাভ নেই। ফেমিনিন লজিক। আমি চুপ করে থাকলাম। শ্রুতিও চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রুতি আমাকে বাধা দিল না।

বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কতক্ষণ। স্মৃতি কি আর কোনদিন আসবে না কথা বলতে? জ্যোৎস্নায় হেমন্তের গাঢ় কুয়াশা জড়ানো। ঘুম জড়ানো গলায় খুব গভীর থেকে পোকামাকড় গান গাইছে। সামনে শীত—তখন ওরা

আরও গভীরে দীর্ঘ ঘুমের দিকে যাবে। কোথায় সেই প্রাকৃতিক অভ্যন্তর—জঠরের উষ্ণতা যেখানে বাইরের পৃথিবীর হিমকে পৌঁছতে দেয় না? সেখানে কি স্মৃতিও ঘুমোতে চলে গেল জীবজগতের অবচেতনায়?

আমার কষ্টটা বাড়ছিল। স্মৃতিকে আমি ভালবাসতাম। শ্রুতিকেও হয়তো ভালবাসি—চেষ্টা করি। পেরে উঠি না। খালি মনে হয়, শ্রুতি আমার জন্য নয়, আমার সংসারের জন্য। একটি প্রয়োজনীয় ফিলার শ্রুতি। আর স্মৃতি ছিল আমার জন্য—আমার সংসারের বাইরে একটি নিজস্বতার প্রতীক। স্মৃতি, কেন গেলে?

যাই নি। সে ফিসফিস করে বলল। এই তো আছি!

কিন্তু কোথায় আছ? আগের মত কাছে আসছ না কেন?

পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। নিজেকে কুড়িয়ে জড়ো করা যাচ্ছে না।

মনে হল, চারদিকে ঘাস, গাছপালা, পোকামাকড়, শিশির, কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না আর কুয়াশার ভেতর থেকে স্মৃতির শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। সে বলছে, আমি আছি। আমি আছি।

আর চারপাশ থেকে আবছা এক গন্ধ ছেঁড়া ঘাসের পাতা অথবা শেকড়ের, বৃষ্টিভেজা মাটির, জলের, পাখিদের বাসার গন্ধের মতো কটু স্মৃতির দ্বিতীয় জীবনের গন্ধ। প্রকৃতির নিজস্ব গন্ধ।

লণ্ঠনের আলো ফুটে উঠল। দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছিল। ষষ্ঠীদাসের ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সব টের পায়।

ফৌজী জুতো

কোনো-কোনো মানুষকে দেখলে জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য জাগে। যেমন বাবুরাম সাহানী। অবাক হয়ে ভাবতাম, লোকটা খৈনি-তামাক বেচেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। সেই একই পোশাক, চেহারা, পা ফেলার ভঙ্গী অতিশয় নম্র আচরণ। অথচ দেখতে দেখতে পৃথিবীর কত দ্রুত অবিশ্বাস্য রদবদল ঘটে গেল।

আমাদের এই সীমান্ত এলাকায় তখন প্রায়ই দুদেশের ফৌজী লোকেদের সংঘর্ষ বাধত। উত্তেজনা থমথম করত কিছুদিন। কারফিউ, ফৌজী আনাগোনা,

মাঝে মাঝে পদ্মার দিকে গুলির আওয়াজ। তার মধ্যেও দেখতাম খৈনিওয়ালা বাবুরাম নির্লিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফৌজী ক্যাম্পে গিয়ে খৈনি বেচছে। তার বেলা কারফিউ নেই।

আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় গঙ্গাধর খৈনি খেতেন। বাড়ির সবাই ওঁকে বলতাম গঙ্গাখুড়ো। ঢ্যাঙা সিড়িঙে রাগী চেহারা।

তর্কাতর্কি গালমন্দ করে খৈনি কিনতেন। তবু বাবুরাম হাসিমুখে এসে দরজায় হাঁক দিত নিয়মিত, 'বুঢ়াবাবু, বাবুরাম আসলে-ও-ও!' একজন পরাশ্রিত ব্যর্থ মানুষ গঙ্গাধরের এই সময়টুকু ছিল উত্তেজনা ও সুখের।

লোকের পায়ের দিকে তাকানো আমার স্বভাব নয়। কিন্তু বাবুরামের পায়ের কাঁচাচামড়ায় তৈরি ধ্যাবড়া নাগরাজুতো আমার চোখ টানত। আসলে ওই বিস্ময়। শীতগ্রীষ্মবর্ষা দুটো বিবর্ণ নাগরা থপথপিয়ে হাঁটছে আর হাঁটছে দৃকপাতহীন পরিবর্তনহীন—ক্ষেতখামারে, রাস্তার ধুলোয়, গাঁয়েগঞ্জে, ফৌজী আড্ডায় এবং কিনারায় বহতা ধুধু আদিগন্ত পদ্মা।

বাবুরাম বলত, রাজমহলের ওদিকে নওলপাহাড়ীতে তার জন্ম। গঙ্গাখুড়োর মেজাজ ভাল থাকলে খুব মন দিয়ে নওলপাহাড়ীর গল্প শুনতেন। মুচকি হেসে বলতেন, লেকিন জরু? বাবুরাম বিনীতভাবে বলত, জরুকী ক্যা কাম বুঢ়াবাবু? জরু মানেই ঝামেলা। তাছাড়া একটা মুখের রুটি ঠিকমতো জোটে না, দুটো মুখ হলে তিনটে হবে কালক্রমে চার পাঁচ ছয়ভি হবে। বাবুরাম শ্বাস ফেলে বলত, দশভি হতে পারে। কী দরকার?

কিন্তু সবাই ভাবত, বাবুরামের এটা ওজর। এতকাল খৈনি বেচে ভেতর-ভেতর টাকা জমিয়েছে। লালগোলায় সময়মতো মহাজনের গদি খুলে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসবে। বাংলামুল্লুকে এটাই নাকি ওদের ট্রাডিশান।

হঠাৎ একদিন বাবুরামের পায়ে নাগরার বদলে দেখি অবিশ্বাস্য একজোড়া বুটজুতো। গাব্দাগোব্দা ঝকমকে প্রায় আনকোরা বুটজুতো। গঙ্গাখুড়ো চোখ টেরচে দেখে বললেন, 'হুঁ, ভাল করেছ বাবুরাম। হাঁটাহাঁটির পক্ষে জিনিসটা মজবুত।'

বাবুরাম লাজুকে হেসে বলল, 'ফৌজী জুতা বুঢ়াবাবু। নীলামে কিনলাম।'

প্রতিবার সীমান্ত-সংঘর্ষের পর এ ধরনের জিনিসপত্র ক্যাম্প থেকে নীলামে বেচা হত। গঙ্গাখুড়ো সেবারই একটা কম্বল কিনেছিলেন তিন টাকায়। মুড়ি দিয়ে গঞ্জের বাজারে চা খেতে যেতেন প্রতি সন্ধ্যায়। বাবুরামের বুটজুতোর

শতমুখে তারিফ করে বললেন, 'এই এক জোড়াই ছিল বুঝি? দেখতে পেলে নিশ্চয় কিনতাম।'

আমার ছোটভাই ছোটকু বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'আমি বেট রেখে বলছি, ওই বুটে রক্তের ছাপ আছে।'

আমি অবাক। বাবুরাম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গঙ্গাখুড়ো রুষ্ট হয়ে বললেন, 'মানে?'

'পদ্মার চরে কোন সোলজারের ডেডবডি থেকে খুলে এনেছে।' ছোটকু মুচকি হাসল। 'কম্বলটা কেচে নেবেন।'

বাবুরাম গম্ভীর হয়ে চলে গেল। দুপুরবেলা জানলা থেকে দেখলাম, পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ালে গঙ্গাখুড়ো বসে আছেন। খুঁজে কারণ আবিষ্কার করলাম। ঘাসের ওপর খাকিরঙের কম্বলটা মেলে দেওয়া আছে। হঠাৎ দেখে মনে হবে, শীতের প্রকোপে বিবর্ণ একটুকরো ঘাসেঢাকা মাটি। মানুষের রক্তের প্রতি মানুষের এ কী অদ্ভুত সংস্কার!

ক'দিন পরে বাবুরাম খৈনি বেচতে এল ফের। গঙ্গাখুড়ো কোথায় যেন গিয়েছিলেন। তাঁর হয়ে খৈনিটা আমিই রাখলাম। তারপর লক্ষ্য করলাম, বাবুরাম কী যেন বলবে-বলবে করছে। মুখটা কেমন বিষণ্ন, থমথমে। বললাম, 'কী বাবুরাম?'

'দাদাবাবু, একটা বাত বলব।'

বাবুরামের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল—কিন্তু ওর কাছে এই হাসি কোনো যুক্তি নয়। ছোটকুটা যত নষ্টের গোড়া। বাবুরাম বলল, এই ফৌজীজুতো তাকে বৃহৎ ঝামেলায় ফেলেছে। দিনভর কিছু টের পায় না। কিন্তু দিনশেষে যখন গাঁওয়াল করে ফেরে, সুনশান ফাঁকা রাস্তায় জুতোজোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তার দুপায়ে টান বাজে। দেমাগ বদলে যেতে থাকে। বিগড়ে যায়। বাবুরামের খালি রাগ হয়, মাথার ভেতর হুহু করে আগুন জ্বলে। ইচ্ছে করে, দিই হারামী দুনিয়াটার মুখে দো-দশ লাথি। আর অচানক পায়ের টান বাজতে বাজতে তাকে করে তোলে টাট্টু ঘোড়া—পায়ের আওয়াজ শুনে টহলদার ফৌজী লোকেরা কাল সন্ধ্যায় খুব ধমকে দিয়েছে।

তার চেয়ে আজীব ঘটনা, রাতে বার বার নিদ টুটে গেছে আর বাবুরাম দেখেছে কী, কোনায় রাখা জুতোর ভেতর পা গলিয়ে যেন এক বন্দুকবাজ ফৌজী আদমি দাঁড়িয়ে তাকে 'হুকুমদার' হাঁকছে। এমন জিনিস সামলানোর হিম্মত

বাবুরামের মতো নাদান আদমির নেই। তো বুঢ়াবাবু হিম্মতওয়ালা আছেন—জিনিস তার খুব পছন্দও বটে। আঢাই রুপেয়ায় কেনা হলেও দু রুপেয়ায় তার আপত্তি নেই।

এসব শুনে হাসতে হাসতে বললাম, 'গঙ্গাখুড়ো আর নেবেন বলে মনে হয় না। কম্বলটার ওপর ওঁর আর তেমন রুচি দেখছি না। বাবুরাম, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা কর।'

পরদিন দেখি, আমাদের মাহিন্দার গণেশ সেই বুটজোড়া পায়ে দিয়ে থপথপিয়ে ঘুরছে। চোখে হেসে বলল, 'দেড় টাকায় গছিয়ে দিল সাহানী। কী করি? তবে বাবুদা, খুব কাজের জিনিস। মাঠেঘাটে ঘুরতে—তার ওপর রেতের বেলা ধানচুরি ঠেকাতে এর জুড়ি নেই। আওয়াজ শুনেই ক্ষেতে কাস্তে ফেলে চোর পালাবে।'

তারপর গণেশ গণ্ডগোল বাধাল। ক্ষেতের মুনিশ এসে নালিশ করে গণশা মেরেছে। ঘোঁতনবাবু ডাক্তার পর্যন্ত বাবার কাছে ছুটে এলেন—'এই ষণ্ডটাকে সামলান তো মশাই! দিনদুপুরে তারা দেখেছে? ছোটমুখে বড় কথা—যা না হয় তাই বলল একশো লোকের সামনে।' গণেশ একটু তেজী ছোকরা বটে; কিন্তু এমন নালিশ কখনও শোনা যায় নি। ব্যাপারটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছুল যখন গণেশ কেন কে জানে ইবাদত খান কাবুলীর মাথা ফাটিয়ে দিল। পুলিশের হ্যাপা সামলাতে বাবা অস্থির। গণেশ গা ঢাকা দিয়ে রইল কয়েকটা দিন। আর সেই ফাঁকে দেখি, মরাইয়ের তলা থেকে গঙ্গাখুড়ো সেই বুটজোড়া কখন টেনে বের করেছেন। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'নিধিরাম সেপাই! মামদোর পো! বাপের জন্মে জুতো পরেনি—মেজাজ বিগড়ে গেছে মরামানুষের জুতো পরে। ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে।

বুটদুটোর ফিতে আলগোছে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি পরবেন নাকি?'

গঙ্গাখুড়ো আরও খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চোখ টাটাচ্ছে! মিলিটারি জিনিস পরার হিম্মত আছে যে পরবে!'

বেরিয়ে গেলে ভাবলাম আঁস্তাকুড়ে নয় তো পদ্মার জলে ফেলতে যাচ্ছেন। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল আগের মতো। গণশাও আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এল। জুতোর কথা ভুলেও জিগ্যেস করল না। তাছাড়া গঙ্গাখুড়ো এ ব্যাপারে নির্বাক। তবে গণেশ আগের চেয়ে ভালমানুষ হয়ে গেল দেখে অবাক লাগছিল।

এক বসন্তরাতের জ্যোৎস্নায় পদ্মার ধারে ঘুরতে বেরিয়েছি। হঠাৎ একটু তফাতে বটতলার চটানে কে চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাবাউট টার্ন! তারপর লেফট রাইট···লেফট রাইট···লেফট রাইট এবং ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ নাচের আওয়াজ। ফৌজী লোকদের প্যারেড হচ্ছে বুঝি। কয়েক পা এগিয়ে দেখি, কালো ভূতের মতো এক মূর্তি আপন মনে ওই কাণ্ড করছে। লেফটরাইট হতে হতে বাজখাঁই চিৎকার 'হল্ট'—তারপর হতভম্ব হয়ে গেলাম। গঙ্গাখুড়ো!

বটতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনলাম, গঙ্গাখুড়ো চাপা গর্জে কাউকে বলছেন, 'আর একপা এগুলেই ফায়ার!' আরও কীসব বলে শাসাতে শুরু করলেন—সামনে কাউকে দেখলাম না। জ্যোৎস্নায় গঙ্গাখুড়ো ছায়ামূর্তি হয়ে খুব দাপাদাপি করে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যেন ফৌজী কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

লজ্জা পাবেন ভেবে সামনে গেলাম না। কিন্তু তারপর থেকে গঙ্গাখুড়োর মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। মেজাজ আগেও একটু তিরিক্ষি ছিল। ক্রমশ তা আরও তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছিল। বাড়িতে কানাকানি শুনতাম, গঙ্গাধরের মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ওঁর বাবারও নাকি তাই ছিল। শেষে পাগল হয়ে মারা যান। আমার সন্দেহ হত, ভুতুড়ে ওই বুটজোড়াই এর পেছনে। কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হত না।

তবু কেন যে অভিশপ্ত জুতোজোড়া গঙ্গাখুড়োর ঘর থেকে চুরি করে পদ্মার জলে ফেলে দিইনি, এখনও আক্ষেপ জাগে। একদিন বাবা গঙ্গাখুড়োর মেজাজী কীর্তিকলাপ বরদাস্ত করতে না পেরে যাচ্ছেতাই অপমান করেন। আর দুপুরে গঙ্গাখুড়ো পদ্মার ধারে সেই বটগাছে ঝুলে পড়েন। পায়ের ঠিক তলায় বুটদুটো রাখা। কেউ নিতে সাহস পায় নি।

শ্মশানকৃত্যের পর জিনিসটা আমিই ফেলতে গেলাম। রাত প্রায় নটা বেজে গেছে দাহ করতে। চাঁদটা সবে পদ্মার মাথায় উঠেছে। হঠাৎ মনে হল, সত্যি এই জুতোদুটো ভুতুড়ে—নাকি নেহাত মনের ভুল আমার, বাবুরাম খৈনিওয়ালার মতো? সে নিরক্ষর মানুষ। আমি লেখাপড়াজানা ছেলে। আমার কেন কুসংস্কার থাকবে? চরে দাঁড়িয়ে জেদ করে জুতোজোড়া পায়ে ঢোকালাম। কিছুক্ষণ বালির ওপর মসমস শব্দ করে হেঁটে বেড়ালাম। জুতোজোড়া আমার পায়েও জুতসই খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু যখন ভাবছি, এ কোন মৃত সৈনিকের জুতো, তখনই বুকটা ধড়াস করে উঠছে। নির্মল জ্যোৎস্নার চরে এই আগ্রাসী ভয়কে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। অথচ তা আমার

একটা লড়াই মরণপণ। মরীয়া হয়ে উঠছিলাম ক্রমশ। এ লড়াইয়ে আমাকে জিততেই হবে। ধুপ ধুপ শব্দ তুলে চরটার এপ্রান্ত থেকে সে প্রান্ত আমি দাপটে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর টের পেলাম, যেন আমি অন্যের অনুগত— —এই হাঁটাহাঁটি, এই লড়াই, কোনো কিছু আমার নয়। ভীত বিপন্ন কোণঠাসা প্রাণীর মতো আমারই মাথার ভেতর আমি গুটিয়ে বসে আছি এবং আমার শরীর অন্যের হুকুম তামিল করছে। লেফট রাইট···লেফট···রাইট···অ্যাবাউট টার্ন এবং লেফট রাইট···লেফট রাইট···আমার হাতে অদৃশ্য রাইফেল। আমার পরনে ফৌজী পোশাক মাথায় ইস্পাতের হেলমেট। আমার সামনে ঘাপটি মেরে এগিয়ে আসছে ফৌজী দুশমন, আমি গুলি না করলেও সে গুলি করবে এবং গুলি করবেই। 'ফায়ার'! আমার সারা শরীরের ভেতর গমগম করে উঠল নিষ্ঠুর চিৎকার 'ফায়ার!'

অমনি পা হড়কে ধপাস করে পড়ে গেলাম এবং জুতোদুটো এক ঝটকায় খুলে জলে ছুড়ে ফেলে দৌড় দিলাম। নিজের স্যাণ্ডেল কোথায় পড়ে রইল, খুঁজে দেখার সাহস ছিল না।

এর কিছুদিন পরে বাবুরাম সাহানী খৈনিওয়ালার পায়ে আমার এই স্যাণ্ডেল দুটো দেখি। কোন মুখে বলি এ দুটো আমার? জিগ্যেস না করলেও বাবুরাম বলল, বাবুদাদা যা ভাবছেন তা নয়। এ জিনিস ফৌজী নয়। এক রাখালছেলের কাছে আঠান্নি দিয়ে কিনে পায়ে পরেছে। জেনেশুনে ফৌজী জিনিস পরার হিম্মত তার নেই।

নেই বলেই বাবুরাম খৈনি বেচে জীবন কাটাবে। আমিও অবশ্য ভাবতে গেলে তাই। তার চেয়ে জোরালো আর কী করব? কী করতে পারলাম এতকাল পরেও?

সারমেয়-সমাচার

সত্যসুন্দর ঘরে ঢুকে বললেন, রসোর কী যেন হয়েছে, বুঝলে নাদু? পার্কে গাছের তলায় বেঞ্চে চুপচাপ শুয়ে আছে। কথা বললুম, জবাব দিল না। আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

ডাক্তার নন্দদুলাল সিংহ ওরফে নাদুসিঙ্গি কড়া নজরে দেখলেন সত্যসুন্দরের কোলে কুচকুচে কালো অ্যালসেসিয়ান বাচ্চা। কুকুরের ওপর অ্যালারজি

আছে নাহুসিঙ্গির। দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি গাল চেটে দেবে। বললেন রসোর কথা পরে হচ্ছে। আগে তোমার বীভৎস জীবটিকে সামলাও।

সত্যসুন্দর সোফায় বসে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, নাহু, কুকুর সম্পর্কে তোমার পড়াশুনো দরকার। কুকুর মানুষের চেয়ে প্রখর চেতনাসম্পন্ন প্রাণী দেয়ালের ওপারে যা ঘটছে, তাও টের পায়। অন্ধকারেও তার দৃষ্টি চলে মুহূর্তে শত্রু-মিত্র চেনা-অচেনা আইডেনটিফাই করার দুর্লভ ক্ষমতা তার আছে—যা কিনা তোমার নেই। আরও দেখ নাহু, বিবর্তনের ধাপে ধাপে মানুষ তো কত কিছু হারিয়েছে—কুকুর হারায়নি কিন্তু। সিক্সথ সেন্সের কথাই বলছি। আজ সকালে কী হল শোনো। কলকাতা পুলিশের ডগস্কোয়াড আমাদের পাড়ায় এসেছিল একটা খুনের ব্যাপারে। তো…

শুনব না। নাহুসিঙ্গি প্রতিবাদ করলেন।

সত্যসুন্দর করুণ মুখে বললেন, কেন শুনবে না? বায়োলোজিক্যাল বিষয়।

নাহু ডাক্তার সোজা হয়ে বসে বললেন, আমাকে বায়োলজি বোঝাতে এস না।

ও, তুমি তো ডাক্তার! কাতর ভঙ্গিতে হেসে সত্যসুন্দর সিগারেট বের করলেন। ফের বললেন, তাহলে এর ফিলসফিক্যাল অংশটাই বলি শোনো।

নাহুসিঙ্গি আরও খচে গিয়ে বললেন, দেখ সতু! শুনেছি তুমি নাকি কোন ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর কলেজে কবে ফিলসফি পড়াতে। ফিলসফির মাষ্টার আর ফিলসফার এক জিনিস নয়। ফিলসফি শুনতে হলে শুনব ফিলসফারের কাছে। আলু আর আলুবোখরা! তেলাপোকা আর পাখি!

সত্যসুন্দর মাথা থেকে মাফলার খুলে বেজার হয়ে বললেন, মুশকিলটা হচ্ছে, তুমি ব্রেন বোঝো—ইন্টেলেক্ট্ বোঝো না। হার্ট চেনো, হৃদয় চেনো না। নাহু, কুকুর যে কত বড় ফিলসফিকাল ব্যাপার, তা বোঝাবার জন্য তোমাকে বিশেষ জ্ঞানী হতে হবে না। মহাভারতের মাত্র মহাপ্রস্থানপর্বে চোখ বুলোনোই যথেষ্ট!

নাহু ডাক্তার বাঁকা হেসে বললেন, বেশ, বেশ। অত যে বোঝো, এখন বলো তো যুধিষ্ঠিরের পেছন পেছন একটা কুকুর যাচ্ছিল কেন?

আহা, সেটাই তো একটা মস্তো তত্ত্ব! সত্যসুন্দর নড়ে উঠলেন।

কচু! নাহুসিঙ্গি বললেন। কুকুর মাংসাশী প্রাণী। যাচ্ছিল মাংসের লোভে।

সত্যসুন্দর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, মাংস!

হ্যাঁ। আবার কী? স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে খানাপিনা করবেন। বিশাল বিশাল বৃষ রান্নাবাড়া হবে। ঋগ্বেদ পড়েছ? উপনিষদ

আওড়ালে চলবে না সতু ! বেদ আর বেদাঙ্গ কি এক হল ? তোমার ওই কুকুর আর তার-ওই লেজ কি এক ? ঋগ্বেদ পড়ে দেখ। খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং— খানা-পিনার এলাহি কারবার। নাড়ুসিঙ্গি হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন।

এতক্ষণে সত্যসুন্দরের সারমেয় গরগর করে উঠল। মাংসের কথায় নয়, দরজা দিয়ে যজ্ঞেশ্বর ঢুকছিলেন। তাঁর হাতে নকশাদার ছড়ি। ছড়িটি তাঁর আগেই ঘরে এগিয়ে এসেছে। বললেন, কানে এল ঋগ্বেদ-ঋগ্বেদ হচ্ছে। আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খবর নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। প্যায়দারা বলছে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।

সত্যসুন্দর খ্যাঁক করে উঠলেন।…থামো ! তোমার ওই প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ডবৎ মুণ্ডের মধ্যে এসব জিনিস ঢুকবে না। বলে যাও নাড়ু। তোমার বক্তব্য শেষ হলে আমি আমার বক্তব্য রাখব।

যজ্ঞেশ্বর একটু দমে গেলেন। সত্যসুন্দর কলেজে মাষ্টারি করতেন। যজ্ঞেশ্বর সে-আমলের ম্যাট্রিক। বললেন, বেশ। নাড়ুই বলুক। তারপর যা হবার হবে।

নাড়ুসিঙ্গি বললেন, ঋগ্বেদ আর্যদের ইতিহাস তাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র। সোমরস পান করতেন। গরু-ঘোড়া যা পেতেন, খেতেন আর লুঠপাট করে বেড়াতেন। ওই ছিল আর্যদের স্বভাব। দেখ না, তাদের ইউরোপিয়্যান জেনারেশন কী করছে ? পুরো সেই ট্রাডিশন-কালচার বজায় রেখেছে। আমরা কিন্তু রাখিনি।

যজ্ঞেশ্বর ফুট কাটলেন।…কোথাও কোথাও একটু আধটু না রেখেছি, তা নয়।

কোথায় বলো ? সত্যসুন্দর জেরা করলেন।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে। খবরের কাগজ পড়ে দেখো !

সত্যসুন্দর আপত্তি করে বললেন, প্রভিন্সিয়ালিজম করো না। ধর্ষণ লুণ্ঠন হত্যাকাণ্ড সর্বত্র মানুষের স্বভাব।

যজ্ঞেশ্বর সত্যসুন্দরের কোলের কুকুরটার দিকে ছড়ি তুলে বললেন, এ মালটি কোথায় জোটালে ?

সত্যসুন্দর ছড়ির ডগা সরিয়ে দিয়ে বললেন, তা যা বলছিলাম আমরা, নাড়ু ! কুকুর খুব সামান্য প্রাণী নয়। ঋগ্বেদের কথা বলছিলে। ইন্দ্র পণিদের কাছে দূতী পাঠিয়েছিলেন সরমাকে। সেই সরমার বংশধর হল এই সারমেয়বৃন্দ। অর্থাৎ কুকুর। এদের বিষয়ে একটা সূক্ত পর্যন্ত আছে।

যজ্ঞেশ্বর মুচকি হেসে বললেন, শুকতো? কুকুরের শুকতো? চচ্চড়ি নেই?

সত্যসুন্দর চটে গিয়ে বললেন, অশিক্ষিত অর্বাচীন আর বলে কাকে? কুকুর বিষয়ক সূক্ত! সূক্ত! এস ইউ কে টি এ।

নাড়ুসিদ্ধি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, তা তুমি ইদানীং কুকুর নিয়ে ঘুরছ যে? কুকুর থেকে রোগ ছড়াতে পারে জানো? তোমার হল কী সতু? সারাক্ষণ কুকুর তো ভাল কথা নয়। এই কুকুর কুকুর করতে গিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টরা যাকে বলে ফিক্সেসান—তাই না হয়ে যায়। রসোর নাকি হয়েছে! একেবারে! পাগলামির লক্ষণ।

যজ্ঞেশ্বর জিগ্যেস করলে, কার?

আমাদের রসরাজ গোঁসাইয়ের। সত্যসুন্দর জবাবটা দিলেন। পার্কে দেখলুম শুয়ে আছে—ডাকলুম, সাড়া দিল না। আসলে কী জানো? ওর এই গণ্ডগোলের কারণ ওর দজ্জাল বউ।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, ডিভোর্স করে ফের বিয়ে করুক রসো। ল্যাঠা চুকে যাবে!

এ বয়সে ফের বিয়ে? নাড়ুডাক্তার বললেন। ওর শরীরে আর আছেটা কী?

সত্যসুন্দর বললেন, নাড়ু! তুমি খালি শরীরই দেখ। দেখবেই তো। তুমি ডাক্তার কি না। তুমি অপৌরুষেয় গ্রন্থ ঋগ্বেদেও খালি ওই বস্তুটি দেখেছ। আমার কোলের এই কোমল সুন্দর শিশুটিও তোমার চোখে শরীর। অথচ গীতা বলেছেন, বাসাংসি জীর্ণানি এট্‌সেটেরা এট্‌সেটেরা! শরীরের ভেতর ব্রহ্মের অস্তিত্ব তোমার চোখে পড়ে না। ওহে ডাক্তার! শরীর মানে মাংস! মাংসে কী আছে? পচে গলে ভূট হয়। এই জনির মাংসও ভূট হবে। কিন্তু ওর মধ্যে আছেন স্বয়ং ধর্ম। ধর্মরূপী সারমেয়ঃ! ইনি পঞ্চভূতে মিশে যাবার পাত্র নন। পঞ্চভূতে লীন হবে তোমার গিয়ে মাংস-মজ্জা-অস্থিসমূহ। কবরে গিয়ে দেখ না!

যজ্ঞেশ্বর বললেন, সে তো ম্লেচ্ছদের বেলা। আমাদেরটা পুড়ে ভস্ম হয়।

একই কথা। সত্যসুন্দর বললেন। তাই নাড়ুকে বলছিলুম, মাংসে কিচ্ছু নেই। মাংস কৃমিকীট আর ইতর প্রাণীর ভোজ্য বস্তু!

নাড়ুবাবু বললেন, সে তো আমারই কথা। ওই দেখ, তোমার সরমা-নন্দনের এক হাত জিভ লোলুপ হয়ে উঠেছে। সাবধান সতু, গাল চাটতে দিও

না। কবে কামড় বসাবে, তখন ঠেলাটি টের পাবে। হাইড্রোফোবিয়া হয়ে মারা যাবে।

সত্যসুন্দর আমতা আমতা করে বললেন, আহা! সে তো পাগলা কুকুরের কামড়ে। জনি পাগল হতে যাবে কেন? একটা থিওরি বলি।

সত্যসুন্দর এবং নাদুসিঙ্গি এক গলায় বললেন, কী, কী?

সচরাচর দেখা যায়, মাংসাশী প্রাণীদের মুখ হাঁ হয় এবং জিভ বেরিয়ে লক লক করে। কিন্তু নিরামিষভোজী প্রাণীদের মুখ বুজে থাকে। কেন ভেবে দেখেছ কি?

অবশ্য পাখিদের বেলায় অতটা না হলেও শকুনের হাঁ করা মুখ দেখেছি। ব্যাপারটা ভাববার মতো। বলে যজ্ঞেশ্বর গলায় জড়ানো চাদর ঢিলে করে দিলেন। সত্যসুন্দর এবং নাদুডাক্তারের মুখে চিন্তার ছাপ। এই সময় গৃহভৃত্য ত্রিলোচন চা এবং প্লেটে পাঁপরকুচি সাজানো ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। পেছনে ডাক্তার-গৃহিণী ইন্দুপ্রভা। ঠোঁট দুখানি পানরসে রাঙা। কাঁচাপাকা চুল ঢেকে একটুখানি আঁচল—নেহাত রীতিরক্ষা। চোখে হেসে বললেন, সটুবাউ, কয়ে পাহহি?

সত্যসুন্দর লাজুক হেসে বললেন, পাবেন, পাবেন। যে-কোনো মুহূর্তে পেয়ে যাবেন—দেখুন না!

সন্দিগ্ধ মুখে নাদুডাক্তার তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললেন, সতু! ভাল হবে না বলছি। কুকুর রোগ ছড়ায়।

ইন্দুপ্রভা গ্রাহ্য করলেন না। পানের গুঁড়োর মধ্যেই ফের বললেন, অইকল অমন টাই।

অবিকল এমনি পাবেন। সত্যসুন্দর আশ্বাস দিলেন। হুবহু এরকম।

নাদুসিঙ্গি গুম হয়ে গেলেন। দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোটে পাঁচটা বাজে। ছটায় নিচের তলায় চেম্বারে গিয়ে ঢুকবেন। এটা দোতলার ড্রইং রুম। জানালার বাইরে দিনের আলো কমে এসেছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শীত থাকার কথা নয়। কিন্তু সদ্য বৃষ্টির পর শীতটা ফিরে এসেছে। বিদায়ের সময় প্রেমিকার পিছু ফিরে তাকানোর মতন।

ঘরের জানালাগুলো বেশ বড় এবং পর্দা সরানো। বাইরে একদিকে বস্তি এলাকা বলে অনেকটা আকাশ হাঁ করে আছে। এসব কারণে ঘরে খানিকটা আলো ছিল এতক্ষণ। এবার কমেছে। ইন্দুপ্রভা জানালায় ঘুরে সবার অলক্ষে

পানের গুঁড়ো বের করে নিচে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর সুইচগুলো টিপে দিলেন। কিন্তু আলো জ্বলল না। লোডশেডিং। বিরক্তমুখে অস্পষ্ট কিছু বললেন। মুখে পান না থাকলেও বোঝা গেল না। ঘরে মুড়মুড় এবং চুক-চুক শব্দ হচ্ছে। কথা বন্ধ।

সত্যসুন্দর জনিকে সস্নেহে মাত্র তিনকুচি পাঁপর খাওয়ালেন। তারপর বললেন, নাদু বলছে, কুকুর মাংসাশী। কিন্তু ওটা অভ্যেস। এই তো দিব্যি পাঁপর খাওয়ালুম। খেল। যা দেব, সব খাবে।

নাদুসিঙ্গি গলার ভেতর বললেন, বদহজম হবে। হড়হড় করে বমি করবে। ঘরদোর নোংরার একশেষ করবে। দুর্গন্ধ ছুটবে। এবং মেথরের জন্যে বস্তিতে গিয়ে লাইন দিতে হবে। দেশের অবস্থা তো জানো না।

আরে না না! সত্যসুন্দর জনির পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন। এ তো দিশী নেড়ির বংশজাত নয়—বিলিতী। এদের স্বভাবই আলাদা। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি মোলায়েম। মাখনের ডেলা।

নাদুসিঙ্গি প্রতিবাদ করতে গিয়ে থামলেন। ইন্দুপ্রভা তেমনি চোখে হেসে বললেন, কিন্তু কবে পাচ্ছি? যখনই দেখা হয়, বলেন খবর দিয়েছি।

সত্যসুন্দর বললেন, খবর দিই আর না দিই, বললুম তো—যেকোনো মুহূর্তে পাবেন।

ত্রিলোচন একটা হারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। জনি গরগর করে হয়তো রাগ দেখাল। সত্যসুন্দর হাসতে হাসতে বললেন, মহাকাশযুগের সন্তান কি না? হেরিকেন-টেন জ্বাললেই দেখেছি বড্ড বিরক্ত হয়। তা বুঝলেন বৌঠান? আপনি কুকুর রাখবেন বলছেন বটে, কিন্তু আমার ভয় হয়—আপনার পতি-দেবতাটি পয়জন খাইয়ে মেরে ফেলবে না তো? ওর আলমারিতে পয়জন ঠাসা!

নাদুবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সতু!

ইন্দুপ্রভা মিষ্টি হেসে বললেন, আহা! ঠাট্টা করছেন বোঝো না?

সত্যসুন্দর বললেন, করছি বটে ঠাট্টা। কিন্তু ওকে বিশ্বাস নেই। কুকুর ওর চক্ষুশূল!

না, না। ইন্দুপ্রভা স্বামীর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন। আমার মতোই জীবজন্তু ভালবাসে। আমার শাশুড়ীর বড্ড বেড়াল পোষার নেশা ছিল শুনেছি। আমার শ্বশুরমশায়েরও ছিল। মস্তো একটা টেরিয়ার পুষেছিলেন। গাড়িচাপা পড়ে মারা যায় বেচারা। তারপর থেকে এ বাড়ি ফাঁকা হয়ে আছে।

আমার কেবলই ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ওরও লাগে। জিগ্যেস করুন না? ওগো, বলো না!

নাছুবাবু গোঁফের তলায় অনিচ্ছাসত্ত্বে বললেন, হুঁঃ।

লাগবে। লাগবার কথা। যজ্ঞেশ্বর ফুট কাটলেন। একটি মোটে মেয়ে। তাকে মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছ ডাক্তার হতে! এদিকে এখানকার ডাক্তারের নাকি ওখানে দারুণ ডিম্যাণ্ড। আমি সব বুঝি, এটাই বুঝতে পারি না। মিসেস বরং মেয়েকে লিখুন, একটা বিশুদ্ধ অ্যালসেসিয়ান সেখান থেকেই পাঠাক। আর ফাঁকা লাগবে না ইহসংসার। ফুল ফুটবে। পাখি গাইবে। অনেক কিছু হবে। লিখুন মেয়েকে।

সত্যসুন্দর বললেন, পাঠানো কি সহজ কথা? কীভাবে পাঠাবে?

পার্শেল। যজ্ঞেশ্বর বললেন। পোস্টাপিস থেকে নাছু ছাড়িয়ে আনবে।

সত্যসুন্দর হাসিমুখে ইন্দুপ্রভার উদ্দেশে বললেন, লিখুন না বৌঠান! দুটো পাঠাতে লিখুন।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, কাস্টম ডিউটি লাগবে।

দেব। ইন্দুপ্রভা এবং সত্যসুন্দর যুগ্মকণ্ঠে বললেন।

যজ্ঞেশ্বর পরামর্শ দিলেন।...প্যাকিং বাক্সে ফুটো রাখতে বলবেন। অক্সিজেন সাপ্লাই হবে।

সত্যসুন্দর জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ হে জগা! পার্শেল এয়ারমেলে পাঠালে কি সারফেস মেলের ডবল পোস্টাল চার্জ লাগে, না দেড়া লাগে? তুমি তো পোস্টালে ছিলে!

ডবল লাগবে। রিডবল লাগাও বিচিত্র নয়।

সত্যসুন্দর ভেবে বললেন, দেব। লাগুক! কী বলেন, বৌঠান?

যজ্ঞেশ্বর আলো-আঁধারিতে যেন হাসি চাপছিলেন। ইন্দুপ্রভা বললেন, হাসছেন যে যগুবাবু?

না। হাসিনি তো! ভাবছি।

যুবতীর ভঙ্গিতে ইন্দুপ্রভা বললেন, কী ভাবছেন শুনি?

ভাবছি রসোর কথা। যজ্ঞেশ্বর উদাসমুখে বললেন। মানে আমাদের রসরাজ গোস্বামীর কথা। সতু বলল, পার্কে চুপচাপ বসে আছে। ওর সঙ্গে কথা বলে নি।

ইন্দুমতী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, সে কী! কী হয়েছে রসোবাবুর?

মেলানকলিয়ায় ভুগছে বেচারা। শুনেই বুঝেছি, ওটা সেই বিষাদবায়ু।

সত্যসুন্দর শ্বাস ফেলে বললেন, বায়ুটা বৈরাগ্যঘটিতও হতে পারে।

ইন্দুপ্রভা যুগপৎ দুটি মুখ অবলোকন করে আর্তস্বরে বললেন, আহা গো! বেশ তো ছিলেন মানুষটা। কত হাসিখুশি ছিলেন। কত সব মজার মজার গল্প বলতেন। কেন অমন হল?

বলে হঠাৎ গলা খাটো এবং ষড়যন্ত্রসংকুল করলেন।...যোগসাধনা করতে গিয়ে মাথার ভেতর শিরা ছিঁড়ে যায় নি তো? আমাদের হাবুলদার ওই অবস্থা হয়েছিল, জানেন? ভেলোরে গিয়ে অপারেশন করে তবে সারে।

নাদু ডাক্তার মুখ খুললেন।...হাবুল যোগসাধনা করেছিল কে বলল তোমাকে? ওর হয়েছিল অন্য ব্যাপার। সে তোমরা বুঝবে না। মানুষের শরীরটা ভারি জটিল যন্ত্র। কত রকম...

কথা কেড়ে সত্যসুন্দর বললেন, আঃ! ফের শরীর? কনসাসনেসের প্রাবল্য ঘটলে মানুষ ফিলসফিক্যাল হতে বাধ্য। ব্রেনের নার্ভ তুচ্ছ পার্থিব জড়বস্তু। চৈতন্যের বন্যা যখন কুলকুণ্ডলিনীতে থইথই করে সঞ্চারিত হয়, তখন—হুঁঃ শরীর! রাখো তোমার শরীর! শরীরের তুচ্ছতা উপলব্ধি করেই না সনাতন ভারতবর্ষ আত্মাকে সার করেছে। আত্মানং বিদ্ধি। ওদিকে দেখ, শরীরবাদী জড়বাদী ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থাটা কী? হিপি! দেউলিয়া! আত্মার সন্ধানে ভারতে এসে মাথা ভাঙছে। বোলো না নাদু, আর বোলো না! গীতার বাণী স্মরণ করো—বাসাংসি জীর্ণানি...এট্‌সেটেরা এট্‌সেটেরা।

মুগ্ধদৃষ্টে চেয়ে ইন্দুপ্রভা শুনছিলেন। যজ্ঞেশ্বর মুচকি হেসে বললেন, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! তাহলে আর কী? জীর্ণ বস্ত্রের মতো ঝটপট শরীরখানা খুলে ফেলে পাড়ি জমাও ব্রহ্মলোকে। পড়ে আছ কেন বাত-অম্বল-ডায়াবেটিস নিয়ে? যাও!

সত্যসুন্দর করুণ হয়ে বললেন, যাওয়া তো আমার হাতে নেই রে ভাই!

আছে। ছাদে উঠে ঝাঁপ দাও গে ফুটপাতে। নির্বিকার মুখে যজ্ঞেশ্বর বললেন। বরং হাওড়া ব্রিজে ওঠ গে। কাজটা সহজ হবে। নয়তো নাদুর কাছে পটাসিয়াম সাইনাইড চেয়ে নাও!

নাদুসিঙ্গি ক্রূর হেসে বললেন, দেব না। এ বয়সে জেল খাটবার সদিচ্ছা নেই।

ইন্দুপ্রভা আঁতকে উঠেছিলেন। বললেন, কী সব অলুক্ষুণে কথা! বালাই ষাট! মৃত্যু নিয়ে ফাজলেমি করতে নেই।

সত্যসুন্দর চাপা রাগে বললেন, মৃত্যু নয়—আত্মহত্যা নিয়ে ফাজলেমি করা হচ্ছে। বুঝলেন না? দেখ যগু আর যা নিয়ে করবে করো, স্যুইসাইড নিয়ে কক্ষনো না। অবসেসানে পরিণত হলেই কেলেংকারি। সেই যে এক সায়েব ঘুমের মধ্যে গিয়ে বাগানে কোট-প্যাণ্ট পুঁতে রেখে আসত, তেমনি কখন ঘুমের মধ্যে কী করে বসবে। সাবধান! ইট ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস গেম।

এই সময় জনি কীভাবে সত্যসুন্দরের কোল থেকে ছাড়া পেয়ে টুপ করে নামল এবং সোজা ইন্দুপ্রভার পায়ের কাপড়ে দুই ঠ্যাঙ তুলে দিল। নিচে অন্ধকার। সত্যসুন্দরও কথার ঝোঁকে টের পান নি। ইন্দুপ্রভা হাঁটুর কাছে কী একটা ঘটেছে টের পেয়েই কাঁইরে মাঁইরে করে চিলচেঁচানি চেঁচালেন। নাতু কী কী বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। ত্রিলোচন এবং নেড়ার মা বোমাপিস্তল নিয়ে ডাকাত ঢুকেছে ভেবে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। যজ্ঞেশ্বর হকচকিয়ে হারিকেনটার দিকে হাত বড়ালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিচে পড়ল। কাচ ভাঙল এবং অন্ধকার। অন্ধকারে সত্যসুন্দরের চাপা গলা শোনা গেল, জনি! জনি!

নাতু সিঙ্গিও এক কাণ্ড করে ফেলেন। চায়ের কাপ-প্লেটসুদ্ধ ট্রে উল্টে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। বুদ্ধিমান যজ্ঞেশ্বর বিকেলে পকেটে টর্চ নিয়েই বাড়ি থেকে বের হন। আপৎকালে মনে পড়তেই বের করে জ্বাললেন। দেখা গেল, ইন্দুপ্রভা দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন। জনি তক্ষুনি ফিরে এসে টুপ করে প্রভুর কোলে বসে পড়েছে। চোখদুটো চকচক করছে। মুখটা নিচু। সত্যসুন্দর ছাড়া আর কেউ আদতে বোঝেন নি কী ঘটেছিল। কিন্তু বলে ফেললে কী ঘটবে অনিশ্চিত। তাই চেপে রাখলেন।

আলো দেখে নাতু সিঙ্গি গর্জে বললেন, ত্রিলোচন! আলো!

যজ্ঞেশ্বর হারিকেন তুলে বললেন, সতু! দেশলাই দাও।

হারিকেনট' দিব্যি জ্বলে উঠল আগের মতো। তখন ইন্দুপ্রভার দিকে তাকিয়ে সমব্যথী স্বামী জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছিল বলো তো? আরশোলা-টোলা নাকি?

ইন্দুপ্রভা ভয় পাওয়া মুখে বললেন, না। কেমন যেন নরম অথচ শক্ত—হাঁটুর কাছে।

তাহলে ছুঁচো। নাতু সিঙ্গি বললেন। ওই যে বস্তি। যত ছুঁচো ওখান

থেকে ড্রেনপাইপ বেয়ে ওপরে ওঠে। সারা রাত ব্যাটাদের ছুটোছুটি চলে। বিষে আব কাজ হয় না। রেসিণ্ট্যান্স গ্রো করেছে বডিতে।

যজ্ঞেশ্বর ভুরু কুঁচকে সত্যসুন্দরকে বললেন, তোমার হারামজাদাটা নয় তো?

সত্যসুন্দর রিস্ক নিতে চান না। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, যাঃ! দেখছ না? কোল ছেড়ে নড়ার পাত্রই নয়। তাছাড়া জনি হলে বৌঠান বুঝি ভয় পেতেন? বৌঠান কুকুর ভালবাসেন বললেন না?

নাদু ডাক্তার যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে টর্চ নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার মতো আসবাবপত্রের তলায় ছুঁচো খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। ইন্দুপ্রভা সত্যসুন্দরের কথায় আপ্লুত। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে জনির পিঠে আলতো গুঁতোয় আদর দিতে দিতে বললেন, দুষ্টুটা! সোনাটা! ভেলভেলেটা! তুই নোস তো?

জনি মুখ ঘুরিয়ে প্যাটপ্যাট করে দেখছিল ইন্দুপ্রভাকে। সত্যসুন্দর খুশি হয়ে বললেন, খুব ভাল জাতের বাচ্চা বৌঠান। আদর পেলে আর কথা নেই। সারাক্ষণ কোল থেকে নামতে চাইবে না। বুকের ভেতর গুটিসুটি ঘুমোবে। নিন, নিন! কোলে নিয়ে দেখুন!

হামাগুড়ি অবস্থায় নাদু ডাক্তার বাঁয়ে ঘুরে দেয়ালঘড়ি দেখছিলেন, প্রায় ছটা হয়ে এল। সত্যসুন্দরের কথা কানে গেলে ডাইনে ঘুরলেন। অসুরের মতন বড-বড চোখ। ইন্দুপ্রভা জনিকে ভয়ে-ভয়ে দুহাতে তুলে বুকে নিলেন—সত্যসুন্দর তাতে প্রচুর সহযোগিতাও করলেন বটে। তারপর ইন্দুপ্রভা জনিকে আদর করতে করতে বললেন, আমাল ছোট্ট খুকুটা। আমাল ছোনাটা ভেল-ভেলেটা। কী খাবে গো? দুদু, না মাছের ঝোল?

নাদুবাবু উবু হয়ে মেঝেয় বসে গলার ভেতর বললেন, হেগে দেবে। বুঝবে ঠেলা!

না না না না না! জিভ বের করে সত্যসুন্দর প্রতিবাদ করলেন। সময় হলে ক্লিয়ার সিগন্যাল দেবে। ছটফট করবে। নামিয়ে দিলে বাইরে দৌড়ুবে। বুঝলে না? বিলিতী এটিকেট। ও আপনি ভাববেন না বৌঠান!

ইন্দুপ্রভা দুলতে দুলতে আবেগে বললেন, তাহলে অন্তত রাত্তিরটা আমার কাছে থাক না সতুবাবু।

নাদুবাবু সটান উঠে এসে দাঁড়ালেন। সত্যসুন্দর একগাল হেসে বললেন, রাখবেন? তা রাখুন না! কোনো আপত্তি নেই। এমন কী, ইচ্ছে হলে

বরাবর রাখুন! বরং তার বদলে আপনার মেয়েকে লিখে পার্লে আমাকে একটা ডালকুত্তা আনিয়ে দেবেন।

ডালকুত্তা! যজ্ঞেশ্বর হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, ডালকুত্তা পুষবে? ডালকুত্তা বাঘের চেয়ে মারাত্মক, তা জানো?

সত্যসুন্দর জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, নাদু সিঙ্গি বললেন, সতু! এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।

ইন্দুপ্রভা আপন খেয়ালে ডগমগ। পর্দা তুলে ভেতরে চলে গেলেন জনিকে বুকে নিয়ে। অমনি নাদু ডাক্তার গলা চেপে সত্যসুন্দরের মুখের কাছে তর্জনী রেখে গর্জালেন, হিপোক্রিট! মতলববাজ!

সত্যসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন। বাঃ! বা রে বাঃ! অমন দামী একটা অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা মুখের একটি কথায় বিনি পয়সায় উপহার দিলুম—আর আমায় বলে হিপোক্রিট! শুনছ যগু?

নাদু সিঙ্গি হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন। উদাস হয়ে বললেন, আমাকে দেখছি আজও ঘরেই রাত কাটাতে হবে। সতুটা বড্ড ঝামেলা বাধায়। কেমন মতলব করে এসেছিল—গছিয়ে দিতে।

সত্যসুন্দর দরজার দিকে এগিয়ে বললেন, মহাপুরুষ বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করো নাদু, আখেরে ভাল হবে। জীবে সেবে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। আর নাদু, মহাভারত-টারত করছিলে, অথচ কুকুর যে স্বয়ং ধর্মদেব, তাও জানো না। যা দিনকাল পড়েছে, এখন ধর্মের সেবা করে কাটাও। নৈলে বাঁচোয়া নেই।

সত্যসুন্দর চলে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁকে দরাজ গলায় সম্ভবত ধর্মসঙ্গীত গাইতে শোনা গেল। যজ্ঞেশ্বর বললেন, কী নাদু! চেম্বারে যাবে না আজ? রুগীরা এতক্ষণ খাবি খাচ্ছে যে!

নাদু ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাই! একটু দাঁড়াও। একসঙ্গে নামব।...

কদিন পরে যজ্ঞেশ্বর থলে হাতে বাজারে বেরিয়েছেন। একটু দূর থেকে চোখে পড়ল, ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রসরাজ গোঁসাই। যজ্ঞেশ্বর হন্তদন্ত কাছে গেলেন।

অবাক হয়ে দেখলেন, সত্যসুন্দরের কথাই ঠিক। সেই নাদুসনুদুস চকচকে মূর্তিটি এখন পোড়া গাছ হয়ে গেছে। চোখের তলায় কালির ছোপ। মোটাসোটা নাক শুঁটকো হয়ে গেছে। পরনের কাপড়চোপড় মলিন। উস্কখুস্ক চুল। এ কী দশা হয়েছে রসোর!

যজ্ঞেশ্বরকে দেখেই রসরাজ কিন্তু ফিক করে হাসলেন। অমনি যজ্ঞেশ্বরের বুকের ভেতর ধক করে উঠল। নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে বেচারী। নৈলে এমন করে হাসে কেউ?

যজ্ঞেশ্বর পাগলকে বড় ভয় পান। চোখ পিটপিট করে রসরাজকে দেখতে দেখতে দোনামনা করছিলেন, কথা বলা উচিত হবে কি না—কিন্তু তার আগেই রসরাজ বলে উঠলেন, কী যগু, কেমন আছ?

যজ্ঞেশ্বর সাহস পেয়ে বললেন, খুব ভাল রসো, খুব ভাল। তো তোমার এমন চেহারা হয়ে গেছে কেন? অসুখবিসুখ করেছে নাকি?

রসরাজ খিকখিক করে তেমনি হেসে উঠলেন ফের।

হাসছ কেন রসো? যজ্ঞেশ্বর অবাক হয়ে বললেন। না ভাই, হাসাহাসিটা ভাল নয়—যা দিনকাল পড়েছে। হাসি এখন পেটের ভেতর রাখাই ভাল।

রসরাজ বললেন, যগু! হাসছি—আনন্দে। আনন্দ! আজ আমার চতুর্দিকে আনন্দ।

সন্দিগ্ধভাবে যজ্ঞেশ্বর বললেন, মনে হচ্ছে, তুমি পরমতত্ত্ব লাভ করেছ ভায়া! উপনিষদে সেই যে আছে, না? আনন্দদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও গেয়ে গেছেন, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে! আনন্দ ভাল জিনিস।

রসরাজ খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, ধুর ধুর! ওসব বড় বড় কথা ভেবে আমায় আনন্দ হয়নি। ইদানীং কি নাদুসিঙ্গির সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার? দেখলে তুমিও আনন্দ পেতে। কী দুর্ধর্ষ পুরুষ ছিল ওই নাদু! চলে যাও সোজা ওই পার্কে। দেখতে পাবে।

নাদু ডাক্তার? ভাবনায় পড়ে যজ্ঞেশ্বর জিগ্যেস করলেন। পার্কে কী করছে? দাতব্য চিকিৎসা নাকি?

রসরাজ বিরক্ত হলেন। ধুর! খালি কথা বাড়ায়। দেখে এস না স্বচক্ষে।

যজ্ঞেশ্বরও বিরক্ত। বললেন, আহা! আমায় এখন বাজার করতে হবে না? তুমি মুখে বলো। কী হয়েছে ওর?

রসরাজ হাত চিতিয়ে একটা ভঙ্গি করে বললেন, বেঞ্চে চিৎপাত হয়ে আছে। গোঁফে পিঁপড়ে হাঁটছে। নাড়ুর সাড়া নেই। তো দেখে ভারি আনন্দ হল। চুপটি করে দেখে চলে এলুম।

হুঁ, যা ভেবেছিলেন তাই। রসরাজ পাগল হয়ে গেছেন। যজ্ঞেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আসি রসো।

ঘুরে পা বাড়াতেই খপ করে তাঁর কাঁধে ধরে রসরাজ বললেন, আহা! চললে কোথায়? কতদিন পরে দেখাসাক্ষাৎ হল। কত কথা মনে জমে রয়েছে। শুনে যাও যগু।

পরে শুনব'খন। বলে একঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞেশ্বর প্রায় দৌড়ে পালালেন। রসরাজ গালমন্দ করতে থাকলেন আঙুল তুলে। করুক। পাগলে কী না বলে।

সারাটা দিন মন খারাপ হয়ে রইল যজ্ঞেশ্বরের। বিকেলে নাড়ুডাক্তারের বাড়ি গেলেন। রসো নাড়ু সিঙ্গিকে নিয়ে রসিকতা করল কেন? পাগল হয়েছে, হয়েছে। তাই বলে এত উদ্ভট পাগলামির কোনো মানে হয় না। সবকিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার। হ্যাঁ, পাগলদেরও লিমিট থাকে। যদি নাই থাকবে, তাহলে তারা গাড়ি চাপা পড়ে না কেন? আত্মহত্যা করে না কেন? কলকাতা শহরে রাস্তাঘাটে এবেলা-ওবেলা আকছার পাগল দেখা যায়। আজ পর্যন্ত তাদের কাউকে কি গাড়ি চাপা পড়তে দেখা গেছে? গাড়ির ঝাঁকের মধ্যে পাগল দেখে তুমি যতই আঁতকে ওঠ, ওদের হুঁশ এদিকে টনটনে। জানে, পাগল বলে সাতখুন মাফ। কেউ চাপা দেবে না। চাপা পড়তে চাইলেও না। কিন্তু সুস্থ মানুষের বেলা গাড়িওলাদের অন্য নিয়ম। ঘ্যাঁচ করে চাপা দিয়ে পালাবে।

তবে ভেবে দেখলে রসো ঠিক রাস্তা ধরেছে। ওর আনন্দ হবে না তো কার হবে? পাগল হয়ে খুন করলে ফাঁসি মাফ। যাকে খুশি গালমন্দ করো, বিবস্ত্র হয়ে রাস্তায় ঘোরো এবং নর্তনকুর্দন করো। কী অঢেল স্বাধীনতা! কী দুর্দান্ত আনন্দ! কথায় বলে না? পাগলের নাকি গোবধেও আনন্দ।

যজ্ঞেশ্বর পাগল নিয়ে ভাবতে ভাবতে আকুল হচ্ছিলেন। সত্যি, ভেবে দেখলে পাগল হবার মতো বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। দায় নেই, ঝক্কি নেই। জীবন-যন্ত্রণা নেই, সম্ভবত মরণযন্ত্রণাও নেই। মুক্তকচ্ছ স্বাধীন জীবন। খালি আনন্দ আর আনন্দ। হাসিতে আনন্দ প্রকাশ করো। হাসিতে না

কুলোলে কেঁদেও আনন্দ প্রকাশ করো। রসো ঠিকই বলেছে। পাগল না হলে বোঝা যায় না, আনন্দধারা ভুবনে বয়ে যাচ্ছে কুলুকুলরবে।

শুধু একটাই গণ্ডগোল। যজ্ঞেশ্বর এবার ভড়কালেন। পাগল হলে মাঝে মাঝে লোকের প্রহার খেতে হয়। একপাত্র দুধে এটাই এককোঁটা চোনা। দরকার নেই বাবা পাগল হয়ে। যেমন আছি, তেমনি থাকি।

নাডুডাক্তারের বাড়ি অস্বাভাবিক চুপচাপ। ত্রিলোচন দরজা খুলে দিয়ে কেমন গোমড়া মুখে চলে গেল। ডাক্তার আছে? বললেও জবাব দিল না। যজ্ঞেশ্বর ভাবলেন, মেজাজ! আজকাল ভৃত্যদের ব্যাপারস্যাপারই এই। দোতলার সিঁড়ি থেকেই ডাক দিলেন যজ্ঞেশ্বর। নাডু! ও ডাক্তার!

কোনো সাড়া পেলেন না। ওপরের ঘরটা যথারীতি খোলা। ঢুকে কাউকে দেখতে পেলেন না। বাড়ির ভেতর এমন চুপচাপ দেখে একটু অস্বস্তি হল যজ্ঞেশ্বরের। এমন তো হবার কথা না। এখন নাডু সিঙ্গির ড্রয়িংরুমে বন্ধুবান্ধব চেনাজানা কেউ না কেউ থাকারই কথা। রসরাজের কথাটা মাথায় চিড়িক করে উঠল। যজ্ঞেশ্বর ভয়ে-ভয়ে একটু কেসে ভেতরের দরজার উঁকি মেরে ডাকলেন, ডাক্তার! ও ডাক্তার!

চড়া গলায় ইন্দুপ্রভার সাড়া এল, কে?

আমি যজ্ঞেশ্বর, মিসেস সিঙ্গি।

ইন্দুপ্রভাকে দেখা গেল। আলুথালু চুল। ঘষটানো সিঁদুর। ধ্যাবড়া টিপ, এলোমেলো শাড়ি। মুখের চেহারাটি সুবিধের নয়—কেমন যেন চামুণ্ডা ধাঁচের। ভুরু বাঁকা করে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ হানতে থাকলেন।

যজ্ঞেশ্বর ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ইয়ে—ও কোথায়?

কোথায় তা আমি কেমন করে জানব? ইন্দুপ্রভা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন। আপনাদের বন্ধুর খবর আপনারাই রাখেন।

ভারি অভদ্র মেয়েছেলে তো! যজ্ঞেশ্বর চটে গেলেন। কিন্তু সেটা গোপন করাই সঙ্গত মনে করলেন। তুমি অধম। তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? মুখে হাসি এনে বললেন, বেরিয়েছে বুঝি? এখন তো চেম্বারে বসার সময় নয়। তো ইয়ে, আপনার সেই অ্যালসেসিয়ানের খবর কী? মানে—সত্যসুন্দর যেটা সেদিন উপহার দিয়ে গেল? যজ্ঞেশ্বর চোখ নাচালেন।…দেখেই বুঝেছিলুম খুব ভাল জাতের বাচ্চা। মাংস-টাংস খাওয়াচ্ছেন তো? সেদ্ধ করে খাওয়াবেন কিন্তু। সঙ্গে দুএকটুকরো

গাজর দেবেন। প্রচণ্ড ভিটামিন আছে গাজরে। আর একটা জিনিস দেবেন···

ইন্দুপ্রভা হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। এতক্ষণ চোখদুটো ঠিকরে বেরুচ্ছিল—লক্ষণ টের পাননি যজ্ঞেশ্বর।···কার কথা বলছেন যগুবাবু? বাছা কি আর আছে আমার?

যজ্ঞেশ্বর সহানুভূতিতে গলে পড়লেন।···এ্যাঁ! নেই? মারা গেছে? আহা হা হা হা! জিভ চুকচুক করতে থাকলেন যজ্ঞেশ্বর।

ইন্দুপ্রভা অতিকষ্টে ভাঙা গলায় বললেন, মারা গেলেও কথা ছিল। চুরি গেছে! রাতে দিব্যি আমার বুকে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভেঙে দেখি, নেই। কোথাও নেই। কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম। থানায় খবর দিলুম। কত কাণ্ড করলুম। উহু-হু-হু—মাগো!

বুকে হাত চেপে ককিয়ে উঠলেন ডাক্তার-গিন্নি। যজ্ঞেশ্বর বললেন, সতুর বাড়ি চলে যায়নি তো? অনেকসময় গৃহপালিত প্রাণীরা···

কথা কেড়ে ইন্দুপ্রভা স্ফুরিত নাসারন্ধ্র এবং রোষকষায়িত চক্ষে বলে উঠলেন, সব বুঝি! আপনাদেরই ষড়যন্ত্র! আপনারা ষড়যন্ত্র করে ওকে চুরি করেছেন। আবার চালাকি করে মজা দেখতে এসেছেন। যান। বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।

গতিক বুঝে যজ্ঞেশ্বর কেটে পড়লেন। একটা কুকুরের জন্যে মানুষ—বিশেষ করে মেয়েমানুষ এমন মাথাখারাপ হয়ে যায়, ভাবা যায় না। অপমানটা জোর বেজেছে যজ্ঞেশ্বরের। তাঁর মতো রাশভারি এবং বিজ্ঞজন বলে পরিচিত মানুষকে এমন অভদ্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলা। পাড়ার অনুষ্ঠানে যাঁকে সভাপতি করে মালা দেওয়া হয়। ক্লাবের যিনি স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট।

চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন যজ্ঞেশ্বর। কম্পাউণ্ডার সুধীরকে জিগ্যেস করবেন ডাক্তার কোথায়। নাড়ুকে বলতেই হবে, তোমার বউ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।···

সুধীর মুচকি হেসে বলল, ডাক্তারবাবু? সোজা পার্কে চলে যান? পেয়ে যাবেন। কদ্দিন থেকে উনি ওখানে বসেই প্রেসক্রিপশান লিখছেন। ওখানেই রাত কাটাচ্ছেন। পুলিশ এসে একরাতে গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। তবু ওই।

বলো কী! যজ্ঞেশ্বর হতবাক হয়ে গেলেন। কেন?

সুধীর বলল, গিন্নিমা বাড়ি ঢুকতে দিচ্ছেন না যে! কী করবেন বলুন?

বলছেন, কুকুর তুমিই চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। যতক্ষণ না এনে দিচ্ছ, ততক্ষণ তোমার এ বাড়িতে ঠাঁই নেই।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, সর্বনাশ! তা ওহে সুধীর! নাদুর খাওয়াদাওয়া?

লুকিয়ে খাবার দিয়ে আসে ত্রিলোচন। সুধীর বলল। গিন্নিমার চোখে পড়লেই হয়েছে। তবে কি জানেন? ওই অবস্থায় মানুষের খাওয়া রোচে না। ডাক্তারবাবু শুকিয়ে চামচিকেটি হচ্ছেন।

যজ্ঞেশ্বর হনহন করে এগোলেন। রাস্তার বাঁক ঘুরেই পার্ক। ভেতরে ঢুকে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলেন নাদু সিঙ্গিকে। ঝোপের পাশে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন নাদু ডাক্তার। বুকের ওপর স্টেথিসকোপ। একটা হাত কপালে। যজ্ঞেশ্বর ডাকলেন, নাদু! নাদু!

চোখ খুলে নাদুবাবু করুণ হাসলেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। বললেন, রসোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্তভাবে বললেন। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা…

আহা! রসো কী বলল, তাই বলো আগে।

রসো বলল, সকালে তুমি এখানে একটা বেঞ্চে শুয়ে আছ মড়ার মতো।

ঘুমোচ্ছিলুম। নাদু সিঙ্গি করুণ হাসলেন। উঃ! সত্যসুন্দরটা রসোকে ফাঁসিয়ে শেষে আমাকেও ফাঁসাবে ভাবতে পারিনি। হ্যাঁ—খানিকটা আঁচ করেছিলুম বলতে পারো। সতু যেদিন কুকুর নিয়ে ঢুকল, তুমিও তো ছিলে, স্বচক্ষে দেখলে—আমি প্রবল আপত্তি করেছিলুম।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, কিন্তু প্রব্লেমটা কী?

বোঝনি? কুকুর। দ্যাট ডার্টি কুত্তাকা বাচ্চা! নাদুডাক্তার চাপা গর্জালেন। সারারাত কানের কাছে চেঁচায়। সে কী চেঁচানি রে ভাই। একফোঁটা ঘুমুবার যো নেই। ঘুম না হলে শরীর টেঁকে মানুষের? গতিক দেখে সেদিন শেষ রাতে ব্যাটাকে গিন্নির বুক থেকে তুলে নিয়ে সোজা হাজির হলুম সতুর বাড়ি। ওকে ওর জিনিস ফেরত দিয়ে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিলুম। পাছে আবার আমার বাড়ি কুকুর নিয়ে হাজির হয়, তাই নির্লজ্জের মতো শালাবাঞ্চোত করেছি। তুমুল ঝগড়াঝাঁটি একেবারে। শেষে ওর বউসুদ্ধু পাল্টা খিস্তি জুড়ে দিল। লোক জড়ো হয়ে গেল ভোরবেলা। আমি তো তাই চেয়েছিলুম। কুকুর-কেত্তন যে বড় সাংঘাতিক জিনিস।

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে নাদু সিঙ্গি ফের বললেন, কিন্তু তারপর আমার যা

হবার হল, দেখতেই পাচ্ছ। ইন্দু পণ করেছে কুকুরছাড়া বাড়ি ঢুকলে ওর মরা মুখ দেখব। ও যা জেদী মেয়ে, বলা যায় না কিছু।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, তা সতুর কাছে লোক পাঠিয়ে কুকুরটা এনে দিলেই পারতে।

নাতুবাবু ভেংচি কেটে বললেন, এঁয়ে ডিলেই পাঁত্তে। বলছ ভাল। তারপর ঘুমের জন্যে আমি ওষুধ খাওয়া ধরি—তারপর রসোর মতন ব্রেনটার বারোটা বাজাই। মেলানকলিয়া—তারপর স্রেফ লুনাটিক!

রসোর কেসটা কী?

একই। আমারটা যা। দ্য সেম কুকুর-কেত্তন। খিক করে হাসলেন নাতুডাক্তার। তাও তো আমি বাড়ির কাছাকাছি আছি। আর রসোকে দূরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

রসোর অবস্থা দেখলুম ভয়াবহ।

রসো টু-থার্ড পাগল হয়েছে। আর কিছুদিন ওই অবস্থায় থাকলে বাকি ওয়ান-থার্ড পাগল হয়ে যাবে। ও কী খেত জানো? আফিম। এ কুকুর-কেত্তন থেকে বাঁচতে হলে আফিম ছাড়া বাঁচোয়া ছিল না।

আর তুমি! নিজেরটা ভেবে দেখ নাতু। যজ্ঞেশ্বর মমতাজড়ানো গলায় বললেন।

আমি! ওয়ান-থার্ড হয়েছি বলতে পারো!

তাহলেই দেখ, সতুটা কী পাজি। কুকুর লেলিয়ে বেড়ানো আর কাকে বলে?

নাতুবাবু চোখ নাচিয়ে বললেন, বেড়াচ্ছে কি সাধে? ওর বাড়ি ঝগড়া করতে গিয়েই না বুঝলাম সব।

কী বুঝলে বলো তো? যজ্ঞেশ্বর সাগ্রহে জিগ্যেস করলেন।

দ্য সেইম কেস। আমার যা, রসোর যা, সতুরও তাই। নাতু ডাক্তার চাপা গলায় বললেন। সতুর ভীষণ কষ্ট। সারারাত বিদঘুটে চেঁচানিতে ঘুমুতে পারে না। তখন মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ছলে কাকেও গছিয়ে দিয়ে আসে। ফিরে গিয়ে বলে, হারিয়ে গেছে। হেন হয়েছে, তেন হয়েছে। ওর বউ কান্নাকাটি করে বটে, কিন্তু রসোর বউ বা আমার বউয়ের মতো তত কড়াধাতের মেয়ে না। নৈলে সতু কবে ফেঁসে যেত। যাই হোক, আমি যখন ফেরত দিতে গেলুম, ওর বউ বলল, আর কক্ষনো চোখের আড়াল করবে না ছোনাকে। ছোনা! দাদু! ভেলভেলেটা!

যাক্ বাবা। যজ্ঞেশ্বর হাঁপ ছাড়লেন। সতুর হাতে না দিলেই বাঁচোয়া।

নাদুডাক্তার বললেন, দেবে না তো। কিন্তু সতু যদি আমাদের লাইন ধরে? চুরি করে?

সর্বনাশ! আঁতকে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর। কুকুরের চেঁচানি থেকে বাঁচতে হলে তো চুরি করেই ফের কাউকে গছাতে চাইবে সতু। ওরে বাবা, আবার কার কপাল ভাঙবে?

নাদুসিঙ্গি রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন, আশা করি এবার টের পাচ্ছ, কলকাতার রাস্তাঘাটে ইদানীং পাগলের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কী?

যজ্ঞেশ্বর মনমরা হয়ে গেলেন। বললেন, এখন বুঝতে পারছি, সেদিন এপার্কে সতুকে দেখে রসো কথা বলেনি কেন। ওর কোলে ফের সেই কুকুর দেখে রসো কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এক্সপ্লানেশানটা ঠিক না নাদু?

হাই তুলে নাদু ডাক্তার বললেন, উঠি ভাই। রুগীরা আসার সময় হল। ওই দেখছ অমলতাস গাছতালায় বেঞ্চ। ওটাই এখন আমার চেম্বার। যদ্দিন না পুরো পাগল হচ্ছি, জনসেবা করে যাই। আর একটা কথা।

যজ্ঞেশ্বর তাকালেন।

নাদুডাক্তার বলে গেলেন, সাবধানে থেকো। লক্ষ্য রেখো। কেমন?···

কথাটা কানে বাজছিল যজ্ঞেশ্বরের। হুঁ—সাবধানে থাকতে হবে। সতুর সঙ্গে দেখা হলেই ছলছুতো করে ভীষণ ঝগড়া বাধাতে হবে, যাতে যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির ত্রিসীমানা না ঘেঁষে।

কিন্তু বাড়ির দরজায় ঝিমধরা সন্ধ্যার আলোয় সত্যসুন্দরকে দেখে মাথায় বাজ পড়ল।

সত্যসুন্দর একগাল হেসে বললেন, কদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাই এসেছিলুম। তোমার গৃহিণী বললেন বেরিয়েছে।

যজ্ঞেশ্বর বুঝলেন, যা হবার তাই হয়েছে। এবার তাঁর কপাল ভেঙেছে। মাথা ঘুরছে। স্ট্রোক হয়ে গেলেই এখন মঙ্গল। তবু হচ্ছে কই? কিন্তু কসাইয়ের মতো কী নিষ্ঠুর আর ঠাণ্ডা চেহারা সতুর। দেশের শত্রু সবার চোখের সামনে ঘুরছে। অরাজক অবস্থা কাকে বলে তাহলে?

যজ্ঞেশ্বর অতিকষ্টে বোবাধরা গলায় বলতে চেষ্টা করলেন, কু-কু-কু-কু···

সত্যসুন্দর ফ্যাঁচ করে হাসলেন। কুকুর। হুঁ, তোমার আগ্রহ স্বাভাবিক, যগু! দেখ—সেদিন নাতুর বাড়ি থেকে ফিরে মহাভারতের মহাপ্রস্থানপর্বটা ফের খুঁটিয়ে পড়েছিলুম। ওতে ভারতীয় দর্শনের একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। তুমি কি কুকুরের লেজ লক্ষ্য করেছ? ওই! ওই দেখ নেড়িটা যাচ্ছে! দেখে নাও। কী দেখছ? না—লেজের ডগা ঊর্ধ্বগামী। ওটা একটা সিগন্যাল। অ্যান ইটারন্যাল সিগন্যাল টোয়ার্ডস ডিভিনিটি। কুকুরের মুখ অধোগামী কিন্তু লেজ, ঊর্ধ্বগামী। এই ডায়ালেকটিকসটা তোমায় বুঝতে হবে। মুখটা থিসিস, লেজটা অ্যান্টিথিসিস এবং বডিটা সিন্থিসিস।

সত্যসুন্দর উদাত্ত স্বরে বলতে থাকলেন।···অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চাটা আমার মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ডগ বার্কস। কুকুর ডাকে। কেন ডাকে? না—ওটাই ডগের ল্যাংগুয়েজ। বাই দা বাই, মজাটা লক্ষ্য করছ যগু? ডগকে উল্টে দিলেই গড হয়ে যায়? তাহলেই দেখ ডগ ইজ ডিভাইন। ডগ ইজ গড অ্যাণ্ড দেয়ারফোর গড ইজ ডগ। লজিক যগু, লজিক এবং ম্যাথমেটিক্স। এ যদি বি হয়, বি তাহলে এ। তাই না? তো যা বলছিলুম, কান করে শোনো।

থক করে কেশে থুথু ফেলে সত্যসুন্দর বললেন, ডগ বার্কস। জনি একটা কুকুর। জনি বার্কস। তার মানে জনির ওটা ভাষা। জনি কিছু বলতে চায়। সারারাত জনি নিজের ভাষায় কথা বলে। আমরা মানুষ। ও-ভাষা বুঝি না বলেই বিরক্ত হই। ঘুম পণ্ড হচ্ছে বলে তুলকালাম করি। কিন্তু সে তো কিছু বলতেই চাইছে। কী বলতে চাইছে? জানো যগু, শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে রিসার্চ শুরু করলুম। রাতের পর রাত—মানে নাতু ফেরত দিয়ে আসার পর থেকে এই নিয়ে কাটাচ্ছি। ফোনেটিকস অনুসারে প্রত্যেকটি ধ্বনি নোট করছি। টেপরেকর্ডারে ধরে রাখছি। ফের তাই নিয়ে বসছি। ভেরি ভেরি ইণ্টারেস্টিং অ্যাণ্ড থ্রিলিং সাবজেক্ট। যেমন ধরো—ঘ্যাঃ! গঃ গর্র্র্···গউ! কিংবা ধরো আউ! ঘঁঃ।

সেই নেড়িটা একটু তফাতে বসে সত্যসুন্দরের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার চাপা একটা শব্দ করে মুখ তুলে বলল, ঘেউ-উ-উ!

সত্যসুন্দর লাফিয়ে উঠলেন। দেখছ? দেখছ? জবাব দিচ্ছে শুনছ? ঘঁঃ! গউ গউ গউ-উ-উ!

যজ্ঞেশ্বর গলা ঝেড়ে বললেন, আসি সতু।

সত্যসুন্দর কান করলেন না। নেড়িটার দিকে সহাস্যে এগিয়ে গেলেন যেন সম্ভাষণের ভঙ্গিতেই। যজ্ঞেশ্বরের কানে এল, সত্যসুন্দর এবার গলা ছেড়ে নেড়ির সঙ্গে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছেন।…

ঘরে ঢুকেই যজ্ঞেশ্বর বললেন, একগ্লাস জল।

গৃহিণী দীপ্তিময়ী জলের গ্লাস দিয়ে বললেন, সতুবাবু এসেছিলেন। ভদ্রলোক কীসব আবোল-তাবোল বলে গেলেন। একবর্ণ বুঝলুম না। হ্যাঁ গো, খোঁজ নিয়ে দেখো তো…আজকাল নেশা-টেশা ধরেছেন নাকি। সেইরকম লাগল।

যজ্ঞেশ্বর আস্তে বললেন, যাক গে বাবা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। খুব বেঁচে গেছি।

সন্দেহাকুল দৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে দীপ্তিময়ী নিজের কাজে গেলেন।…

সোনার পিদিম

জনাই ছিল বারিক-ফ্যামিলির পুরাতন ভৃত্য। লম্বা-চওড়া কুচকুচে কালো এক মানুষ। যৌবনে তেমনি তেজী, সাহসী আর চঞ্চল প্রকৃতিরও। বাড়িতে ডাকাত পড়লে তার এসব গুণের পরিচয় পাওয়া যেত। এখন তার বয়স হয়েছে। তাই এমন অবস্থা।

জনাই কিছুদিন থেকে কেমন শান্ত আর উদাস হয়ে উঠেছিল। ঝিম ধরে বসে থাকত। পুরাতন ভৃত্য বলে তাকে দিয়ে খাটাখাটুনির কাজ আর বিশেষ করানো হত না বটে, কিন্তু ছোটখাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যেমন ন'বউমা যাবেন পিত্রালয়ে। তাঁকে স্টেশন অব্দি এসকর্ট করা, কিংবা, বুড়োবাবুর দোতলা থেকে নেমে রোয়াকে বসার ইচ্ছে হয়েছে, তাঁকে ধরে নামিয়ে আনা—এসবের দায়িত্ব দেওয়া হত।

জনাই আগের মতো প্রচণ্ড ধরনের খাওয়া-দাওয়াও কমিয়ে দিয়েছিল। তার পাঁজরার হাড় উঁকি দিচ্ছিল। রাতে নাকি ঘুমও বিশেষ হচ্ছিল না। জনাই নিজেই বলত সেকথা। কিন্তু জিগ্যেস করলে একটু হেসে বলত, 'ও কিছু না।'

পুরাতন ভৃত্য। সুতরাং তাকে জোর করে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারবাবু তাকে শুইয়ে বিস্তর টেপাটেপি এবং স্টেথিসকোপ প্রয়োগ ক'রে শেষে অনেক জেরা চালিয়েও কিছু আঁচ করতে পারলেন না। অগত্যা

খিদে ও ঘুমের টনিক লিখে দিলেন। জনাই ওষুধগুলো ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা, সেদিকেও নজর রাখতে হল। কিন্তু জনাইয়ের উন্নতি দেখা গেল না।

তখন বাড়ির কর্তা বুড়োবাবু—মন্মথনাথ বারিক তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'আসল কথাটা বলদিকি জনাই! তোর হয়েছেটা কী?'

জনাই একটু হেসে বলল, 'কিছুই তো হয়নি বুড়োবাবু!'

'হয়নি তো অমন মড়া হয়ে থাকিস কেন?'

'আজ্ঞে সেটাই তো বুঝতে পারছি নে।'

বুড়োবাবু গম্ভীর মুখে চাপা গলায় বললেন, 'আবার বিয়ে করবি? তাহলে বল্, পাত্রীর খোঁজ করি।'

জনাই তাঁর চেয়েও গম্ভীর হয়ে এবং জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি! সে কী কথা বুড়োবাবু! আমার আর বিয়ের বয়স আছে?'

জনাইয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন। কিন্তু চুলে পাক ধরেনি। কিছুদিন থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। দাড়িও কুচকুচে কালো। প্রথম যৌবনেই তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বারিকবাড়ির এক যুবতী চাকরানীর সঙ্গে। মেয়েটি সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। তারপর বুড়োবাবু তার আবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন। জনাইকে রাজি করাতে পারেননি।

জনাইয়ের এ কথা শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বলব জনাই, তুই ঢঙ করছিস খামোকা।'

জনাই মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি কি করছি? করাচ্ছে আমাকে দিয়ে।'

মন্মথ অবাক হয়ে বললেন, 'করাচ্ছে মানে? কে করাচ্ছে?'

জনাই দুটো চোখের তারা ওপরের দিকে একবার ঠেলে তুলে তক্ষুণি নামিয়ে এনে বলল, 'সে।'

'সে?' মন্মথনাথ এবার হেসে ফেললেন, 'সে মানে—ভগবান তো?'

জনাই দৃষ্টিশূন্য চোখে তাকিয়ে বলল, 'কে জানে! সারাক্ষণ আমাকে বলছে, সাধু হয়ে যা জনাই!'

বুড়োবাবু আরও উচ্চহাস্যে করে বললেন, 'তোর মাথা! ওরে মুখ্যু, সাধু হওয়া কি সহজ কথা?' বলে একটা দোঁহাগোছের হিন্দি প্রবচন আওড়ালেন।

'জটা লোটা কম্বল
ইয়ে হ্যায় সাধুকা সম্বল॥

পেড় গঙ্গা ধুনি
ব্যাস্, হো যাও মহামুনি ॥'

বুড়োবাবু বললেন, 'বুঝলি কথাটা ? সাধু হতে গেলে মাথায় চাই জটা, হাতে চাই একটা লোটা আর কাঁধে চাই একটা কম্বল। পেড় গঙ্গা ধুনি। চাই একটা গাছ। যে-সে গাছ নয়, কাছে গঙ্গা থাকা চাই। তারপর চাই গিয়ে ধুনি। ধুনি জ্বেলে বসে ধ্যান করতে হবে। পারবি ?'

জনাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে পারব।'

বুড়োবাবু রেগে গেলেন। 'পারবি ? কিন্তু জটা ? চিৎপুর থেকে কিনে আনবি বুঝি ?'

জনাই নিজের চুলের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, 'দেখুন বুড়োবাবু, আমার জটা গজাচ্ছে !'

বুড়োবাবুর নজর কম। হাত বাড়িয়ে জনাইয়ের চুলের ভেতর সত্যিসত্যি কড়ে আঙুলের মতো একটুখানি জটা টের পেয়ে চমকে উঠলেন। তারপর গুম হয়ে বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে।'…

এর কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা বারিকবাড়িতে চাপা উত্তেজনা এবং সাড়া পড়ে গেল। বুড়োবাবু নিজে থেকে চলাফেরা করতে পারেন না। টের পেয়ে চড়া গলায় ডাকাডাকি করে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। কতক্ষণ পরে এক নাতনী পুঁচকি এসে বলল, 'ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা ! দেখবেন আসুন জনাইদা কী করছে !'

মন্মথনাথ আঁতকে উঠে বললেন, 'কী করছে রে ?'

'উঠোনে বসে মাথা নাড়ছে খালি। আর কী সব বলছে। মা বলল, জনাই-দাকে ভূতে ধরেছে। তাই ওঝা ডাকতে গেল ছোটকাকু।'

মন্মথনাথ ব্যস্তভাবে বললেন, 'পুঁচকি, আমায় ধরদিকি। আমি নিচে যাব।'

পুঁচকি ঠাকুর্দাকে অনেক কষ্টে ধরে নিচে নামিয়ে আনল। বারান্দার মাথায় একটা একশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বালানো হয়েছে ইতিমধ্যে। একে-একে পাড়া-পড়শীরাও এসে জুটেছে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। উঠোনের মধ্যি-খানে বসে জনাই অনবরত মাথাটা দোলাচ্ছে আর কী যেন বলছে।

বুড়োকর্তাকে দেখে ভিড় দুপাশে সরে দাঁড়াল। কে একটা চেয়ার এনে দিল। বুড়োবাবু চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ কান পেতে জনাইয়ের কথা বোঝ-বার চেষ্টা করলেন। জনাইয়ের মুখটা মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং চোখের

ঢেলা বেরিয়ে বিকট হয়ে যেন বুড়োবাবুকেই ভয় দেখানোর তাল করছে। একটু ভয় যে বুড়োবাবুর হচ্ছে না, তা নয়। কারণ এ মুহূর্তে আর ওই মাথানাড়া চোখওল্টানো লোকটাকে তাঁর চিরচেনা পুরাতন ভৃত্য বলে মনে হচ্ছে না। ধন্দ লাগছিল বুড়োবাবুর। কেউ যেন কবে থেকে জনাইয়ের মধ্যে ওত পেতে বসে ছিল, হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে এবং সে যেন বা মারাত্মক এক অতিপ্রাকৃত শক্তি। ক্রমশ বুড়োবাবুর ভয়টা বাড়তে থাকল।

জনাইয়ের মুখ দিয়ে যে কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বেরুচ্ছে, সেগুলো দুর্বোধ্য ঠেকল বুড়োবাবুর। শুধু একটা কথা যেন আঁচ করলেন। 'কালীপাট'। সব থাকতে কালীপাটের কথা কেন বলল বুঝতে পারছিলেন না মন্মথনাথ। ইশারায় মেজছেলে শিবনাথকে ডাকলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'শিবু, কালীপাট বলল শুনলি?'

শিবনাথ প্রাইমারি টিচার। আবার বউয়ের নামে মডিফায়েড রেশনিংয়ের ডিলার। হাস্কিং মেশিন এবং জাঁতাকলও আছে। সে ব্যস্ত মানুষ। ব্যাপারটা তার কাছে বিরক্তিকর। বলল, 'ভূতের ভর উঠলে অমন কত কী বলে! ছেড়ে দিন না। গ্যাদা এসে ভূত ভাগিয়ে দেবে মারের চোটে।'

বুড়োবাবুর মনে খটকা লেগে রইল। ততক্ষণে জনাইয়ের মাথা নাড়া থেমেছে। সামনে ঝুঁকে মাথা লুটিয়ে প্রণামের ভঙ্গীতে বসে আছে। কিন্তু পা দুটো আসন করে গুটোনো রয়েছে। তার পিঠটা একটু একটু কাঁপছে। সেই সময় গ্যাদা বাউরি হাঁক ছেড়ে বাড়ি ঢুকল। 'ব্যোম! কালী-কালী-কালী-করালী! ব্যোম!'

শিব আর কালী দুই দেবদেবীই গ্যাদা বাউরির সহায়। বেঁটে হাড় জির-জিরে গড়নের লোক। বয়স জনাইয়ের কাছাকাছি। তার মাথায় জটা না গজালেও রুক্ষ বড় বড় এক মাথা চুলের অভাব নেই। সে বেশ সেজেগুজেই এসেছে। পরনে লাল এক টুকরো কাপড়। গলায় রীতিমতো রুদ্রাক্ষের মালা। দু-কানে তামার রিং। হাতে অষ্টধাতুর বালা। কপালে দগদগে লাল সিঁদুরের ছোপ। কাঁধে তেল চিটচিটে ছোট্ট একটা থলে ঝুলছে আর হাতে অষ্টাবক্র একটি ছড়ি।

জনাইয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে ফের এক হাঁক মারল, 'ব্যোম! কালী-কালী-কালী করালী! ব্যোম!' তারপর মুচকি হেসে ছড়িটি তুলে জনাইয়ের পিঠে ঠেকিয়ে বলল, 'এই আবাগীর পুত! এই গুখেকোর ব্যাটা! উঠে বস দিকিনি! দুটি কথাবার্তা কই। দেখি তুই কে! হুঁ ওঠ্! 'ওঠ্!'

আশ্চর্য, জনাই সটান মাথা তুলে বসে লাল চোখে তাকাল তার দিকে। তারপর দাঁত কড়মড় করতে থাকল। উঠোনের ভিড় সেই মূর্তি দেখে কাঠ হয়ে গেল। শুধু প্রাইমারি শিক্ষক শিবু চাপা গলায় বলল, 'ঢঙ!'

গ্যাঁদা জনাইকে তাচ্ছিল্য করে বলল, 'উঁ হুঁ হুঁ! ওতে গ্যাঁদা ভড়কাবে না বাছাধন! আরও কিছু অস্তর থাকে তো শান দাও!'

জনাই ভয়ংকর মূর্তি হয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'যা যা!'

গ্যাঁদার তড়পানি শুরু হল। সে 'তবে রে' বলে থলে থেকে একটা ধুপচি বের করল। ধুপচিতে প্রকাণ্ড একটা নারকেল ছোবড়ার গুটি রেখে বলল, 'বাবুমশাইরা! দেশলাই দিন!' শিবু তাকে দেশলাই দিল। সবাই অবাক চোখে গ্যাঁদার আয়োজন দেখতে থাকল। জনাই তেমনি লাল চোখে তাকিয়ে দাঁত কড়মড় করছে।

একটু তফাতে বসে গ্যাঁদা ওঝা ধুপচিতে ছোবড়াটা জ্বেলে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে নিল। তারপর কাগজের পুরিয়া থেকে লঙ্কাগুঁড়ো বের করে অট্টহাসি হেসে বলল, 'এই তোর মরণ বাণ! এখনও বলছি—যক্ষ-রক্ষ ভূতপ্রেত যেই হোস, শিগগির চলে যা!'

জনাইয়ের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তখন গ্যাঁদা ধুপচির আগুনে লঙ্কা গুঁড়ো ছড়ালো। ধোঁয়া উঠতে থাকল। সে ধুপচিটা এগিয়ে নিয়ে গেল জনাইয়ের নাকের কাছে। অমনি জনাই মুখ ঘুরিয়ে গোঁ গোঁ করে বলল, 'জ্বালাতন করো না! পেলয় কাণ্ড হবে।'

গ্যাঁদা আবার অট্টহাসি হাসল। 'পেলয় কাণ্ড হবে! বলেছিস ভাল। কে তুই বল দিকিনি এবার?'

জনাই বিকৃত স্বরে বলল, 'বলব না যা!'

গ্যাঁদা ধুপচিতে লঙ্কা গুঁড়ো ফের ছড়িয়ে ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল এবং বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে থাকল। ঝাঁঝালো ধোঁয়ার প্রকোপে ভিড়ের অনেকে খকখক করে কাসতে থাকল। অনেকে নাকমুখে হাত চাপা দিল। জনাই কাসতে কাসতে বলল, 'বলছি, বলছি।'

'হুঁ, বল।'

'আমি কালীপাটের সাধুবাবা।' বলে জনাই খকখক করে কাসতে লাগল।

ভিড় চমকে উঠল। গ্যাঁদাও একটু চমকাল। কিন্তু সেটা গোপন রাখতে গর্জন করে বলল, 'মিথ্যে।'

জনাই পাল্টা গর্জন করল। 'সত্যি? আমি কালীপাটের সাধুবাবা!'

গ্যাদা ধুপচি আর ছড়ি বাগিয়ে বলল, 'পেমাণ? পেমাণ দে!'

'পেমাণ আছে নালদীঘির ঈশেন কোণে।'

'কী পেমাণ?'

'পেমাণ আছে অশত্থ তলায় দ্যাখ গে যা।'

ইতিমধ্যে লোক-সংখ্যা বেড়ে গেছে। উঠোনে তিল ধারণের জায়গা নেই। ওপরের বারান্দা থেকে বুড়োকর্তার বড় ছেলে সুমথনাথ ভূতছাড়ানো দেখছিল। সে নেমে এল এতক্ষণে। তারপর মেজ শিবনাথকে বলল, 'এ যে হাট বসে গেল বাড়ির ভেতর শিবু! চুপচাপ কী দেখছিস!'

শিবু বলল, 'বললেই তো সবাই রাগ করবে। বরং তুমিই দেখ।'

সুমথনাথ রাশভারি বদরাগী মানুষ। তাকে সবাই ভয়-খাতির দুই-ই করে। হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল, 'কী হচ্ছে কী সব? এটা বাড়ি, না খেলার ময়দান? রুনু, ওদের বল তো চলে যেতে।'

ছোট রুনু মস্তান টাইপ ছেলে। দু-দুবার হায়ারসেকেণ্ডারিতে ফেল করে এখন মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়। তার অনেক বন্ধু। সে ভিড় হঠাতে শুরু করল। তার বন্ধুরাও নেমে পড়ল। এক মিনিটের মধ্যে উঠোন প্রায় ফাঁকা। শুধু বাড়ির বউঝি, আর রুনুর জনাতিনেক বন্ধু রয়ে গেল। সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

বুড়োকর্তা কান খাড়া করে গ্যাদা এবং জনাইয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। তাঁর ঘোলাটে চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল। অশ্বত্থতলায় প্রমাণের ব্যাপারে গ্যাদাও চার্জ করে চলেছে অনবরত। কিন্তু জনাই তখন থেকে শুধু ওই এক রা। 'গিয়ে দ্যাখ গে যা!'

গ্যাদার লঙ্কাগুঁড়োর পরিমাণ অতি সামান্য। আগের দিন এক জায়গায় ভূতে ধরা মেয়ের পেছনে পঞ্চাশ গ্রাম গুঁড়ো লঙ্কার তিন ভাগই খরচ হয়েছিল। সমস্যা হচ্ছে, মেয়েরা লঙ্কার ঝাঁঝ সইতে অভ্যস্ত। লঙ্কার ফোড়নের ঝাঁঝ বারো মাস তিরিশ দিনই নাকে লাগছে। তাই তাদের ভূতের মোক্ষম ওষুধ হল পিটুনি। পুরুষমানুষদের জব্দ করতে এক চিলতে লঙ্কাগুঁড়োই যথেষ্ট। সেই ভেবে গ্যাদা বেশি করে নিয়ে আসেনি। জনাইকে যে ধরেছে, সে বড় ধূর্ত। লঙ্কার স্টক ফুরিয়ে গেছে। জনাইয়ের বার বার ওই হেঁয়ালির দরুন খাপ্পা হয়ে গ্যাদা ওঝা হাঁকল, 'বাড়িতে

গুঁড়ো লঙ্কা থাকলে একটুখানি দিন দিকিনি মশাই! এ ব্যাটা বড়ই ধূর্তুমি কচ্ছে যে।'

বুড়োবাবু এতক্ষণে মুখ খুললেন। 'গ্যাঁদা, ওকে ভাল করে জিগ্যেস করো তো ও কে।'

গ্যাঁদা জনাইয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। 'অ্যাই! বুড়োকর্তা শুধুচ্ছেন, আরেকবার বল দিকিনি কে তুই? ঠিক-ঠিক বলবি। নৈলে লঙ্কা গুঁড়োর অডার দিয়েছি শুনলি তো?'

জনাই পরিষ্কার বলল, 'আমি কালীপাটের সাধুবাবা।'

বুড়োবাবু গলার ভেতর বলবেন, 'ওকে জিগ্যেস করো গ্যাঁদা। ও যদি সত্যি কালীপাটের সাধুবাবা হয়, ও কালীপাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন?'

গ্যাঁদা ওঝা কথাটা রিপিট করল। জনাই দুলতে দুলতে বলল, 'আমি কোথাও যাইনি।'

বুড়োবাবু ঘুরে তিন ছেলের দিকে তাকালেন। মেজ এবং ন'ছেলে কলকাতায় থাকে। ছোট কমু অবশ্য কালীপাটের সাধুবাবার কথা জানেও না। তার তখন জন্মও হয়নি। সুমথ এবং শিবুর মুখ গম্ভীর।

গ্যাঁদা হা হা করে হেসে বলল, 'যাসনি? তবে ছিলিস কোথায়?'

জনাই আবার মাথা দোলাতে শুরু করল। দোলাতে দোলাতে বলল, 'আমি কালীপাটে ছিলাম। কালীপাটে ছিলাম। আমাকে রাত দুপুরে মন্দিরের ভেতর...'

বুড়োকর্তা দ্রুত গ্যাঁদার হাতের ছড়িটা কেড়ে নিয়ে জনাইয়ের মাথায় মারলেন। সুমথ না ধরে ফেললে আরও কয়েক ঘা মারতেন। সুমথের শরীরে শক্তি আছে। ছড়িটা গ্যাঁদাকে ফিরিয়ে দিয়ে জনাইয়ের চুল দুহাতে খামচে ধরল। তারপর ওকে হ্যাঁচকা টানে ওঠাবার চেষ্টা করল।

তখন বুড়োকর্তা সংযত হয়ে বললেন, 'ছেড়ে দে সুমু।'

সুমথ রাগী মুখ করে সরে গেল। জনাই পড়ে গিয়েছিল। একটুও নড়াচড়া নেই আর। বুড়োকর্তা বললেন, 'গ্যাঁদা, বাড়ি যাও। শিবু, গ্যাঁদাকে সিধেপত্র দে। দুটো টাকাও দিস।'

জনাই উঠোনে পড়ে রইল। বুড়োকর্তা আবার দোতলায় গেলেন নাতনীর কাঁধে হাত রেখে। নিচের তলায় কিছুতেই থাকতে চান না। দম আটকে যায় নাকি।

এদিন অনেক রাত অব্দি জানালার পাশে বসে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলেন লালদীঘির দিকে। দীঘির পাড়ে কালীপাট। জঙ্গলের ভেতর জরাজীর্ণ এক মন্দির। বহু কাল থেকে সেখানে পুজোআচ্চা বন্ধ। অবয়বহীন পাথর-প্রতিমাকে পাশের গ্রামের চৌধুরিবাবু নিয়ে গিয়ে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। সেও বিশ বছর আগের কথা। গত বছর বর্ষায় এক সাধুবাবা হঠাৎ পোড়ো কালীপাটে ডেরা পেতেছিলেন। ভক্ত জুটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ এক দিন সাধুবাবাকে মন্দিরের ভেতরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

জনাই সেই কথাটাই তো বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কেন রাগ হল এবং মেরে বসলেন ওকে, বুড়োবাবু বুঝতে পারছিলেন না। এজন্যই বলে রাগ চণ্ডাল। গ্যাঁদা বাউরি কী বুঝল কে জানে!

আর ওই কথাটারই বা মানে কী? লালদীঘির ঈশাণ কোনে অশ্বত্থ-গাছের তলায় 'প্রমাণ' আছে। কিসের প্রমাণ বলতে চাইছিল জনাই?

প্রথমে অতটা কান করেননি মন্মথনাথ। এখন অনেক রাতে কথাটা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, সত্যি কি জনাইয়ের আত্মাতে সাধুবাবার আত্মা ভর করেছিল? মন্মথনাথ এ রাতে ঘুমুতে পারলেন না।.........

সকালে জনাইয়ের খোঁজ নিলেন বুড়োবাবু।

জনাই আস্তে আস্তে এসে ঘরের মেঝেতে আগের মতো বসল। মুখটা গম্ভীর। বুড়োবাবু একটু হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'কী রে সাধুবাবা! কাল হঠাৎ কী হয়েছিল?'

জনাই বলল, 'আজ্ঞে কিছু বুঝতে পারছিনে। শরীরটা বড্ড ব্যথা করছে খালি।'

'মাথায় ব্যথাট্যথা নেই তো?'

জনাই একটু হাসল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'হুঁ ঝিমঝিম করছে।'

বুড়োবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কাল সন্ধ্যাবেলায় তোর ভর উঠে-ছিল, জানিস?'

জনাই ঘাড় নাড়ল।

'জানিস?'

জনাই মুখ নামিয়ে বলল, 'বউমারা বললেন সব কথা। আমি তো বুঝতেই পারছিনে কেন ওসব কথা বললাম।'

বুড়োবাবু আস্তে বললেন, 'লালদীঘির ঈশান কোণে অশত্থতলার কথা বলছিলি।'

জনাই তাকাল নিষ্পলক চোখে।

'আর মন্দিরের ভেতর সাধুবাবা বলেই থেমে গেলি।' বলে বুড়োকর্তার বিবেকে বাধল। সংশোধন করে বললেন, 'আমি তোকে বলতে দিইনি যা বলতে যাচ্ছিলি।'

জনাই তেমনি তাকিয়ে রইল দৃষ্টিশূন্য চোখে।

বুড়োবাবু কেসে গলা ঝেড়ে বললেন, 'সাধুবাবা যখন মারা যায়, তখন কি তুই পাশে ছিলি?'

জনাই মাথা নেড়ে গলার ভেতর বলল, 'না।'

'তখন অনেক রাত। বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘ ডাকছিল। সাধুবাবার কাছে শাস্ত্র কথা শুনতে শুনতে আটকে পড়েছিলাম। হঠাৎ সাধুবাবা পেট চেপে ধরে ধড়ফড় করতে লাগল। তখন তুই কোথায়?'

জনাই বলল, 'ছাতি আর লণ্ঠন নিয়ে আপনাকে আনতে গেলাম।'

'সে তো অনেক পরে। তখন সাধুবাবা মারা পড়েছে।'

জনাই বলল, 'পুরনো কথা বলে লাভ কী বুড়োবাবু? ছেড়ে দিন।'

'তুই-ই তো কাল সবার সামনে পুরনো কথা তুললি জনাই!'

'বিশ্বাস করুন। আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

জনাই দুহাতে বুড়োবাবুর পা ছুঁয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন।'

মন্মথনাথ নিশ্চিত হয়ে বললেন, 'বস্। কথা আছে।'

জনাই একটু চঞ্চল হয়ে বলল, 'এক জায়গায় বসে থাকতে আমার ভাল লাগছে না বুড়োবাবু। খালি বাইরের দিকে মন টানছে। আমাকে আর আটকে রাখবেন না।'

বুড়োকর্তা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর সাধু হওয়া আটকাতে আমি পারব না জনাই। তার ওপর কালীঘাটের সাধুবাবা যখন তোকে পেয়ে বসেছে, তখন আর তোর উদ্ধার নেই। ঠিক আছে। যা তোর ইচ্ছে।'

জনাই বেরিয়ে গেল।.........

গ্যাদা বাউরির বউ নেত্যবালা নালদীঘির পাড়ে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল। পূর্বপাড়ে কালীপাট—সেই পুরনো ভাঙাচোরা মন্দির। সাধুবাবার কুঁড়েঘরের মাটির দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। কিন্তু খড়ের চাল বাঁশ সুদ্ধ গরিব-গুরবো কাঠকুড়ুনিরা উপড়ে নিয়ে গেছে খানিকটা করে। নেত্যবালা দেখল সেখানে কেউ বসে আছে।

জষ্টিমাসে কাঠফাটা রোদ্দুর। এখানে ঘন ছায়ায় শিরশির করে বাতাস বইছে। ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। পাখি ডাকছে। নিঝুম নিরিবিলি জায়গা। মন্দিরের পেছনে নিচের দিকটায় শ্মশান। দিন-দুপুরেও গা ছমছম করে এখানে এসে।

সাধুবাবার ন্যাড়া চালাঘরের মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে কে বসে আছে দেখে নেত্যবালা এক পা-এক পা করে ঝোপঝাড়ের ভেতর সেদিকে এগিয়ে গেল।

তারপর অবাক হয়ে দেখল, বারিক-বাড়ির সেই জনাই চোখ বুজে বসে আছে। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি গোঁফ। উস্কখুস্ক বড় বড় চুল। খালি গা। পরনে যেমন তেমন এক টুকরো ময়লা কাপড়। নেত্যবালা থ হয়ে গেল।

একটু পরে জনাইয়ের ঢুলুনি শুরু হল।

নেত্যবালার স্বামী ভূতের ওঝা। সে অন্তত ভূতের ভয় পায়-টায় না। মুখ টিপে হেসে বসে পড়ল নগ্ন মাটিতে। জনাইয়ের বুঝি ভর উঠেছে। বিড়বিড় করে কী বলছে ও। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল নেত্যবালা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে জনাইয়ের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বলল, 'আমি কালীপাটের সাধুবাবা। আমি কালীপাটের সাধুবাবা!'

নেত্যবালা চমকে উঠল। তার ভয় করতে লাগল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। সে ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলল মাটিতে মাথা লুটিয়ে।

জনাইয়ের মুখ দিয়ে সাধুবাবার আত্মা বলল, 'তুই কে রে এখানে?'

'সাধুবাবা, আমি দুঃখিনী নেত্যবালা।'

'তুই এখানে কী করছিস?'

'পেটের জ্বালায় কাঠকুটো কুড়োতে এসেছি, সাধুবাবা!'

জনাই জোরে মাথা দোলাতে দোলাতে কথা বলছে। চোখের তারা সাদা হয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে গোঁ গোঁ করে বলল, 'ঈশেন কোণায় বাজপড়া অশ্বত্থ-গাছ দেখতে পাচ্ছিস?'

নেত্যবালা অবাক হয়ে গেল। সে খানিকটা দূরে পেছনে শীর্ণ অশ্বত্থগাছটা দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, পাচ্ছি দেখতে ওই তো।'

'অশ্বত্থতলায় মাটি খুঁড়ে দ্যাখ গে যা।'

নেত্যবালা অবাক হয়ে বলল, 'ক্যানে বাবা? মাটি খুঁড়তে বলছেন ক্যানে গো?'

জনাইরূপী সাধুবাবা মাথা দোলাতে দোলাতে তাকে এবার অশ্লীল গাল দিতে শুরু করল। নেত্যবালা ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে কেটে পড়ল। তার শরীর ভয়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল।

বাড়ি ফিরে সে হাঁফাকে হাঁফাতে বলল, 'ওগো। উদিকে এক কাণ্ড দ্যাখ গে।'

গ্যাদা বাউরি দুপুরবেলা তাড়ি গিলে দাওয়ায় চিত হয়ে শুয়ে ছিল। নেশার ঘোরে বলল, 'যা যা! ইঁদারা ডিঙেয়ে চলে যা!'

নেশার ঘোরে কোনো মেয়ের ভূতকে হুকুম করছে। নেত্যবালার থাম-চানিতে শেষে লাল চোখ খুলে বলল, 'কী? ফাড়ছিস ক্যানে? হল কী তুর? শ্যালে ধরেছিল?'

নেত্যবালা কিল তুলে বলল, 'আবার ওই খারাপ কথা? হুঁশ করে শোনো—ইদিকে এক কাণ্ড।'

সে চাপা গলায় ঘটনাটা বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে নেশা কেটে গেল গ্যাদার। উঠে বসল সে। ফিসফিস করে বলল, 'যেদিন পেথম ভর উঠেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে গেল—বুঝলি? সেদিনও ওই কথা বলেছিল। নাল-দীঘির ঈশেন কোণায় অশ্বত্থতলায় পেমাণ আছে। কিছু বুইতে পারিনি।'

নেত্যবালা বলল, 'বুইতে তো আমো পাল্লাম না। কী আছে বলো দিকিনি মাটির তলায়?'

'নিচ্চয় আছে কিছু।' গ্যাদা হাই তুলল। 'তবে কথাটো চেপে যা। এ বড় গুহ্য কথা মনে হচ্ছে।'…

সেদিন সন্ধ্যাব পর ওরা দুজনে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নালদীঘির ঈশান কোণে যেই এসেছে, অমনি অশ্বত্থ গাছটার কাছ থেকে কেউ গর্জন করে বলল, 'কে রে? কড়মড় করে মুণ্ডু চিবিয়ে খাব। পালা-শিগগির!'

ভড়কে গিয়ে গ্যাদা আর তার বউ পড়ি কী মরি করে পালিয়ে এল।…

জনাই কালীপাটে সাধুবাবার ভাঙা ডেরায় কদিন থেকে কাটাচ্ছে। বুড়োবাবু খবরটা পাওয়ার পর ভাবনায় পড়েছিলেন। শেষে হুকুম দিলেন, 'ঠিক আছে। চাল তুলে ছাউনি করে দাও। থাক ওখানে। জিজ্ঞাসা করো, যদি খেতে চায়, তারও ব্যবস্থা হবে। যা যা বলবে, সব মেনে নিও।'

ভর যখন ওঠে না, তখন জনাই অন্য মানুষ। বারিক বাড়ির পুরাতন ভৃত্য ছিল। সেই ভাবটা কাটাতে পারে না। পাল্কী চেপে বুড়োবাবু একদিন কালীপাটে এলে জনাই তাঁকে খাতির করে বসাল। এখন তার পুরোপুরি সাধুর চেহারা।

বুড়োবাবু চারদিকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো জনাই?'

'আজ্ঞে না। খুব ভাল আছি।'

'তোর জন্য কমণ্ডলু আনতে বলেছি প্রমথকে কলকাতা থেকে।'

'কী দরকার?'

হাসলেন বুড়োকর্তা। 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণ-বিচারি। ও জনাই, গেরুয়া বস্ত্র পরে থাকিস। পাঠিয়ে দেব।'

জনাই বিনীতভাবে বলল, 'একখানা রুদ্রাক্ষ মালার বড় ইচ্ছে, বুড়োবাবু।'

'আনিয়ে দেব'খন।' বুড়োকর্তা ফের একটু হাসলেন। 'স্বপাক খাচ্ছিস দেখছি।'

'আজ্ঞে।'

'খামোকা ঝামেলা করিস কেন? আগের সাধুবাবাকে নরুঠাকুর রান্না করা খাবার দিয়ে যেত। খেতেন।'

জন্যই ঘাড় গোঁজ করে বলল, 'কী দরকার?'

'হ্যাঁ রে, সাধু যে হলি, শাস্ত্রকথা বলতে পারবি তো? জানিস কিছু?'

'কিছু কিছু জানি বৈকি।'

'বলিস কী? কোথায় শিখলি?'

'সাধুবাবার কাছে ওঠাবসা করতাম না বুড়োবাবু?'

'হুঁ, করতিস বটে।' একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'রাতে তোর ভয় করে না জনাই? শ্মশান জায়গা।'

জনাই হাসল। 'না। ভয় কিসের?'

'কিছু দেখতে-টেখতে পাস?'

'পাই বৈকি।'

চমকে উঠে বুড়োকর্তা বললেন, 'কী দেখতে পাস?'

'অশ্বত্থতলায় রোজ রাতে কেউ না কেউ আসে। তাড়া করি। পালিয়ে যায়।'

'কারা আসে?'

'চিনতে পারি না।'

'কেন আসে বল্‌দিকি?'

'অশ্বত্থতলার মাটি খুঁড়তেই হয়তো আসে।'

'কেন?'

জনাই গুম হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। বুড়োবাবু আবার বললেন, 'কী? বল্ কথাটা!'

জনাই আস্তে বলল, 'সেই সোনার পিদিমটা খুঁজতে আসে।'

বুড়োবাবু চমক গোপন করে নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই কেমন করে জানলি পিদিমের কথা? কে বলল তোকে? সাধুবাবা?'

জনাই মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আবার কে বলবে?'

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁসফাঁস করে মন্মথনাথ বললেন, 'এ্যাদ্দিন বলিস নি তো! তুই কী—কী নেমকহারাম জনাই! বাড়ির পুরনো লোক তুই। তোকে আপন ছাড়া পর ভাবিনি।'

জনাই মুখ নামিয়ে রইল।

বুড়োকর্তা গলার ভেতর বললেন, 'অশ্বত্থতলায় কোথাও পিদিম ছিল না। সাধুবাবা মরার পর তন্নতন্ন খুঁড়ে দেখা হয়েছিল। সাধুবাবা খামোকা মিথ্যে বলে হয়রান করেছিল, জনাই!'

জনাই একটু হাসল। 'না বুড়োবাবু। তিনি মিথ্যে বলার লোক ছিলেন না। আপনিও সেটা ভাল করে জানেন। মায়ের মন্দিরের ভেতর পিতিমার তলায় পিদিমটা ছিল। তা আজ্ঞে, পেকাণ্ড পিদিম! তিরিশ ভরির কম নয় কো।'

'কে বলল? সাধুবাবা?'

'আবার কে! পিতিমাকে চান করাবার ইচ্ছে হয়েছিল ওনার। তুলতে গিয়ে ছাখেন, তলায় ফোকর আর তার মধ্যিখানে পিদিম লুকোনো আছে।'

'তুই দেখেছিস সে-পিদিম?'

'হ্যা।'

'দেখেছিস ?'

জনাই আবার বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে কোথায় গেল সে-পিদিম ?'

জনাই হাসল। 'তা বলব না আজ্ঞে।'

'জনাই, তুই আমাদের বাড়ির লোক। নেমকহারামী করছিস কিন্তু !'

'সাধুবাবা তো আপনাকে বলেছিল, অশ্বত্থতলায় লুকোনো আছে।' জনাই উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গীতে হাসতে লাগল। 'আপনি রেতের বেলা স্বমুবাবুকে নিয়ে নিজেই খুঁড়তে এসেছিলেন। সাধুবাবা টের পেয়ে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করল আপনাকে।'

বুড়োবাবু চাপা গলায় গর্জন করলেন, 'তখন তুই কোথায় ছিলি ?'

'কাছাকাছি লুকিয়ে মজা দেখছিলাম। আমাকে তো বিশ্বাস করে বলেন নি কোনো কথা।'

'বুঝতে পারছি। তুই-ই সাধুবাবার কানে তুলে দিতে গিয়েছিলি। তুই এমন গোয়েন্দা তা জানতাম না জনাই !'

'বুড়োবাবু ! সাধুবাবার কাছে দীক্ষে নিয়েছিলাম। তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারি। বলুন ?'

'বোঝা যাচ্ছে, পিদিম কোথায় আছে তুই নিশ্চয় জানিস।'

'হুঁউ, জানি।'

'কোথায় আছে ?'

'আছে একখানে। দেবতার পিদিম। কেন লোভ করছেন বুড়োবাবু ? আপনার তো অভাব নেই সংসারে। বয়সও হয়েছে।'

বুড়োবাবু শেষ চেষ্টা করে বললেন, 'পিদিম দেবতার, তা কি জানি না জনাই ? আমার ইচ্ছে মায়ের পিদিম মায়ের মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করি। সেজন্যই তো বলছি তোকে। পিদিম কোথায় সরিয়ে রেখেছিস ?'

জনাই গোঁ ধরে বলল, 'সামনে অমাবস্যার দিন আমিই পিতিষ্ঠা করব। পাঁচগাঁয়ের লোক ডাকব। ধুমধাম করে পুজো হবে। আপনি দয়া করে আর ঝামেলা করবেন না বুড়োবাবু !'

বুড়োবাবু হাঁকলেন, 'কৈ রে পুঁচকি ! কোথা গেলি।'

পুঁচকি মনের আনন্দে জঙ্গলে ঘুরছিল। সাড়া দিয়ে বলল, 'যাচ্ছি !'

কাহাররা পাল্কি নিয়ে একটু তফাতে অপেক্ষা করছিল।.........

সন্ধ্যায় ভর ওঠে জনাই সাধুর। ওই সময় আজকাল খুব ভিড় হয়। ঢাক-ঢোলও বাজে। পয়সা পড়ে। লোকে রোগ সারাতে আসে। জনাইয়ের মুখ দিয়ে সাধুবাবার আত্মা আশ্বাস দেন। লালদীঘির পাড়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এই ভিড়। রাত হয়ে যায় ভিড় ভাঙতে।

একদিন সন্ধ্যায় ভরের সময় জনাইরূপী সাধুবাবা এক আশ্চর্য কথা জানালেন। মায়ের পুজোর এক পিদিম ছিল—সোনার পিদিম। সেই পিদিম এখনও মাটির তলায় লুকোনো আছে। আগামী অমাবস্যার দিন তার উদ্ধার হবে।

পাশের গ্রামের চৌধুরিবাবুদের এক আত্মীয় রোগ সারাতে এসেছিলেন। তিনি খবর দিতে ছুটলেন। বোঝা গেল, মায়ের প্রতিমা আবার তাহলে এখানে ফিরিয়ে আনা হবে। সোনার পিদিমে মায়ের আরতি হবে। কালীপাটে আবার আগের দিনগুলি ফিরে আসবে।

অনেক রাতে জনাই তার চালা ঘরে শুয়ে আছে। শ্মশানের দিকে শিয়াল আজকাল আর ডাকে না। কিন্তু পেঁচার ডাক শোনা যায়। জনাই হঠাৎ চমকে উঠল।

তার বুকের ওপর কেউ চেপে বসে তার গলা টিপে ধরল জনাই গোঁ গোঁ করতে থাকল।

আততায়ী হিসহিস করে বলল, 'পিদিম কোথায় আছে?'

জনাইয়ের দম আটকে যাচ্ছিল। কোনো জবাব দিল না।

আততায়ী আবার গর্জে বলল, 'বল্। নৈলে মরবি।'

সাধুবাবার খাবারে বিষ দেওয়া হয়েছিল। সাধুবাবা মারা যায়। মানুষ কী! খানিকটা সোনার জন্য মানুষ এমন হতে পারে! জনাই সেই গভীর দুঃখ বুকে চেপে ঘুরেছে ক'মাস ধরে। এখন গলা টিপে মারা হচ্ছে তাকে। জনাই গোঁ গোঁ করে বলল, 'বলছি, বলছি।'

আততায়ী হাত আলগা করে বলল, 'বল্।'

জনাই চিনতে পারল। 'ঝুমুবাবু নাকি?'

'চোপ্, শালা! বল!'

'পিদিম আমার পিঠের তলায় পোঁতা আছে।'

জনাই টের পেল, আবার সুমথনাথের হিংস্র মুঠি তার গলায় আঁটো হচ্ছে। সে বিস্ময় প্রকাশের চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না……।

বুড়োকর্তা জেগেই ছিলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বললেন, 'কে?'

'আমি সুমথ।'

'কী হল?'

'শালা মিথ্যুক। জিনিসটা পাওয়া গেল না।'

বুড়োকর্তা ভাঙা গলায় বললেন, 'জনাই?'

'সামলে দিয়েছি।'

বুড়োকর্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। 'বাড়ির পুরনো লোক ছিল জনাই! আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে রে সুমু!'

সুমথ ধমক দিল। 'থামুন! রাতদুপুরে আদিখ্যেতা করবেন না তো।'

বুড়োবাবুর কান্না থামল না। সাধুবাবারা বরাবর একজায়গায় থাকেন না। কাজেই জনাই সাধুও চলে গেছে রাতারাতি। হয়তো হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করতেই গেছে। সামনে অমাবস্যায় ফিরে এসে মায়ের সোনার পিদিম উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করবে।

তবে সাধুদের ব্যাপার তো! ফিরে আসার কোনো গ্যারান্টি নেই। কালীপাটের চালাঘর খালি পড়ে থাকবে। তারপর গরিব-গুরবো মেয়েরা আবার একটুকরো করে চালছপ্পর ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শাকসেদ্ধ করে খাবে। সোনার পিদিম লালদীঘির জলের তলায় পাঁকের ভেতর অপেক্ষা করবে। কতকাল পরে তাকে কেউ উদ্ধার করতেও পারে।…

উলটপুরাণ

বনানী ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে বলল, 'এই ছোড়দা। জানিস কী হয়েছে?'

'কী রে?' বলে আনমনে তাকালাম ওর দিকে। বনানী হাঁফাচ্ছে। মনে হল খুব দৌড়েই এসেছে কোত্থেকে। খুন খারাপি হতেও পারে। এবং যদি তাও হয়, সে নিশ্চয় একশো কিমি দূরে। কারণ হলফ করে বলতে পারি,

বনানীর নার্ভ তত কড়া নয়। চোর বা পকেটমার ধরা পড়তে দেখলে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, 'তাহলে কী হবে রে?'

বনানী চাপা গলায় বলল, 'বেদানার বর গোমুখ্যু! একেবারে গোমুখ্যু। নিজের নাম সই করতেও পারে না!'

'কে বল্ তো?'

আমার প্রশ্ন শুনে বনানী তেতোমুখে বলল, 'ফের ন্যাকামি করছিস? বেদানাকে চিনিস নে? হরিদার মেয়ে!'

একটু হেসে বললাম, 'তাই বল। তো ওর বর মানে সেই নাদুস নুদুস চেহারার ভদ্রলোক তো? সেই যে সেদিন……'

বাধা দিয়ে বনানী বলল, 'ব্যাপারটা কীভাবে ধরা পড়ল জানিস? ওদের বাড়ি গিছলাম একটু আগে। আমি আর শর্বরী। শর্বরীর হাতে একটা বই ছিল। বেদানার সঙ্গে কথা বলছি আমরা, হঠাৎ ওর বর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এল। তারপর জানিস?' বনানী খিলখিল করে হেসে উঠল।

'যা বাবা! হেসেই মারা পড়বি যে!'

বনানী হাসির মধ্যে বলল, 'তারপর দেখি কী বই ওটা বলে শর্বরীর বইটা নিয়ে পাতা ওল্টাল। হঠাৎ দেখি বইটা উল্টো করে ধরে আছে। গম্ভীর হয়ে পড়ার ভান করে বলল কী জানিস? খুব ভাল বই তো। দেবেন একবার পড়তে?'

'যাঃ! বানিয়ে বলছিস!'

'তোর দিব্যি। শর্বরীকে জিগ্যেস করিস।'

'তারপর?'

'আমরা তো হতভম্ভ। আড়চোখে দেখি, বেদানার মুখটা একেবারে লাল। আসছি বলে কেটে পড়ল কোথায়।'

'হুঁ!'

'তারপর?'

শর্বরী গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। পরে দেব'খন। বলে বইটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বেরুল। আসলে হাসিতে ওর গা ঘুলোচ্ছিল। বাইরে গিয়ে দুজনে হাসতে হাসতে মারা পড়ি আর কী!'

'মারা পড়িস নি দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবার বেরো। ডিসটার্ব করিস নে।'

বনানী রাগ করে বেরিয়ে গেল। যতটা শক খাব আশা করেছিল, খাইনি দেখে। আসলে ওদের এই আবিষ্কারের অনেক আগেই ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করে বসে আছি। বলিনি এই যা। হরিপদ মুখয্যের জামাই নিছক জামাই নয়, ঘরজামাই। কারণ মেয়ে মোটে একটাই এবং সারাজীবন মহকুমা আদালতে পেশকারী চাকরি করে পয়সাকড়ি ভালই কামিয়েছেন। শহরের এদিকটায় সম্প্রতি ঘরবাড়ি হয়েছে অনেকগুলো। কতকটা কলোনী টাইপ। ছড়ানো-ছিটোনো একটা করে একতলা বাড়ি। চারপাশে অঢেল জায়গা। হরিদাই সবার আগে এখানে বাড়ি করেছিলেন। তারপর বাড়ির শোভা বাড়ানোর মতো চমৎকার সুদর্শন একটি ঘরজামাইও ইদানীং যোগাড় করে ফেলেছেন। যেখানে যান, খালি জামাইয়ের গল্প। হরিদার ভাষায় 'তিনটে পেপারে এম.এ।'

লোকের চোখ দেখেই নাকি বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষিত-অশিক্ষত ধরা পড়ে, কোথায় পড়েছিলাম বলতে পারব না। কিন্তু আমার ধারণা এ এক ব্রহ্মজ্ঞান। কিছুদিন আগে হরিদার জামাই আমার এই ব্রহ্মজ্ঞানের পাল্লায় পড়েছিলেন, নেহাত হরিদার মুখ চেয়ে এবং চক্ষুলজ্জায় পড়ে বলিনি কাকেও।

আসছিলাম ট্রেনে। কামরায় তত কিছু ভিড় ছিল না। পথে একটা জংশন পড়ল। আমার উল্টোদিকে নাদুস নাদুস ফর্সা গ্রাম্য চেহারার এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি যে-কোনও সংখ্যা হতে পারে। এমন মাকুন্দে এবং বেবিফেস দেখে বয়সের ভুল হয়েই থাকে। তো হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হকারের কাছে একটা ইংরেজি কাগজ কিনলেন।

ইংরেজি কাগজ কেনাটা কিছু নয়। কিন্তু কাগজটা উল্টো করে ধরে পড়ার ভান করাটাই গণ্ডগোল বাধাল। আমি তো অবাক। আশে পাশে আরও কজনও দেখি মুখ এবং চোখ টিপে আড়ালে হাসাহাসি করছেন। একজন তো বলেই ফেললেন, 'কী দাদা ? আজকের বড় খবর কী দেখছেন ?'

ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেছে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। হুঁ ভদ্রলোকের চোখ দুটোই বলে দিচ্ছে বিদ্যেবুদ্ধির খবর। গাঁয়ের চাষাভুষোর চোখ একেবারে। চাউনিতে ভোঁতা ভাব। কেমন ধোঁয়াটে আর নির্বাক। মানুষের চোখও তো কথা বলে। স্বীকার করতেই হবে, এমন অবোধ অপোগণ্ড চোখ আমি চাক্ষুষ করিনি কদাচ।

ভাগ্যিস কামরায় তত ডেঁপো কেউ ছিল না। তেমন ছেলেছোকরাও না। থাকলে লোকটার প্রচুর খোয়ার হত। তবে যিনি খবর জিগ্যেস করছিলেন তিনিই কিছুটা খোঁচাতে ছাড়লেন না। আসলে আমরা ততক্ষণে মনে মনে ধরেই নিয়েছি এ ব্যাটা এক ঘুঘু। ঠকের রাজা। তাই ঠিক-ঠিকানা শেষে গন্তব্য এবং নামধাম নিয়ে পড়লেন প্রশ্নকারী। লোকটা আশ্চর্য বেহায়া বলতে হয়। হাসি মুখেই জানিয়ে দিল সে বনবিহারী চক্কোত্তি। যাচ্ছে বহরমপুর। না সেখানে বাড়ি নয়। শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরের নাম হরিপদ মুখুয্যে।

তখন আমি হইচই করে বলেছিলাম, 'কী মুশকিল! আপনি হরিদার জামাই? তাই বলুন। গিছলেন কোথা? কলকাতা? একা কেন?'

হরিপদ মুখুয্যে এপাড়ায় সবার দাদা। বাবাকেও শুনেছি হরিদা বলতে। রোগা ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। তাঁর মেয়ে আমার বোন বনানীর সঙ্গে কলেজে পড়ত। ওকে দেখেছি। পাড়ার মেয়ে বলে নিশ্চয় অসংখ্যবার দেখেছি, কথাও বলে থাকব—কিন্তু কেন কে জানে, এই দেখা বা জানাশোনাটা তেমন স্পষ্ট নয়। বনানীর অনেক বন্ধুই তো আছে। তাদের প্রত্যেককে আমার যেমন চেনা নেই, জানা নেই—এও তেমনি। নিশ্চয় বেদানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু হরিদা যে বলে বেড়িয়েছেন তার জামাই তিনটে সাবজেক্টে এম এ? নিশ্চয় একটা গুরুতর ঠকবাজী হয়েছে। শুধু অবাক লাগে হরিদার মতো ঘোড়েল মানুষ কার পাল্লার পড়ে এই গণ্ডগোলটি করে ফেললেন? উল্টো করে ইংরেজি কাগজপড়া লোককে দেখলে যেন নিজের মধ্যে কী এক অহঙ্কার হুহু করে আঁচ দিতে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই দু মাসেও হরিদা ব্যাপারটা টের পেলেন না? নিশ্চয় পেয়েছেন এবং মনে মনে পস্তে শেষটা চেপে গেছেন। ভাগ্যের মার বলে মেনে নিয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু কষ্ট হয় বেদানা বেচারীর কথা ভাবলে। পরে বনানীকে জিগ্যেস করেছিলাম, বেদানার প্রতিক্রিয়াটা কী? বনানী জিভ কেটে বলেছিল, 'ভ্যাট! কী যে বলিস? ওকে এসব জিগ্যেস করা যায় নাকি? বোঝাই তো যায় রে বাবা, বেচারী চুপ-চাপ মেনে নিয়েছে।'

বলেছিলাম, 'দেখবি একদিন বোমা ফাটবে। এ যুগটা যে অন্য রকম। মেয়েরা আজকাল কত কনসাস।'

বনানী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'তুই মেয়েদের বুঝিস? মেলা বকিসনে তো।'

'ছাখ বনি, আগের যুগে মেয়েরা যে কোনও একটা পুরুষমানুষ পেলেই…'

'শাট আপ! আমি তোর ছাত্রী নই।' বলে বনানী কেটে পড়েছিল।

কিন্তু আমার মাথায় খালি বেদানার চিন্তা। শুধু গোমুখ্য হলেও কথা ছিল, লোকটা যে ঠক। উল্টোদিকে ইংরেজি কাগজ পড়ে! সুতরাং বোঝাই যায়, নিতান্ত নির্বোধ ঠক।…

আমাদের পাড়ার নিচেই গঙ্গা। এখন বারো মাস জলে ভরা। ফরাক্কা থেকে জল আসছে। বিকেলবেলা একবার গঙ্গার ধারে ঘুরে আসা ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস। সেদিন একটু দূর থেকে দেখি, হরিদার জামাই বনবিহারী লাটু-বাবুদের বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ওভাবে কারও বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকাটা সন্দেহজনক। লক্ষ্য রাখলাম। একটু পরে দেখি সে নীচু পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। তারপরই কী একটা ঘটল। সে সাঁৎ করে পিছিয়ে এসে হন হন করে চলতে শুরু করল। কুকুরের চেঁচামেচি শোনা গেল এতক্ষণে। হুঁ, কুকুরের ভয়েই পিঠটান দিয়েছে বনবিহারী।

কিন্তু এ যে দেখছি, শুধু ঠক নয়। চোরও বটে। চুরির মতলব না থাকলে এই সন্ধ্যাবেলা অমন করে কেউ পাঁচিল ডিঙোতে যায়? খুব খারাপই লাগল ব্যাপারটা।

কদিন পরে সত্যি একটা কেলেঙ্কারি ঘটে গেল। রাত তখন প্রায় দশটা-সওয়া দশটা হবে। আমাদের বাড়ির সামনে এক টুকরো সব্জি ক্ষেত আর ফুল বাগিচা আছে। সবুজ লনে পায়চারি করছি। সবে চাঁদটাও উঠেছে। হাল্কা জ্যোৎস্নায় নিঃঝুম পাড়াটা পাড়াগাঁয়ের মতোই দেখাচ্ছে। এখনও রাস্তায় আলো আসেনি। জ্যোৎস্নায় কারা দুজন রাস্তায় জাপটাজাপটি করছে। চোখে পড়তেই শিউরে উঠলাম। খুনোখুনি হচ্ছে নাকি? গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি। ঘন ছায়া পড়েছে। জীবনে কখনও স্বচক্ষে খুনো-খুনি দেখিনি এবং এখন সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটছে ধরে নিয়েই কাঁপা কাঁপা শরীরে ওত পাতলাম।

তারপর অবাক হয়ে দেখি লড়াইটা বেধেছে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে। স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে জাপটে ধরে আছে। আর পুরুষটি

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কিমিদং? এতকাল এ পাড়ায় এসেছি, এমন নাটক তো দেখিনি। চাপা গলায় দুজনই হাঁসফাঁস করে সংলাপ আওড়াচ্ছে।

'আঃ! কী হচ্ছে। ছাড়ো না। এক্ষুনি আসছি বলছি! আঃ দেখ দেখ…'

'না। তুমি চলে যাচ্ছ। কেন? কী করেছি আমি?'

'কী মুশকিল। এক্ষুণি কে-দেখে ফেলবে যে! আহা, ছি ছি…'

'দেখুক। কেন তুমি এমন করে চলে যাবে? কেন? কেন?'

'মাইবি তোমার দিব্যি। চলে যাইনি, চলে যাইনি! একটু ঘুরে-টুরে আসি…'

'বেশ। তাহলে আমিও যাব।'

'পাগল? না—না। ছাড়ো! এক্ষুনি আসছি। মাইরি, তোমার দিব্যি। বিশ্বাস করো!'

তারপরই দেখলুম পুরুষটি ছিটকে বেরিয়ে গুলতির মতো বাঁই করে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উল্টো দিকে চলে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? রাস্তায় গিয়ে দেখলাম স্ত্রীলোকটি হন হন করে এগিয়ে যে বাড়ির গেট খুলে ঢুকল, সেটি হরিপদ মুখুয্যের 'মাধুরী ভিলা'। আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না! বেদানা ও বনবিহারী!

উল্টো করে ইংরেজি কাগজ পড়া নির্বোধ বদমাসটার মধ্যে হরিদার গ্রাজুয়েট মেয়ে কী এমন বস্তু পেল রে বাবা, যে রাতদুপুরে এমন করে রাস্তায় জাপটা-জাপটি করে গেল! এই উইমেনস লিবের যুগেও।

মিনিট পাঁচেক কেটেছে বড় জোর, হঠাৎ কোথায় একটা চেঁচামেচি হইহল্লা শোনা গেল। চমকে উঠলাম। তারপরই দেখলাম কে ঘোড়ার মতো দৌড়ে এসে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল, 'এই! এই। প্লীজ ওদের বলবেন না ভাই! আমি এখানে লুকোচ্ছি।'

বলেই সে আমার জবাবের পরোয়া না করে গেটের ভেতর ঢুকে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। লোকেরা হইহই করে দৌড়ে আসছে। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাবার পর মনে পড়ল, লোকটা হরিদার জামাই বন-বিহারী। রাগ হল যত, তত করুণাও। গোমুখ্যু নির্বোধ আর কাকে বলে? এখন ধরিয়ে দিলে তো মেরে তক্তা বানাবে। খালি বেদানা আর হরিদার কথা ভেবে সামলে নিলাম। ডাকলাম, 'ও মশাই! ঝোপে পোকামাকড় থাকতে পারে। বেরিয়ে আসুন!'

বনবিহারী ফিসফিস করে বলল, 'লাইন ক্লিয়ার ?'

'হ্যাঁ। বেরিয়ে পড়ুন।'

'আপনার ঘরে কিছুক্ষণ থাকব। কেমন ?'

'আচ্ছা।'

আমার ঘরে ঢুকে বনবিহারী আগে নিজের পাজামা-পাঞ্জাবি খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর চমকানো গলায় বলল, 'দরজা বন্ধ করুন! দরজা বন্ধ করুন!'

দরজা বন্ধ করে হাসি ও ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কী ? লাটু-বাবুদের বাড়ি ঢুকেছিলেন বুঝি ?'

বনবিহারী আরামে বসে পকেটে হাত ভরল। মুখের নির্বোধ হাসি। সেই ঘোলাটে অবোধ চাউনি চোখে। পকেট থেকে প্রকাণ্ড দুটো পাকা পেয়ারা বের করে বলল, 'খাবেন নাকি ?' তারপর নিজে একটায় কামড় বসাল।

বললাম, 'পেয়ারা কোথায় পেলেন ?'

বনবিহারী চতুর হেসে চোখ নাচিয়ে বলল, 'ওই যে ওদের বাগানে। আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতুম!'

'আপনি পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিলেন ? অ্যাঁ।'

বনবিহারী খিকখিক করে হাসতে লাগল। তাহলে লোকটা শুধু ঠক নয়, নির্বোধ তো বটেই, এবং সাক্ষাৎ পাগল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফর্সা সুন্দর চেহারা, নাদুসনুদুস গড়ন, দেখতে রীতিমতো জেণ্টলম্যান—অথচ…

হঠাৎ বনবিহারী আমার বইয়ের র‍্যাক থেকে বাঁ হাতে একটা বই টেনে নিল। তারপর তাচ্ছিল্য করে পাতা উল্টে পড়ার ভান করল। সেই উল্টো করে ধরা বই! আর চুপ করে থাকা গেল না। হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনার বুঝি উল্টো করে পড়া অভ্যেস ? সেদিনও ট্রেনে দেখছিলাম উল্টো করে ইংরেজি কাগজ পড়ছেন।'

বনবিহারী নির্বিকার মুখে মাথা নেড়ে বলল 'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু এতে কী লাভ ?'

'একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছি অনেক দিন থেকে। আমার ধারণা উল্টো করে পড়লে প্রত্যেকটি হরফের এযাবৎ অজানা চরিত্র বেরিয়ে আসে।' বনবিহারী আমাকে আরও অবাক করে বলতে থাকল। 'জানেন তো ? সঙ্গীতে যেমন অশ্রুত ধ্বনি থাকে, এও তাই। বলে সে মার্লো পন্টি নামে মনোবিজ্ঞানীর বিখ্যাত বইটা থেকে উল্টোভাবে গড়গড় করে পড়ে চলল। আমি তখন আকাশ

থেকে পড়ে হাড়গোড়ভাঙা দ হয়ে গেছি। হুঁ, হরিপদ মুখুয্যে জামাইয়ের চোখ দেখে ঠকেছি। যাক্ গে। বললাম, 'কিন্তু পেয়ারা চুরিও কি কোনও এক্সপেরিমেণ্ট ?'

বনবিহারী লাজুক হেসে বলল, 'হুঁউ। ব্যাপারটা হল, রোজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই, আর পেয়ারাগুলো দেখে ভাবি, পেয়ারা তো বাজারে কেনা যায়। কিন্তু সে হল সিধে দিক। বরং উল্টো করে বই পড়ার মতো উল্টো দিকে—অর্থাৎ ...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'বুঝেছি। এবং কেন ঘরজামাই হয়েছেন, তাও বুঝে গেছি। পেয়ারাটাও উল্টো দিকে খাচ্ছেন।'

বনবিহারী বোঁটার দিকে পেয়ারাকে কামড়ে উল্টো করে ধরা বইটা গম্ভীর-ভাবে পড়তে পড়তে আনমনে বলল, 'এটাই বেদানাকে মশাই বোঝানো যায় না।'

বুঢ়াপীরের দরগাতলায়

বুঢ়াপীরের নির্জন দরগাতলায় একটা কাঠবেড়ালি শুকনো পাতা উল্টে সরু দাঁতে কুরকুর করে কী যেন চিবিয়ে খায়। গাছপালার মাথায় একটা ঘুঘু চুপিসাড়ে ডাকতে থাকে ঘুঘুনীকে। শুকনো ঘাসের মাথায় বসে এক ঘাসফড়িং কিড়কিড় করে গান গায়। একটা আনমনা ছোট্ট ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এইসব দেখে কিছু ভাবে। ভেবে কুল পায় না।

হঠাৎ পাশের পিচরাস্তায় চলে যায় মোটরগাড়ি। ছেলেটা তার পেছনে দৌড়ে যায় কিছু দূর। তারপর ফিরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, বাবা, ও বাবা! ই গন্দ কিসের—এত মিষ্টি গন্দ বাবা ?

ভাঙা দেউড়ির পাশ থেকে তার বাবা বলে, গন্দ ? পেঠ্রলের—আবার কিসের ?

পেঠ্রল কী বাবা ?

উ হল ইঞ্জিনের ত্যাল।

ইঞ্জিন কী বাবা ? বুলো না, ইঞ্জিন কী ? তখনও ছেলেটা নাক উঁচু করে পোড়া তেলের গন্ধ শোঁকে।

এইরকম একশো কথা সারাক্ষণ। ছেলেটা আবার হঠাৎ ছুটে যায় গাছ-গাছালির ভেতরে। সুর ধরে এতোলবেতোল কী সব আওড়ায়। নিচু ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়ে ঝালঝুল্লো খেলতে খেলতে চেঁচায়, হো হো ধত্তে পাল্লে না! হো হো ধত্তে পালে না!

তার বাবা হাঁক দেয়, কার সঙ্গে খেলছিস বাছা? জুড়িটা কে তুর শুনি? সে একটু হেসে ফের বলে, মনিষ্যি না বাউর?

বাউর মানে কুবাতাস। বুঢ়াপীরের দরগাতলায় এইসব কুবাতাস এসে ঘুরঘুর করে। মৃত বুঢ়াপীর টের পেলে তাড়া করেন। গাছগাছালি জুড়ে তখন প্রচণ্ড তোলপাড়। ছেলেটা এইসব গল্প শুনেও ভয় পায় না। আপনমনে খেলে বেড়ায়। কখনও ছুটে এসে বাপকে সাধে, সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! তিন-দিনকার গাজোলে…

তার বাবা অন্ধ বেন্দাবন হাত পেতে বসে আছে দরগাতলায় দিনমান। পীরবাবার আর মাহাত্ম্য নেই। কদাচিৎ ভক্তজন এসে সিন্নিটা দেয়। লোবান-কাঠিটা জ্বালে। বেন্দাবন ধরা গলায় বলে, বুঢ়াপীরের দয়া লাগে অন্ধকে একটা-দুটো পয়সা। ভিক্ষে চাইতে এখনও বড় লজ্জা। বেরৎ খাটিয়ে মানুষ ছিল সে। কী করে চোখ দুটো গেল। চুপি চুপি হাত পাততে আসে গাঁয়ের বাইরে এই দরগাতলায়।

বুলো না বাবা—তিনদিনকার গাজোলে…ছেলেটা বাপের পিঠ ঠেস দিয়ে সরু আঙুলে খামচায়।

বেন্দাবন আওড়ায়, 'তিনদিনকার গাজোলে
মহিষ মরে হেজোলে
টিকটিকিটা বাতায়
উকুন মরে মাথায়…'

পিটিরপিটির চেয়ে ছেঁড়াপেন্টুলপরা ছেলে বলে, মরে ক্যানে বাবা?

বেন্দাবন বুঝিয়ে দেয়। গাজোল হল টানা বিষ্টি। টোপাচ্ছে আর টোপাচ্ছে। গেরস্থর ধান শুকোয় না। গরু-বাছুর চরতে পায় না। পাখপাখালি নিরাচ্চয়। শ্বাস ছেড়ে বেন্দাবন বলে, বেষম খিদে। খিদেয় শুকিয়ে মরে যায় সবাই।

সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! উকুন বিনে…

বেন্দাবন একটু হেসে বলে 'উকুন বিনেবক ঝিয়াকুল গাছন্যাড়া টিয়া কানা।' ইটা ধন্দ।

ধন্দ কী বাবা ?

বেন্দাবন নড়ি তুলে কপট তাড়া করে। ছেলেটা দুধের দাঁতে হাসতে হাসতে পালিয়ে যায়। কতক্ষণ পরে বাবার সঙ্গে ফক্কুড়ি করতে আসে। পিঠের দিকে পায়ের শব্দ তোলে। মুখে মিটিরমিটির হাসি। অন্ধ বেন্দাবন হাত বাড়িয়ে বলে, বুড়োপীরের দয়া লাগে …

অমনি ছেলেটা খিটখিট করে হেসে ওঠে। বাবার চোখের সামনে আঙুল নেড়ে বলে, বলোদিকিনি কটা ?

এবার বেন্দাবন সত্যি রেগে যায়। নড়ি তুলে চেঁচায়, চোপ শালার ছেলে ! অন্ধর সঙ্গে ফক্কুড়ি ?

ছেলেটা বুঝতে পারে এটা ঠিক হয় নি। দৌড়ে চলে যায় গাছপালার ভেতর। কতক্ষণ আর তার সাড়াশব্দ নেই। অভিমানে বেন্দাবন চুপ করে বসে থাকে। সে তো জম্মোকাল থেকে কানা নয়। গত বছরও মাঠে মুনিশ খেটেছে। ফসল পাহারার কাজও করেছে। রাতবিরেতে এই বিশাল মাঠের একদিক থেকে অন্যদিকে ভেসে বেড়িয়েছে তার 'জাগালি' হাঁক—হেই হো-ও-ও ! সেই শক্ত মানুষ—এখন বুড়োপীরের দরগাতলায় হাত পেতে বসে থাকতে বড লজ্জা করে।

ছেলেটার সাড়া না পেয়ে তার বুক ধড়াস করে ওঠে। রাগ করে গাঁয়ে চলে গেল নাকি ? তাহলে দিনশেষে কে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বাড়িতে ? ওর মায়ের যা মেজাজ, যত মেজাজ, তত নিদয়া। বলবে, মিনসে মরুক। শেষ-মেশ বড় ছেলেটা যদি গেরস্থবাড়ি থেকে ফেরে, অন্ধ বাবাকে দরগাতলা থেকে নিয়ে যেতে রাত হয়ে যাবে। আর সারাপথ একশো খিস্তি।

হাতের নড়ি এই ছেলেটা মেজ। বাকি ছেলেটা ও মেয়েটার হাঁটি-হাঁটি অবস্থা। তাদের সঙ্গে নিয়ে সুখেশ্বরী সারাদিন বিলে-খালে ঘোরে।

বেন্দাবন উদ্বেগে আনচান করে। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করে ছেলেটার গতিবিধি। নিঝুম নিরিবিলি দরগাতলায় পাখপাখালি আর ঝিঁঝিপোকা ডাকে। চৈত্রের দমকা হাওয়া শব্দ করে। তারপর শুনতে পায়, কাঠবেড়ালির সঙ্গে কথা বলছে তার হাতের নড়ি ছেলেটা। বেন্দাবন একটু হাসে। গলা চড়িয়ে ডাক দেয়, নেম্মল রে ! বাপ নেম্মলা !

দুপুর গড়িয়ে গেলে সে পা টিপেটিপে বাবার কাছে ফেরে। তার গায়ের গন্ধ টের পায় বেন্দাবন। মিষ্টি হেসে ডাকে, আয় !

ছেলেটা আস্তে বলে, খিদে।

বেন্দাবন হাত তুলে বিলের দিকটা আন্দাজ করে বলে, ত্যাখধিনি বাছা, তুর মাজননাকে দেখা যায় নাকি? তার মানে, সুখেশ্বরী খালবিল ঢুঁড়ে যে খাদ্য আনবে, তার প্রত্যাশা। এই বুঢাপীরেব দরগার আর সে মাহাত্ম্য নেই। কদাচিৎ দূরের কোনো ভক্ত দৈবাৎ এসে পড়ে। কিছু পয়সা পেলে বেন্দাবন ছেলেকে গাঁয়ে পাঠায়। বামুনবুড়ি চিড়েমুড়িটা বেচে। কিনে এনে দুজনে খায়। পাশের পুকুরে জলটাও ভাল।

ছেলেব জবাব না পেয়ে বেন্দাবন তাকে ভোলাতে গুনগুন করে ছড়া বলে,

'হেঞ্চাকলমি লকলক করে
রাজার ছেলে পংখি মারে
মারুক পংখি শুকাক বিল
সোনার কৌটো রুপোর খিল··

ছেলেটা খিদে ভুলে যায়। পাখির গলায় বলে, সেই ছড়াটা বুলো না বাবা। 'ধুল্লোউডিব মাঠে বে ভাই ওদ ঝংঝং করে/পানের সখাব সঙ্গে দেখা বেলা দুপ্প হবে।'

বেন্দাবন সুর ধরে ধুলোউড়ির মাঠের পাঁচালি গাইতে থাকে। ভুলিয়ে-ভালিগে চলে যেতে থাকে একটা-করে দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন। বুঢাপীরের জনহীন দরগাতলায় দুটি মানুষ খেলা করে এবং খেলা করে।···

এক মেঘলা দিনের দুপুরে এল টাপরদেওয়া গরুর গাড়ি। গাড়ির সামনে গাড়োয়ান আর তার পিছনে টুপিপরা এক হাজিসায়েব। টাপরের ভেতর তাঁর বিবিজান। আওয়াজ পেয়ে অন্ধ বেন্দাবন বলি বলে, পীরবাবার দয়া লাগে, অন্ধকে একটা দুটো পয়সা। গাড়োয়ান গাড়ির জোয়াল থেকে বলদ দুটো খুলে চাকাব সঙ্গে বাঁধে। হাজিসাহেব দরগাতলার দিকে এগিয়ে যান। বিবিজান টাপরের পর্দা সরিয়ে বেন্দাবনকে দেখেই একটু শরমে পড়েছেন। গাড়োয়ান বলদ দুটোকে জাবনা দিতে দিতে বলে, অন্ধ মানুষ মাজান। আব কেউ কোথা নেই। আপুনি দরগায় যান। নিশ্চিন্তে চলে যান।

খাঁচার পাখির মতো বাইরের দুনিয়ায় নড়বড়ে পায়ে হেঁটে বিবিজান অন্ধ বেন্দাবনের অনেকটা তফাত দিয়ে পীরবাবার কবরে পৌছান। তাঁর হাতে

একগোছা লোবানকাঠি। একঠোঙা বাতাসা মুড়কি আর পাটালি। সাতটা ক্ষুদে মাটির ঘোড়া।

তখন হাজিসায়েব দরগার পেছনে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে এনামেলের বদনা। দুপুরের 'জোহর' নমাজের সময় হয়েছে। কিন্তু ঘাটের নিচে ঘন থকথকে কাদা। ওজুর জন্য একবদনা জল পাওয়াই সমস্যা! গাড়োয়ানকে ডাকবেন বলে ঘুরেই দেখতে পান বেন্দাবনের ছেলেটাকে।

একটা কাঠবেড়ালি শুকনো পাতা সরিয়ে সরু দাঁতে কুরকুর করে কিছু খাচ্ছে। ছেলেটা কোমরে দুহাত রেখে নিষ্পলক চোখে তাই দেখছে। গাছের ফাঁক দিয়ে উপচে এসে পড়েছে মেঘে ঢাকা সূর্যের আশ্চর্য এক আলো তার শরীরে। এই নিরিবিলি দরগাতলায় শান্ত গম্ভীর এক বালককে দেখতে দেখতে হাজিসায়েব শ্বাস ছেড়ে বলেন, হে পরোয়ারদিগার!

আর এই কথায় ছেলেটার চমক ভাঙে। লম্বাচওড়া জামা ও টুপিপরা সাদা দাড়িওলা মানুষটির দিকে সে অবাক হয়ে তাকায়।

হাজিসায়েব একটু হেসে হাত তুলে ডাকেন, এই বাবা ছেলে! শোনোদিকিনি একটুকুন! ছেলেটা ইতস্তত করছে দেখে ফের বলেন, ডর কিসের বাবা? কাছে এস। এক বদনা পানি তুলে দাওদিকিনি—বড্ড পাঁক।

বেন্দাবনের ছেলে তবু তাকিয়ে থাকে। এমন মানুষ সে কখনও দেখেনি।

হাজিসায়েব তাঁর বিশাল জামার পকেট থেকে একটা চকচকে মুদ্রা বের করে বলেন, বখশিশ পাবি বাছা! দে দিকিনি একবদনা পানি এনে। নমাজের অক্ত চলে গেল বুঝি।

পয়সার লোভে ছেলেটা আড়ষ্ট পায়ে কাছে যায়। তারপর বদনাটা নিয়ে ঘাটে নামে। সে অনেকখানি কাদা ভেঙে জলে নামে। হাজিসায়েব পাড়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ করেন, আরও তফাতে মানিক! আর একটুকুন তফাতে যাও। হুঁ—এবারে বদনা ডোবাও। হুঁ—ব্যস, ব্যস! তিনি খিকখিক করে হাসেন। কমজোর বাচ্চা। ওইটুকু বদনা বইতেই জান নিকলে যাচ্ছে। বলেন, দেখিস বাপ! গিরে যায় না পানিটুকু! হুঁশিয়ার!

টলতে টলতে পাঁক পেরোয় বেন্দাবনের ছেলে। হাজিসায়েব তার হাত থেকে বদনাটা নিয়ে বলেন, শরীলে একরত্তি জোর নেই বাছা! হুঁ—দেখেই মালুম হচ্ছে বটে।

দশপয়সাটা পেয়েও ছেলেটা চলে যায় না। মানুষটার কথাবার্তা হাবভাব খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। হাজিসায়েব হাঁটু মুড়ে বসে ওজু করেন। তারপর টুপিটা খুলে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফের মাথায় পরেন। তারপর কয়েকপা এগিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর নমাজে দাঁড়ান।

যতক্ষণ না নমাজ শেষ হয়, ছেলেটা পিটিরপিটির তাকিয়ে থাকে। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখে, মানুষটা মুখের সামনে দুটো হাত তুলে বিড়বিড করে কী বলতে বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। এমন ঘটনা বেন্দাবনের ছেলে কখনও দেখেনি। এই দরগাতলার ভক্তদের মানতকরা সে দেখেছে। কিন্তু তাঁরা কেউ কেঁদেছিল বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া এই মানুষটা দরগার ঢিবিটার সামনে কান্নাকাটি করলেও কথা ছিল।

তার হাসি পায়। হাজিসায়েব নমাজ শেষ করে পা বাড়ালে সে মিটিরমিটির হেসে সাহস করে বলে, কাঁদছ ক্যানে গো লোকটা ?

হাজিসায়েব অমায়িক মানুষ। দুঃখের মধ্যেও একটু হেসে ফেলেন নাদান বাচ্চার প্রশ্ন শুনে। বলেন, কাঁদছি সোনা! দুনিয়ায় যার দুঃখুকষ্ট আছে, সেই কাঁদে। তা হ্যাঁ রে বাছা, তুই ইখেনে কী করছিস ?

বেন্দাবনের ছেলে বলে, কিছু লয়।

হাজিসায়েব হো হো করে হাসেন।...খুব পাকা ছেলে! বলে কিছু লয়' কুথা থাকিস তুই ?

হুই গাঁয়ে।

নাম কী তোর ?

নেম্মল।

ও। হাজিসায়েব একটু হকচকিয়ে যান। হিঁদুর ছেলের হাতের পানিতে ওজু করেছেন! খোদাতালার গোঁসা হবে না তো ? আনমনে বলেন, নেম্মল। তা হ্যাঁ বাপ নেম্মল, বাড়িতে আর কে আছে তোর ?

ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে তাঁর। দরগার দিকে হাঁটতে থাকেন। ছেলেটাও একটু তফাত রেখে হাঁটে। বলে, উই যে আমার বাব।

ওই অন্ধ তোর বাপ ?

হুঁ।

পীরের কবরে লোবানকাঠি ধরাতে হিমসিম খাচ্ছেন বিবিজান। হাজিসায়েব হন্তদন্ত এগিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। মেঘলা গুমোট বিকেলে হাওয়া বইছে

না। লোবানকাঠিগুলো জ্বলে উঠেছে। ঝাঁঝাল মিঠে গন্ধ ছড়াচ্ছে। বেন্দাবনের ছেলে তাকিয়ে আছে। এক ঠোঙা মানুষে মিষ্টান্ন দেখে তার দুহাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে।

হাজিসায়েব আর বিবিজান এবার টুটাফাটা কবরের উত্তরশিয়রে ঠোঙাটা আর ঘোড়াগুলো রেখে দুহাত তুলে প্রার্থনা করেন। তারপর ছেলেটাকে নিরাশ করে ঠোঙাটা তুলে নেন। হাজিসায়েব বলেন, ওই অন্ধ আর তার ব্যাটার হাতে একটুকুন দেওয়া দরকার। ফিরে যেয়ে এগুলান বিলোতে হবে। কৈ, ওঠ দিকিনি এবারে। খাওয়াদাওয়াটা চুকিয়ে ফেলি।

দুঃখে অভিমানে ছেলেটা বাবার কাছে ছুটে গেছে তখন। ফিসফিসিয়ে ঘটনাটা বর্ণনা করতে থাকে।

বিবিজান গাড়ির সামনে বসেছেন। বলদদুটো তখনও জাবনা খাচ্ছে। গাড়োয়ান বালতি হাতে পুকুরে জল আনতে গেল। হাজিসায়েব বেন্দাবনের কাছে গিয়ে বলেন, কৈ! ধরোদিকিনি সিন্নিটুকুন।

বেন্দাবন সেটুকু নিয়ে মাথায় ঠেকায়। একটু হেসে বলে, ছেলের কাছে শুনে মোনে লয় কী, আপুনি হাজিসায়েব বটেন।

ঠিক ধরেছ মানিক। হাজিসায়েব ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলেন।...তুমার ব্যাটাটা খুব বুদ্ধিমান। এই একটাই বুঝি?

আজ্ঞে না। অকারণ আবেগে আপ্লুত বেন্দাবন বলে, আরও তিনটে আছে হাজিসায়েব!

হাজিসায়েব তার হাতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমার হাতখানা বাপ্‌ খাটিয়ে মানুষের। আহা, অন্ধ হয়ে তুমার ই কী অবস্থা হ্যাখোদিকিনি! খোদা কার ওপর কখন নারাজ হন।

বেন্দাবন দুঃখে বলে, ভিখ চাইতে লজ্জা করে হাজিসায়েব! চোখ দুটো থাকলে খেটে খেতাম!

খাটুনিরও অভাব দেশে। হাজিসায়েব বলেন, বছরটা একরকম বর্ষাই না তেমন। আমাদের উদিকে ক্যানাল বলে তাও দুটি ঘরে উঠেছে। তুমাদের ইদিকে দেখি জলা মাঠ।

শ্বাস ফেলে বেন্দাবন বলে, তাইলেই বুঝুন হাজিসায়েব!

হাজিসায়েব হঠাৎ ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসেন।...ওই

যাঃ! তোকে সিন্নি দিলাম কৈ বাপ? লে লে, তুইও লে। কৈ, হাত পাতদিকিনি! কী হল মানিক! শরম ক্যানে এত?

ছেলেটা হাত পাতে না টের পায় বেন্দাবন। জোর করে তার হাত টেনে আনে। অগত্যা ছোট্ট হাতে সে একটা বাতাসা, একটু মুড়কি আর আধখানি পাটালি নেয়। হাজিসায়েব ফের বেন্দাবনের হাতের তারিফ করেন। ...দ্যাখো দিকিনি ই কী অবস্থা মানুষের! খাটিয়ে পুরুষের হাত। শুধু দুটি চোখের অভাবে সেই হাত ভিখ মাঙে। না জানি কত ভুঁইক্ষেত ওই হাতে আবাদ করেছ সোনা! কত বাঁজা মাটির ভোল ফিরিয়েছ। খোদার দুনিয়াটাকে ওই হাতখানি দিয়ে যত্ন করে সাজিয়েছে। সেই হাত! হাজি-সায়েব জিব চুকচুক করে। দুঃখ প্রকাশ করেন। ফের শত মুখে প্রশংসা করেন দুই রূপকার হাতের। আর সেই প্রশংসায় বেন্দাবন আবেগে ছটফট করে। এমন কথা তাকে কেউ এপর্যন্ত বলে নি। ধরা গলায় বলে, হাজিসায়েবের বাড়ি কতি গো? বড় ভালমানুষ বটে আপুনি মাশাই।

হাজিসায়েব বলেন, বাড়ি সেই রূপপুর-কাঁকসে।

নাম শুনেছি বটে। বড় সুখী গাঁ আপনাদের। বেন্দাবন একটু ইতস্তত করে বলে, একটা কথা বলি—ভয়ে কী নির্ভয়ে?

বলো মানিক! হাজিসায়েব আশ্বস্ত করেন। মানুষ মানুষকে কথা বলবে, তার ভয় কিসের?

কিসের মানত দিলেন, জানতে ইচ্ছে করে।

হাজিসায়েব শুকনো হাসেন। ...সেকথা পরে। তুমার নাম কী বাছা?

আজ্ঞে, বেন্দাবন।

বেন্দাবন? হাজিসায়েব আবার হাসেন। তো বেন্দাবন, খোদা-ভগমানের কাণ্ডখানা দ্যাখো! ওই তুমার শরীল। এই আমার শরীল। শরীলে-শরীলে কত তফাত!

ক্যানে হাজিসায়েব?

লয়? হাজিসায়েব আরও জোরে হাসেন। তুমি চারজনার বাপ। আর আমার ঘরে পুষতে পালতে একটুনও নাই। অত জমিজিরেত, তিনখানা হাল ঘরে। নসিবটা দ্যাখো বেন্দাবন!

বেন্দাবন আস্তে বলে, বুঝিছি। দয়া হবে পীরবাবার।

দেখি। মোন মানে না বলে তো এলাম। …দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাজিসায়েব উঠে যান গাড়ির কাছে।

বেন্দাবন ফিসফিস করে ছেলেকে বলে, বড় ভালমানুষ। যা না, পয়সা চাইলে দেবে। দেরি করিসনে।

ছেলেটা কুড়মুড় করে সিন্নি চিবোয়। বলে, আমাকে দিয়েছে। তুমি চাইলে না ক্যান?

লজ্জা হল। অতক্ষণ দুঃখের কথা বললে লোকটা।

ছেলেটা হঠাৎ বলে, উর অনেক পয়সা বাবা?

হুঁ, বুঝলি নে? বেন্দাবন চুপিচুপি বলে। ঘরে ছেলেপুলে নাই, খাওয়াবে কাকে? তুই যা না আবার। চাইলেই দেবে।…

গাড়ির সামনে বসে বিবিজান এনামেলের পাত্র খুলেছেন। পরটা হালুয়া এনেছেন সঙ্গে। মানত করে এখন খাওয়া-দাওয়া হবে। উপোসে পেট জ্বলছে দুটো মানুষের। পরটা ছিঁড়ে বিবিজান বেন্দাবনের ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন।…বড় সোন্দর ছেলেটা গো! ওই কানা লোকটার ব্যাটা বুঝি?

হুঁ। আবার কার?

এট্টু ডাকো না ছেলেটাকে।

ক্যানে?

দানাপানি খায়নি বুঝি। কেমন কষ্ট লাগে দেখে! ডাকো না গো ছেলেটাকে!

হাজিসায়েব টের পান, বিবিজানেরও মনে ধরেছে ছেলেটাকে। হাত তুলে ডাক দেন, হেই বাপ! কী যেন নামটা তোর—হুঁ ওরে নেম্মল! ইদিকে আয় সোনা!

বিবিজান বলে, ছেলেটার বড় শরম। আহা!

বেন্দাবন তার ছেলের পাঁজরে খামচি কেটে ধমকায়। যা শিগগিরি। পয়সা পাবি। খালি হাঁকোৎপনা তুর!

ছেলেটা এক পা দুপা করে এগিয়ে যায়। বিবিজান মিষ্টি হেসে বলেন, কাছে আয় বাপু।

হাজিসায়েব গলা চড়িয়ে অন্ধের উদ্দেশে বলেন, বেন্দাবন! খোদা-ভগমানের দুনিয়ায় খাদ্যর কুনো জাত নাই। আছে কি? তুমার ছেলেটাকে কিঞ্চিৎ হালুয়া পরটা দিই?

বেন্দাবন তৎক্ষণাৎ সায় দেয়। দেন হাজিসায়েব! জাতের কথা যদি বুলেন, তাহলে শুনুন ডাকপুরুষের বচন : জাত—খেলে যায় না, বুললে যায়।

তবে তুমো খাও হে বেন্দাবন!

বেন্দাবন, দাঁত বের করে আনন্দে। হাজিসায়েব একটা পরোটায় হালুয়া সাজিয়ে তার হাতে দিয়ে যান। ক্ষুধার্ত অন্ধ ব্যাকুলতায় চিবুতে থাকে। মশলার গন্ধমাখা হালুয়া তাকে এক অচেনা দেশের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। সেখানে বড় সুখশান্তি। ক্যানেলের জলে মাঠ সবুজ হয়ে থাকে। শুনেছে বটে রূপপুর-কাঁকসার নাম। কোথায় কতদূরে সবিশেষ জানে না বেন্দাবন।

বিবিজান ছেলেটার হাতে হালুয়াপরটা দিয়ে বলেন, সামনে বসে খাও বাছা। শরম কোরো না। এই ছ্যাখো, আমরাও খাই. তুম্মো খাও।

গাড়োয়ান বালতি ভরে জল এনেছে পুকুর থেকে। হাজিসায়েব তাকেও হালুয়াপরটা দিলে সে গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে। নিঝুম বুড়োপীরের দরগাতলায় পাঁচজন মানুষ এবং দুটি গরু আহারে লিপ্ত থাকে কিছুক্ষণ।···

খাওয়া শেষ হলে বেন্দাবনকে নড়ি ধরে পুকুরে নিয়ে যায় ছেলেটা। বাবা জল খেয়ে ঘাটের মাথায় দাঁড়ালে সে দূর থেকে জল ছিটিয়ে দেয়। পায়ের পাঁক ধোবার চেষ্টা করে বেন্দাবন। তারপর বলে, ওই হল আর কী।

দরগাতলায় আগের জায়গায় তাকে বসিয়ে রেখে ছেলেটা ফের খেলতে ঢোকে গাছপালার ভেতর। পেটটা ডাগর হয়েছে। মুখে টলমল করছে তৃপ্তি। কাঠবেড়ালির পেছনে ছোটাছুটি করে বেড়ায় সে। আপনমনে ছড়া গাইতে থাকে।

'নামুপাড়ার নামুতে কাঁদর
মাগীরা মোড়লী করে
মিন্সেরা বাঁদর···

বিবিজান এখন গাছতলায় আড়ালে দাঁড়িয়ে চুলে কাঁকুই দিচ্ছেন। কান করে শোনেন। মুখ টিপে হাসেন। হাজিসায়েবও ছেলেটার দিকে লক্ষ রেখেছেন। আনমনে হেঁটে তার কাছে গিয়ে বলেন, বাপ, তোর গলাখানা যেন কাঁসি।

ছেলেটা লাফ দিয়ে একটা নিচু ডালে ওঠে। ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে চেঁচায়, হো হো ধত্তে পাল্লে না! হাজিসায়েব ভাবেন, খেলাটা বুঝি তাঁরই

সঙ্গে। বয়স্ক, গুরুভার তাঁর সুখী-শরীর। হা হা করে হেসে তাড়া করেন তাকে। ছেলেটা রগড় বোঝে। ফের গাছে উঠে তরতর করে মগডালে চড়ে। হো হো ধত্তে পাল্লে না! ধত্তে পাল্লে না! সুর ধরে চেঁচাতে থাকে সে।

হাজিসায়েব বলেন, ঘাট মানছি বাপ! আয় ইবারে পাগলা-ছাগলা খেলি। হাজিসায়েব খেলার বুলি বলেন, সুরে।

'···ছাগলা রে পাগলা তোর ছাগলা কতি চরে?'

বেন্দাবনের ছেলে এ খেলা জানে। তরতরিয়ে নামতে নামতে জবাব দেয়, 'ডিঙডিঙে লগরে।'

'খায় কী?'

'লতাপাতা-আ-আ।'

'হাগে কী'?

'বকছ্যারানি-ই-ই।'

'মোতে কী?'

'কলুর ঘানি-ই-ই!'

হাত বাড়িয়ে হাজিসায়েব বলেন, ইর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌ নাক ড্যাঙাড্যাঙ ড্যাডাং ড্যাং/ তোর ঠ্যাং তোর বাপের ঠ্যাং!

ছেলেটা খেলার টানে তাঁর হাত দুটো ধরে। দুজনে কয়েকপাক ঘুরে গেল, শেষ করে। হাজিসায়েব হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন, আমি কি তোর সঙ্গে পারি বাপ? বুঢা মানুষ!

বেন্দাবনের ছেলে বলে, তুমি ছড়া জানো না গো?

না সোনা রে।

আমার বাবা জানে। শুনবে তো চলো।

তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় বেন্দাবনের কাছে। 'ও বাবা! সেই ছড়াটা বুলো না! 'ধুল্লোউড়ির মাটে রে ভাই ওদ ঝাং ঝাং করে··

হাজিসায়েব বলেন, বেন্দাবন! তুমার ব্যাটা আমাকে বড় মায়ায় ফেললে হে! ই কী দায় ছ্যাথোদিকিনি।

বেন্দাবন মুখ তুলে নিঃশব্দে হাসে।

বেন্দাবন!

আজ্ঞে হাজিসায়েব!

তুমার ছেলেটাকে দাও। পেলেপুষে মানুষ করি।

বেন্দাবন অন্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

আমার ঘরে ব্যাটা নাই বেন্দাবন। যার ব্যাটা নাই, তার কী আছে? তুমার ছেলেটা দাও।

বেন্দাবন কী বলবে ভেবে পায় না। একটু পরে বলে, দত্তক লিবেন হাজিসায়েব?

হাজিসায়েব মাথা দোলান। আমার ধম্মেতে দত্তক নাই বেন্দাবন। তবে কথা কী, সব সম্পত্তি ছেলেটার নামে দানপত্র করব। তাতে আটকাবে না। বুঝলে তো? আর ভেবে দ্যাখো বেন্দাবন, ছেলেকে গেরস্থবাড়ি তো থোয় লোকে। জানবে এও তেমনি।

বেন্দাবনের হাত কাঁপে। আমতা হেসে বলে, সে তো মাইনেকড়িটা বছরে পায় লোকে। আমি কী পাব?

হাজিসায়েব পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে গুঁজে দেন।··পাঁচখানা দশটাকার নোট। তুমি মধ্যে মাঝো যাবে বেন্দাবন। যেয়ে দেখে আসবে ব্যাটাকে। টাকাকড়ি লিয়ে আসবে। চিন্তা কিসের?

বেন্দাবন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, ছেলে কি যেতে চাইবে? ওকে শুধোন আগে।

হাজিসায়েব ছেলেটাকে দুহাতে কাছে টেনে বলেন, যাবি না বাপ আমাদের বাড়ি? ভাল-ভাল খেতে পাবি। পরতে পাবি। যাবি না তুই?

কৃতজ্ঞ ছেলেটা চুপ করে থাকে। লোভাটে চোখে দুটি বয়স্ক মানুষের দিকে পালাক্রমে তাকায়। আর বেন্দাবন চাপা গলায় বলে, ভাল থাকবি। চলে যা নেম্মল! গেরস্থবাড়ি তো তুকে তুর দাদার মতন থাকতেই হত—না কী? রূপপুর কাঁকসা বড় জায়গা। এনারাও বড়লোক। চলে যা।···

গরুর গাড়িটা চলে গেলে কতক্ষণ আচ্ছন্নভাবে বসে থাকে বেন্দাবন। চাকার শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে। তারপর তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সুখেশ্বরী কী বলবে?

আর অবাক কাণ্ড, ছেলেটাও হঠাৎ কেমন পর হয়ে গেল! এতটুকু আপত্তি পর্যন্ত করল না! অন্ধের নড়িটা! বেন্দাবন ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়ে। তারপর

সাবধানে কোমরের কাছে টাকাগুলো ছুঁয়ে দেখে। ভাবে, বেচে তো দিই নি। গেরস্থবাড়ি রাখতেই হত—নেহাত কদিন আগে আর পরে বলে কথা। ছেলেটা ভালই থাকবে। শুধু গাঁয়ের কাউকে না বললেই হল যে মোছলমানের বাড়ি আছে।

সন্ধ্যাঅব্দি বসে থাকে বেন্দাবন ইচ্ছে করেই। দরগাতলায় আঁধার ঘনায়। পোকামাকড় ডাকতে শুরু করে। তার কতক্ষণ পরে গাঁয়ের দিক থেকে তার বড় ছেলের ডাক ভেসে আসে। বেন্দাবন চেঁচিয়ে সাড়া দেয়।

বড় ছেলে রাগ দেখিয়ে বলে, নেম্মলাকে ইবারে কুপিয়ে কাটব।

ভেবেছে, অন্য দিনের মতো বাবাকে ফেলে পালিয়েছে। বেন্দাবন কিছু ফাঁস করে না। বলে, যাক না বাপু। চেঁচাস নে। চলদিকিনি চুপচাপ।

বাড়ি ফিরে সে গুম হয়ে বসে থাকে। সুখেশ্বরী উঠোনের উনোনে রান্না করছিল। সেও বলে, নামুনে আসুক বাড়ি। কেটে খাব আজ।

তবু বেন্দাবন কিছু ফাঁস করে না। রাত বাড়ে। অন্ধকারেই অভ্যাসমতো নক্ষত্রের আলোয় খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে। মায়ের মন। সুখেশ্বরী ঘর বার করে খালি। গলা চড়িয়ে ডাকে, নেম্মলা রে! নেম্মলা-আ-আ!

ছেলেটা না খেয়ে আছে সারাটা দিন। সেই সাতসকালে একবাটি আমানি খেয়েছিল—পান্তাভাতের জল। পীরবাবার কাছে আজ কি কোনো ভক্ত এসেছিল? এসে থাকলে একটুকুন সিন্নিও জুটেছে। নৈলে ঠা ঠা উপোস। সুখেশ্বরীর চোখে জল ছপছপ করে। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ফের পাড়া মাথায় করতে যায়, নেম্মল রে! ও বাবা নেম্মলা-আ-আ!

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলে বেন্দাবন বলে, থানে ভক্ত এসেছিল। চিন্তা কোরো না নেম্মলার মা। বলে খিকখিক করে হাসে। আমাদের বাপব্যাটার খ্যাটখানা আজ ভালমতনই হয়েছে, বুঝলে?

সুখেশ্বরী একথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে, ক্যানে ঝগড়া হল? মেরেছিলে উকে?

হুঁ। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেন্দাবন জবাব দেয়।··· তুমার ছেলে। তুমি বুঝলে না? খ্যাট ভালমতন হলেই তেজ বাড়ে। আছে কোথাও লুকিয়ে পাড়ার ভেতর।

এমন যে কোনোবার না হয়েছে, তা নয়। বিন্দেবুড়ির কাছে, নয়তো ভোম্বল মোড়লের খামার বাড়িতে পরদেশী মুনিশদের কাছে রূপকথা শুনতে

শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোরবেলা চোখের পিচুটি মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরেছে। গালমন্দ খেয়েছে মায়ের কাছে। তারপর আমানি খেয়ে হাসিমুখে বাবার নড়িটা ধরেছে। বুঢ়াপীরের দরগাতলার দিকে যেতে যেতে বলেছে, আজ সেই ধুল্লো-উড়ির ছড়াটা শিখিয়ে দি'ও না বাবা। 'ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই ওদ ঝং বাং করে···

ভাঙা ঘর ও দাওয়া জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে রইল পাঁচটা ছোট-বড় মানুষ। বেন্দাবনের চোখে আজ ঘুম নেই। কোমরে পঞ্চাশটে টাকা এবং রূপপুর-কাঁকসার এক গেরস্থবাড়ির ভবিষ্যৎ—অবিকল দেখতে পায়, তিনখানা হালের জমিজিরেত মাঠজোড়া আদিগন্ত। সবুজ শস্যে আশ্বিনের হাওয়া খেলছে। ওই তার ছেলে, খবরদারি করে বেড়াচ্ছে মুনিশমাহিন্দারের ওপর। ছেলের মুখটা ভোম্বল মোড়লের ব্যাটা হরেনের মতো ঝকমকে। হাতের ঘড়িটা চিকমিক করছে। বেন্দাবন মনে মনে বলে, আমাকে শুধু একখানা কম্বল কিনে দিস বাবা। আর কিছু না। কম্বলখানা গায়ে দিয়ে তুর খামারে বসে থাকব।

সেই শস্যভরা খামারে বসে অন্ধ বেন্দাবন প্রাণ খুলে ধুল্লোউড়ি মাঠের ছড়া গাইবে।

শেষরাতে ঘুমটা এল। আজ ঘুমটাও ছিল খুব ঘন। সেই ঘুম হঠাৎ ভাঙল সুখেশ্বরীর ধাক্কা খেয়ে। কুয়াশার ফাঁক দিয়ে রোদের ছটা ফুটছে চাপচাপ। চৈত্রের শেষরাতে প্রচণ্ড হিম পড়ে। ছেঁড়া চটখানা গায়ে জড়ানো ছিল। সরে গেছে কখন। সুখেশ্বরী তার পাশে বসে তাকে খামচে ধরেছে। ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বেন্দাবন বলে, কী, কী গো? মাচ্ছ ক্যানো খামোকো?

ট্যাকা? সুখেশ্বরী হাঁসফাঁস করে বলতে থাকে। ও মিনসে! এতগুলো ট্যাকা ক্যানে তুমার? কতি পেলে এত ট্যাকা?

বেন্দাবন অন্ধ মুখের দাঁত বের করে বলে, চুপ! চুপ! বুলছি, এট্টু, চুপ কর দিকিন।

ঘুমের ঘোরে কোমরে জড়ানো টাকাগুলো খসে পড়েছে। গিঁট দিয়ে রাখলেই ভাল হত। বেন্দাবন এই টাকা দিয়ে বিড়ির পাতা মসলা কিনে বিড়ি বাঁধবে। সে ছিল বেরং খাটিয়ে মানুষ। হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে বড় লজ্জা বলেই না বুঢ়াপীরের দরগাতলার নিরিবিলি গিয়ে বসে থাকত। সে বলে, চুপ চুপ! তুর ছেলের কপাল ফিরেছে।

সুখেশ্বরী তাকে থামচায়। কিল মারে। হুহু করে কেঁদে বলে, বেচে দিয়েছে আমার ছেলেটাকে! কত্তি বেচলে? কোন মুখপোড়ার কাছে বেচলে? ছেলে বেচে খেলে নিব্বংশ। ড্যাকরা! হাভেতে! সে বুক ফেটে কাঁদতে থাকে।

বেন্দাবন বোঝাতে চেষ্টা করে। গেরস্থবাড়ি রাখাল রাখতেই হত ছেলেটাকে। তাই রেখেছে ধরতে গেলে। হলই বা মোছলমান। অন্নের কি জাত আছে?

রূপপুর-কাঁকসার হাজিসায়েবের বৃত্তান্ত কান করে শুনতে থাকে সুখেশ্বরী চোখে জল নিয়ে।

বটাপীরের দরগাতলায় নিরিবিলি বসে বিড়ি বাঁধে বেন্দাবন। সেঁকার যোগাড় করা কঠিন। অন্ধ মানুষ। কয়লা চাই। লোহার জাল চাই। কত হাঙ্গামা। তবে কাঁচা বিড়ির খদ্দের জোটে তার। রাখালবাগাল, মাঠের চাষা, পথিকজন কেনে। সুনসান নিঝুম এই জায়গাটা খুব ভেতর থেকে টানে বেন্দাবনকে। সুখেশ্বরী বিলেবাদাড়ে যাবার মুখে তাকে দরগাতলায় বসিয়ে রেখে যায়। সন্ধ্যার আগে ফিরে বাড়ি নিয়ে যায় সোয়ামীকে। অন্নের সুরাহা হয়েছে যৎকিঞ্চিৎ।

মায়ের মন মাসটা যেতে না যেতে আনচান করে উঠেছিল। ছেলেটাকে দেখতে যায় রূপপুর-কাঁকসা। একে-ওকে শুধিয়ে তল্লাস করে সে পাঁচক্রোশ রাস্তা হেঁটে একদিন চলে গেল। বাচ্চাদুটো বেন্দাবনের কাছে বসে রইল। বেন্দাবন তাদের ছড়া শোনায়। তারা কি বোঝে কিছু? নেন্মল হলে খিট-খিট করে হেসে বলত, ইবারে সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! 'খিলিখিলি পান বানাল্যাম তাথে দিলাম সুপারি। ওগো কন্যে, আর কোরো না মোন ভারি।'

সন্ধ্যার মুখে ফিরে এল সুখেশ্বরী মুখ চুন করে। তারপর ডাক ছেড়ে কেঁদে বলে, কুন আথান্তরে বেসজ্জন দিয়েছ গো বুকের ধোনটাকে আমার! ই কী সব্বনাশ করেছ তুমি!

বেন্দাবন অবাক হয়ে বলে, ক্যানে?

ওগো, উপপুর-কাঁকসেতে নাই কুনো হাজিসায়েব। আমাদের হেঁদুর গাঁ। একজনাও মোছলমান নাই।

নাই। বেন্দাবনের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

না! চিলেচেঁচানি চেঁচায় সুখেশ্বরী। তাবপর হিংস্র হাতে বেন্দাবনেব বিড়িবাঁধা কুলোয় টান মারে। বাচ্চাদুটোও হকচকিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। সন্ধ্যার দরগাতলা তোলপাড করে সুখেশ্বরী সোয়ামীকে মারতে থাকে।

বেন্দাবন চুপচাপ পাথরের মতো এই ঝডজল শিলাবৃষ্টি শরীরে নেয়।

রাক্ষুসী মূর্তিতে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা। বাচ্চাদুটোকে হ্যাঁচকা টানে ওঠায়। একটা কোলে নেয়, অন্যটার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় গাঁয়ের দিকে। বলে, থাকো লিদয়া বাটপাড ইথেনে বসে।

বেন্দাবন কান পেতে শোনে, হিপিয়ে ফিপিয়ে কান্না মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। সে মুখ তুলে বসে থাকে চুপচাপ। হাজিসাযেব সেজে এক ছেলেধরা এসেছিল। তার এমন সুন্দর ছেলেটা চুরি করে নিয়ে গেল। বাবা বড়াপীব! ইয়ার বিচেব হবে না তুমার দরগায়? তুমি সাক্ষী। আমার অন্ধেব হাতের নড়িটা। পাখির গলায় কথা কইত। তুমার দরগাতলায় খেলে বেডাত সারাটা দিন। সুর ধরে গাইত। পীরবাবা, সাক্ষী রইলে তুমি।

হাজিসায়েব কেন নিজের গাঁয়ের নামটা লুকিয়েছে, বেন্দাবন কিছুতেই বুঝতে পারে না।

রাত বাড়তে বাডতে বেন্দাবন চঞ্চল হল। বিডিবাঁধা কুলো, পাতা-মসলা, বাঁধা বিড়িগুলো ছডিয়ে পড়ে আছে কোথায় সে জানে না। গলা চড়িয়ে গাঁযেব দিকে ঘুরে সে ডাকতে লাগল, বেমল! বেমলা রে!

কতক্ষণ পরে সাডা আসে।…চোওপ শালো! ফাড়িস না। গলা টিপে দিব তুর।

বেমল লণ্ঠন হাতে আসছে বাপের কাছে। হাজার হোক, জন্মদাতা বাপ। বিড়ির পয়সায় একটু তেলও জুটছে সংসারে। ফাটা কাচের লণ্ঠনটা কাজে লাগছে রাতবিরেতে। এদিকে বছর শেষ হয়ে গেরস্থবাড়ি রাখালীর দরুন দেড়-কুড়ি টাকাও হাতে এসেছে। বেন্দাবনের বাড়িতে কিছু সুখ ইদানীং। শুধু ওই ছেলেটার জন্য বুক টনটন করে।

তবে এখন তো তাকে মড়া বলেই গণ্য করা ভাল। সুখেশ্বরী উনোনের পাশে বসে পা দুটো ছড়িয়ে তার জন্য মড়াকান্না কাঁদে। বেন্দাবন ধরা গলায় বলে, কেঁদো না। বেঁচেবত্তে থাকলে একদিন বড় হবে। সব মোনে

পড়বে। ত্যাখন···সে হঠাৎ চুপ করে যায়। সে ভাবে, একটা কিছু ঘটবে তখন।

তারপর আবার একটা করে সকাল আসে। বেন্দাবনকে দরগাতলায় বসিয়ে রেখে যায় সুখেশ্বরী। অন্ধ বেন্দাবন পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি বাঁধে। বাসমোটর যায় পীরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে। সে ভাবে, হঠাৎ কোনো একদিন এক বাস-মোটর এখানে কিছুক্ষণ থামবে। আর সেই বাসমোটর থেকে নামবে তার ছেলে। পরনে সুন্দর পোশাক। শরীলে জলজলে স্বাস্থ্য। হাতে থাকবে মোড়লের ব্যাটার মতো হাতঘড়ি। সে তার জমিজিরেতের গল্প শোনাবে। শেষে বলবে, তুমাদের লিতে এলাম বাবা।

বেন্দাবন বলবে, তা কি হয় ? মোছলমানের বাড়ি।

ছেলেটা বলবে, অন্নের জাত লাই। তবে কথা কী, আলাদা বাড়ি বানিয়ে দিব তুমাদের। বছরসন খাইখোরাকিটা দিব। ভাগে ভুঁইক্ষেতটা দিব দাদাকে। চষবে-কাটবে।

বেন্দাবন হেসে বলবে, ধুর পাগলা! কতি যাব গাঁ ছেড়ে ? মধ্যেমাঝে আসিস। বাপ মাকে দেখা দিয়ে যাস। তাইলেই হল।···

বুড়াপীরের দরগাতলায় কাঠবেড়ালিটা শুকনো পাতায় নখের আঁচড় কাটছে শুনতে পায় অন্ধ বেন্দাবন। গাছের ডালে ঘুঘু পাখিটা ঘুম-ঘুম স্বরে ডাকতে থাকে। শুকনো ঘাসের মাথায় বসে ঘাসফড়িংটা কিরকির করে গান গায়। রাস্তার ওপর ঘূর্ণিহাওয়া ফরফর করে ওঠে। অভ্যাসে রোদজ্বলা মাঠের দিকে ব্যস্ত চাষার মতো এগিয়ে চলে মৃত মানুষজন। বেন্দাবন মুখ তুলে বসে থাকে। ছেলেটা থাকলে কী করত এখন। সারা দরগাতলা ছুটোছুটি করে এসে বলত, সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই ওদ ঝং ঝং করে···

অন্ধ দু চোখের কোনায় জলের ফোঁটা নিয়ে বেন্দাবন বুড়াপীরের দরগা-তলায় বিড়ি বাঁধে। তার পেছনে এক অদৃশ্য বালক দিনমান আপনমনে খেলে বেড়ায়। তার গায়ের গন্ধ ভেসে থাকে বাতাসে।

বেন্দাবন ঠিকই টের পায়। শ্বাস টেনে বুড়াপীরের উদ্দেশে বলে, সাক্ষী থেকো বাবা। আমার অন্ধের নড়িটাকে দেখো। সুহালে রেখো তাকে, যেখানেই থাক।···

বিভ্রম

ঘুরে ফিরে বনবাসীর একই কথা, যতক্ষণ গন্ধহরির আবির্ভাব। 'ই কী ঝামেলা দেখদিকিনি মনোদা!' গন্ধহরি মুচকি-মুচকি হেসে সায় দিচ্ছিল বটে, তার কানও ঝালাপালা। নেহাত বনবাসী তার মতো লোককে খাতির করছে, চা দিয়েছে, বিস্কুটও দিয়েছে এবং তার মতো তুচ্ছ লোকের সঙ্গে ঘরোয়া সমিস্যে নিয়ে কথাবার্তা বলছে, তাই।

নৈলে চারপাশে এই রঙঝলোমলো মেলা, দোকানপাট, নাগিন বাঁশির সুর, পাঁপরভাজার গন্ধ, আর দীঘির পাড়ে এতক্ষণ খাঁচায় বন্দী সিংহটার ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল, তাঁবুর পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে গন্ধহরিব কতবার গায়ে কাঁটা দিত। বনবাসী তাকে নড়তে দিচ্ছে না। এত খাতিরের পর নড়বেই বা কোন মুখে? গন্ধহরির বড়ই চক্ষুলজ্জা।

বনবাসীর দোকানটা তেমন কিছু না। তিনদিকে চট আর ওপরে একখানা রিলিফের তেরপল। যৎসামান্য মনোহারি জিনিসপত্তর—চুড়ি, ফুলেল তেল, আয়না-চিরুনি-সেফটিপিন, ফিতে, চুলের কাঁটা এই সব। তাহলেও সে গন্ধহরির বিবেচনায় এই ঝলোমলো রঙের বাজারে এক রাজা। পা ছড়িয়ে বসে আছে টাটের পাশে। ঘোমটাপরা বউ, নিলাজ কুমারী, ঝগড়াটে বুড়ি, খদ্দেরের রকম-সকম দেখে গন্ধহরিরও একটা অভিজ্ঞতা হল বটে। সে একানড়ে খাটিয়ে মানুষ। খাটুনি না পেলে বিলখাল বনবাদাড়ে মাথা ভেঙে খাদ্য খুঁড়ে আনে। মেলায় আসার কপাল নয়। এত রকমের মানুষামি এক জায়গায় বসে দেখা! মেলার মানুষ যে অন্য মানুষ, তাও সত্যি।

খালি হাতে পৃথিবী ঘোরা যায়, মেলায় আসা চলে না। এ হল গে বিকিকিনির জায়গা। এসে পড়লেই কিনতে হয়। দরকার থাক বা না থাক, না কিনলে মনে কষ্ট বাজে। সেই চৈত্রের গোড়ায় শুরু হয়েছে ঈশানপুরে এই শ্যামচাঁদের মেলা। এখন প্রায় ভাঙার মুখে এসে গেছে। গন্ধহরির পৌঁছুতে এত দেরি হয়ে গেল। আজ কপালগুণে ছোটবাবুর খামারের উঠোন পিটিয়ে এবং গোবরজলে নিকিয়ে পেটপুরে অন্ন এবং একটা মুদ্রালাভ হয়েছে। গন্ধহরির বিশ্বাস, টাকাটা রুপোরই। কাগুজে টাকা হলে গন্ধহরির মনে এখন সুখ থাকত না।

বিকেলে মেলায় ছুটে আসার পর গন্ধহরির মাথাখারাপ হবার যোগাড়। কী কিনবে? কিনতে গিয়ে নাড়াচাড়া করে পিছিয়ে এসেছে। মনে খালি টানা-

পোড়েন, মতি অস্থির। চিরুনি কিনতে গেলে মনে হয়, আয়না কেনাই ভাল। আয়না কিনতে একটুকরো সাবুনের গোপন লোভে বুকের ভেতর রক্ত নাচে। আবার লজ্জা পায় গন্ধহরি। বিহ্বল অন্যমনস্কতায় মাতালের মতো ভিড়ে ঘোরে। কী কিনবে ঠিক করতে পারে না। পাওয়া যায় নাকি এই রঙের বাজারে এমন কোনো আশ্চর্য সুন্দর চিরস্থায়ী জিনিস, যা এক টাকায় কেনা যায়? বার বার কোমরে গুঁজে রাখা মুদ্রাটা ছুঁয়ে দেখছে আর শিউরে উঠেছে উত্তেজনায়। সার্কাসের তাঁবুর দরজায় গিয়ে সিংহ দেখার ইচ্ছেয় সে দাঁড়িয়ে থেকেছে। সিংহ সে কখনও দেখেনি। এল্লাকার খুব কম লোকেই দেখেছে। ক্ষেতে নিড়ান দিতে দিতে ছোটবেলায় মামা যোগীবরের কাছে শুনেছিল, 'সিঙ্গির ডাকে লিঙ্গি খসে যায়। বড় বেভাংকার জন্তু!' মাঠঘাটের ওই মানুষেরা কখনও সিঙ্গি দেখে নি। সবাই অবাক হয়েছিল সে-কথা শুনে।

গন্ধহরি সার্কাসের দরজা থেকেও ফিরে এসেছে দোনামনা করে। টাকাটা খরচ করে পুরুষের 'লিঙ্গি-খসানো সিঙ্গির ডাকে' পোষাবে কিনা বুঝে উঠতে পারে নি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বনবাসীর এই টাটে হাজির। ক্লান্ত গন্ধহরি একটু বসে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছিল।

কিন্তু বনবাসীর ওই ধুয়ো শুরু হয়েছে, 'ই কী ঝামেলা দেখদিকিনি গনোদা!' কোনায় জড়োসড়ো বসে ঠোঙা থেকে জিলিপি তুলে খাচ্ছে বনবাসীর বউয়ের শেষ প্রসব। মুখের চারপাশে রস জবজব করছে। নাক থেকে সিকনি ঝরছে। চোখের তলায় কাজলধোয়া কালির ছোপ। 'ওই দুধের বালককে সঙ্গে লিয়ে কেউ আসে?' বনবাসী বলল। 'দেখ না, মেলায় আলো জ্বলবে আর অমনি ঢুলনি শুরু হবে। তাকে লিয়ে তেপান্তর পাড়ি দেবে রেতের বেলা। কী সাওস দেখছ?'

গন্ধহরি মাথা ঘামাচ্ছিল। কিছু বুঝতে পারছিল না। একটু পরে বুঝল। ডোরাকাটা লালহলুদ আনকোরা শাড়ি পরে গন্ধহরির চোখ ঝলসে দিয়ে যখন কেউ হন্তদন্ত এসে বলল, 'বারো আনা টিকিট। কৈ জামাইদা, শিগগিরি করে দাও দিকিনি।' তারপর বনবাসীর জিল্লিপিভুক বংশধরের দিকে চোখ কটমটালো। 'এই ছোঁড়া ঢুলবি না তো? আমি বাবা কাউকে কোলে কত্তে পারব না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।'

বনবাসী চোখ তুলল। 'বারো আনা! আবার ওরও লাগবে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভেংচি কাটল বনবাসীর শালী। তার সঙ্গে চোখের ঝিলিক আর ঠোঁটের কোনায় এককুচি বাঁকা হাসি। 'নিজে তো টাট ছেড়ে নড়তে পারবেন না বাবুমশায়! ছেলেটাকেও···! হুঁ, এমন হাড়কেপ্পন কে জানত বাবা? মুখে তো একশোবার, যেও যেন—যাবে যেন, সার্কেসের বাজি দেখাব!' তারপর অকারণ হাই তুলে উদাস চোখে মেলা দেখতে দেখতে বলল, 'আগেই বুঝেছিলাম বাবা। ক্যানে যে মত্তে এলাম এমন করে।'

গতিক বুঝে বনবাসী চটের তলা থেকে পয়সা গুনে একগাল হেসে বলল, 'তুমি মাইরি মেয়ে বটো একখানা? এই লাও। আর শোনো, গনোদাকে আটকে রাখলাম। হেরিকেন লোব। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

বনবাসীর শালী গন্ধহরির দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই গন্ধহরি ঘা খেয়ে চুড়ি দেখতে থাকল। ই কী চোখের দিষ্টি! ই কী নাকমুখের গড়ন! কপালের লাল টিপখানা কী আগুনজ্বলা জ্বলছে দাউদাউ! মাঠের মানুষ গন্ধহরির মেঠো আত্মা হঠকারী চৈতালী ঘূর্ণির ভেতর শুকনো পাতার মতো ভেসে যাচ্ছে। এই দিনশেষে ঈশানপুরের মেলায় থামোকা এদ উপদ্রব। মানুষজন, পাঁপরভাজার গন্ধ, তালপাতার পাখির চিৎকার, নাগিনবাঁশির স্বর জড়াজড়ি একাকার হতে হতে পুরুষের লিঙ্গি-খসানো সিঙ্গির গর্জন মুহুর্মুহু। গন্ধহরি ফোঁস করে গরম শ্বাস ছাড়ল।

এত বয়স হল গন্ধহরির। এখনও নারীসঙ্গ হয়নি। মামাতো ভাইদের বাড়ির দাওয়াই মাথা গুঁজে রাত কাটায়। কে তাকে মেয়ে দেবে? তার চেহারা গড়ন-পেটনও এমন কিছু আহামরি নয় যে নির্জন মাঠঘাটে কুড়িয়ে পাবে দৈবাৎ কোনো পোড়াকপালী মাঠকুড়োনি যুবতীর মন। বরং তাকে দেখলেই যেন দূরের দিকে পিছলে যায়। কিছু কি আছে গন্ধহরির দুই চোখে?

বনবাসী বলল, 'বিড়ি খাও গনোদা। আবার চা ইচ্ছে হলে বোলো। মেলায়-খেলায় বারো মাস বাস। ওই এক নেশা আমার—চা। একটুকুন চা পেলেই হল, আর কিছু চাই নে।'

বনবাসীর শালী লালহলুদ ডোরাকাটা শাড়ি পরে বাচ্চাটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। চালচলন যেন হরিণের পালে এক বাঘিনী। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছে। শাড়ি একটু উপরে উঠে গেছে। দুই চিক্কন গোলগাল আলতাপরা পায়ের ওঠাপড়া খালি চোখে পড়ে। দিনশেষের ধূসর আলোয় অসংখ্য পায়ের ভেতর ওই একজোড়া দেখনশিরি পা। উঠছে

আর পড়ছে। পড়ছে আর উঠছে। মেলার বুক মাড়িয়ে যাচ্ছে আর যাচ্ছে চিরটা কাল—যখন বুড়ো হতে হতে গন্ধহরি মরে যাবে, তখনই ওই দেখনশিরি আলতারাঙা দুটো চিকন পায়ের ওঠাপড়া দেখতে পাবে, এই মতো মনে হয়।

গন্ধহরি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলল, 'বউ এল না ক্যানে হে বানা?'

বনবাসী আবার সমিস্যে আনলো, 'সেও উদিকে ঝামেলা, গনোদা! উয়ার ব্যামোর শ্যাষ নাইকো। কোনোগতিকে বেঁচে আছে। তো গনোদা, বউয়ের কাছে পড়ে থাকলে তো টাট চলবে না।' বনবাসী বিষণ্ণ হাসল। 'মেলা বাদ গেলে খাব কী? তাই মেয়েটাকে খবর পাঠিয়ে আনলাম।'

'তুমার শালীকে?' গন্ধহরি একটু হাসল। 'ভালই বরঞ্চ। দিদির সেবা-যত্নটা করবে।'

'করে স্বগ্‌গে তুলবে। যা টেঁটিয়া মেয়ে। দেখলে তো! হরিপুরে বিয়ে হয়েছিল। সোয়ামীকে হাড়জ্বালান জ্বালিয়ে চলে এসেছে। সেও আর লিয়ে যায় না। কথা কী, সুখ চেয়ে শান্তি ভাল—তার চেয়ে গাছতলা ভাল। তুমি ভালই আছ গনোদা!'

গন্ধহরি মুচকি হেসে বলল, 'তা আছি।'

একদঙ্গল বউ ঝি এল ঝাঁপিয়ে। বনবাসী ব্যস্ত হয়ে উঠল। গন্ধহরি উস্‌খুস্ করছিল। টাকাটা আবার কুটকুট করছে কোমরের কাছে। কী কিনি কী কিনি ছটফটানিটা আবার চাউর হয়েছে মনের ভেতর। সে উঠে দাঁড়াল। বনবাসী খদ্দেরের ভিড়ে চাপা পড়েছে। ভেতর থেকে টের পেয়ে বলল, 'ঘুরবে তো ঘুরে এস। যেন চলে যেও না একলা-একলি। তাহলে ওরা যেতে পারবে না। এখানে থাকবে কোথা?'

তা ঠিক। এই ঘুপচি দোকানে জিনিসপত্তর সরিয়ে দুজন মানুষ শোবার ঠাঁই হবে না। তাও পুরুষ মানুষ হলে কথা ছিল। মেয়েমানুষ। গন্ধহরি বুঝল সমিস্যেটা আসলে কী। শালী মেলায় জামাইদার টাটে রাত কাটিয়ে গেলে বউয়ের কাছে ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকতেই পারে। গন্ধহরি ভিড়ের ভেতর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

দেখতে দেখতে কখন আলো জ্বলেছে মেলায়। এখন মেলার রূপ ভিন্ন। রাতের রহস্য ঘিরে ধরেছে বাঁজাডাঙায় শ্যামচাঁদের মন্দির চত্বরে চৈত্রমাসের এই

রঙঝলোমলো সমাবেশকে। গন্ধহরি মনে মনে পস্তায়। বারো আনা খরচ করে সেও ঢুকতে পারত সার্কেসের তাঁবুতে। কী এক গণ্ডগোল ঘটেছে মেলায় আসার পর। মন থিতু করতে পারছে না। সে দীঘির ধারে গিয়ে তাঁবুর পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিংহের ডাক শোনার অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। আবার ফিরল ভিড়ে। তারপর কী এক ইচ্ছার ঘোরে কিনে ফেলল এক বাকসো সিগারেট, একটা দেশলাই। মেলার বুঝি এই রীতি। যত কেনে. তত কেনার নেশা পেয়ে বসে। কিনল সে একঠোঙা জিলিপি। বাকি পয়সায় কিনে ফেলল হঠকারিতায় দুখিলি পান। একখিলি মুখে গুঁজল। অপরখিলি গামছার খুঁটে বাঁধল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিহ্বল গন্ধহরি নিজের পানরাঙা মুখ দেখতে থাকল। এলোমেলো চুল ঠিক করল। ভাবল, বনবাসীর কাছে ধারে একটা চিরুনি চাইবে কি? তার শালীকে আজ অন্ধকার রাতের মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ে পৌঁছে দেবে। বনবাসী কি দেবে এক একটা চিরুনি —ধারে?

গন্ধহরি আয়নায় নিজেকে বড় সুন্দর দেখল আজ। চিরুনিটা আগে কেন যে ছাই কিনল না! কী সহজে টাকাটা তার কেড়ে নিল শ্যামচাঁদের মেলা, অবিশ্বাস্য লাগে। নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। এ মেলার যেন রাক্ষুসে হা। সবস্ব গিলে খেতে চায়—রক্ত জল করা পয়সাকড়ি, যখের ধন। বনবাসীর দোকানের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ লজ্জায় পড়ে গেল গন্ধহরি। সে মাঠঘাটের মানুষ। চিরুনি ধারে চাইলে কী ভাববে বনবাসী? আর তার মুখে পানের রঙ! তার গামছায় বাঁধা সিগারেট-দেশলাই! বিব্রত হয়ে গন্ধহরি গেল কেষ্টযাত্রার আসরে। মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে লাগল। 'কী কিনি কী কিনি বলে খঞ্জনী বাজে। রাই কিনি কী কৃষ্ণ কিনি—খঞ্জনী বাজে।' গন্ধহরির পানরাঙা দাঁত থেকে হাসি ঝলমল করছিল। ঠিকই বলেছে বাপু! সেও তো সমিস্যে বটে। সিগারেট ধরিয়ে সুখে চোঁ চোঁ করে টানতে থাকে সে।···

এত ভাল আসরের গান মেলা ছাড়া শোনা যায় না। আসর ভাঙার মুখে যুগলমিলন গাইতে উঠেছে দোহারকি আর খোলবাজিয়েরা। মধ্যিখানে রাধাকৃষ্ণ। গন্ধহরির গা বাজল। দেরি হয়ে গেল বড্ড! বনবাসীর শালী এতক্ষণ মুখ চুন করে বুঝি বসে আছে। গন্ধহরি হন্তদন্ত পা বাড়াল।

মধ্যরাতে মেলায় এখন ঈষৎ ঝিমুনি। ভিড় কমছে। কোনো-কোনো দোকানে এরই মধ্যে ঝাঁপ পড়ে গেছে। শুধু চায়ের দোকানের বেঞ্চে কয়েকটা করে লোক। বনবাসী তার নির্জন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কোমর সোজা

করতে করতে নক্ষত্র দেখছিল। গন্ধহরি এসে বলল, 'গান শুনতে গিয়ে দেরি হল একটুকুন।'

বনবাসী বাঁকা মুখে বলল, 'তুমার এই স্বভাবের জন্যে মাইরি কত কষ্ট। এত করে বললাম তখন। ইদিকে রাত বাড়ছে। আর কতক্ষণ বসে থাকবে একবার ভাবোদিকিনি! চলে গেল।'

গন্ধহরি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কার সঙ্গে পাঠালে?'

'উ মেয়ে কি কারুর সঙ্গর ধার ধারে? ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বইতে পারবে না বলে একা হেরিকেন নিয়ে বেরুল। পথে পেয়ে যাবে কাউকে না কাউকে। কিন্তু হাজার হলেও মেয়ে তো বটে। উঠন্ত বয়েস।'

গন্ধহরি আস্তে বলল, 'কতক্ষণ গেল?'

'এই তো একটুখানি আগে। এখনও হয় তো মাঠে নামে নি।' বনবাসী ব্যস্তভাবে বলল। 'পা চালিয়ে যাও দিকিনি। পেয়ে যাবে। একলা-দোকলা মেয়েমানুষ। রাতবিরেতে মাঠের পথ। থাকলই বা হেরিকেনের আলো।'

কী সাহস ওই মেয়ের! টাটু ঘোড়ার মতো দৌড়ুচ্ছিল গন্ধহরি। দীঘির পাড় দিয়ে যাবার সময় সে প্রকৃতই সিংহের গর্জন শুনতে পেল। কিন্তু গ্রাহ্য করল না। তার দৃষ্টি অন্ধকার মাঠের দিকে। দূরে একটা আলো। আলোটা দুলছে। হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে। কালো বিশাল পর্দার ওপব একবিন্দু আশ্চর্য আলো টলটল করছে। এত বাড় ভাল নয় মেয়েমানুষের। গন্ধহরি ধুকুরধুকুর ছোটে। সে মাঠচরা মানুষ। আলপথে অন্ধকারে হাঁটতে তার পা ভুল করে না। কত অন্ধকারে সে মাঠে হেঁটেছে। কিন্তু এ অসম্ভব গোলমেলে রাত আর তার অন্ধকারে হাওয়ায় চারপাশে ফিসফিস কানাকানি। আকাশও নক্ষত্রের চোখে তাকিয়ে আছে গন্ধহরির দিকে। কী হয়, কী হয় উত্তেজনা। আলোটা স্থির হয়ে আছে এবং সে ছুটে চলেছে আলোর দিকে, নাকি সে দাঁড়িয়েই আছে এবং আলোটা দৌড়চ্ছে? কিছু বুঝতে পারে না গন্ধহরি। দূরত্বটা কিছুতে কমছে না। গন্ধহরি হাঁপায়। কতকাল ধরে এই পরিশ্রম, কত দিন মাস বছর আজন্ম এরকম অন্ধকার রাতের মাঠে ছোটাছুটি, হিসেব করতে পারে না। দূরের আলোর গায়ে নকশার মতো এক জোড়া নিটোল আলতাপরা পা। স্পষ্ট দেখতে পায় গন্ধহরি।

সে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ডাকে, 'হেই--ই-ই-ই!' জনহীন রাতের মাঠে চৈত্রের হাওয়ায় সেই ডাক ফিরে এসে তারই ওপর যন্ত্রণার মতো আছড়ে পড়ে। দুটো দেখনশিরি আলতাপরা পা ডোরাকাটা বাঘিনী শাড়ির নিচে ঝলমলিয়ে ওঠে মুহুর্মুহু। মাঠের মানুষটির ঠোঁটে পানের রস শুকিয়ে চড়চড় করে। গলা শুকিয়ে যায়। আচ্ছন্ন চোখে গন্ধহরি শুধু দূরের আলোর পটে আঁকা দুই পা রাঙা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। আবার দম নিয়ে সে প্রকৃত সিংহের মতো গর্জন করে, 'হই-ই-ই-ই!' আবার সেই চিৎকার চাবুকের মতো তার ওপর ফিরে এসে আছড়ে পড়ে। রাগে দুঃখে গন্ধহরি ছটফট করে।

কতক্ষণ পরে সে চমকে ওঠে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আলোটা নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে ভুলে যায় সে। আলোটা আর ফোটে না। কিছুতেই ফোটে না। গন্ধহরির আটকানো শ্বাসটা শব্দ করে বেরিয়ে যায়। মাথার ভেতর একটা ঝিমুনি আর চোখভরা অন্ধকার নিয়ে সে খুব আস্তে পা বাড়ায়। তাহলে কি একটা ভুল আলোর পেছনে সে এত বড় একটা মাঠে ছুটোছুটি করছিল? তার গা ছমছম করে। ভুল, না ঠিক? এখনও কি দূরের অন্ধকারে দুই আলতা রাঙা পায়ের ওঠাপড়া শেষ হয়নি?

গামছায় বাঁধা খিলি পান আর সিগারেট দেশলাই একবার আলতো হাতে ছোঁয় গন্ধহরি। জালেপির ঠোঙাটাও টিপে দেখে। খেয়ে দেয়ে পানটা মুখে পুরে একটা সিগারেট ধরাবে। বছরে এই একটা রাত বৈ তো নয়। সুখে দুঃখে গন্ধহরি গাঁয়ে ফেরে।

তাসের ঘরের মতো

দীপক মিত্র

বদ্দূর দৌড়েছি, দু পাশে কোন দরজা খোলা দেখিনি। কোন জানালাও না। কোন লোক না। থমথমে অন্ধকার। ভিজে রাস্তা। শহরে আচমকা ব্ল্যাক আউট যেন। এবং এত স্তব্ধতাও ভারি অস্বাভাবিক। যদিও রাত দশটা বেজে গেছে এবং পিছনের দিকে সাংঘাতিক কিছু সদ্য ঘটেছে, এই শহরটাকে ভয় পাইয়ে দিতে বা রুদ্ধবাক করতে তা মোটেও বেশি নয়। উত্তরোত্তর মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ছে, মাথার ঘিলু শক্ত হচ্ছে, এবং রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবুরা থলে হাতে পটলের দরাদরি করছেন—জুতোর নিচে টাটকা রক্ত। আর, রক্তের কোন ভাষা নেই।······

পিছনে দূরে—বেশ কিছুটা দূরে পায়ের শব্দ শুনে আরও জোরে দৌড়তে থাকলুম। জানি, এখন চেঁচিয়ে মাথা ভাঙলেও কোন দরজা খোলা হবে না কিংবা কোন জানালা খুলে কেউ মুখ বাড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবে না। সবাই এ দুঃসময়ে কাছিমের মতো নিজের খোলের ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং জীব-বিজ্ঞানে পড়েছি, কাছিমের কোন কণ্ঠস্বর নেই।

শহরের এদিকটা আমার পুরো অচেনা। দৌড়তে-দৌড়তে একটা মজার ব্যাপার টের পেলুম। বড়াই করে বলা হয় যে, অধুনা পৃথিবীর স্থলজলঅন্তরীক্ষে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই, যেখানে মানুষ না গেছে! কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনও এ পৃথিবী দূরের কথা এই শহরটায় অনেক জায়গা আছে যেখানে আজও আমার পা পড়েনি—যা আজও আমার কাছে অনাবিষ্কৃত! মানুষ নিয়ে বড়াইয়ে কী আসে-যায়। আমি—সাতাশ বছরের দুর্দান্ত যুবক দীপক মিত্র, আমি যে এখনও কত জায়গা দেখিনি সেখানে যাইনি, এবং কত কিছু অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে আমার কাছে—এবং এই দুর্ধর্ষ উত্তেজনাময় জীবন, বিপদসংকুল, যে-কোন মুহূর্তে আমি বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেতে পারি—যার জন্যে ইস্পাতের ছোট্ট একটি টুকরোই যথেষ্ট, এবং হায় আমার ব্যর্থ সাতাশটি বছর। পৃথিবী ও জীবনের অনেকখানি উন্মোচিত হবার আগে আমাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে কিংবা ফেলে দেওয়া হবে জলে, শকুন কুকুর কাকের খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত—হায় সুন্দর স্বাদু ফলের কোয়ার মতো আমার শরীর আমার যৌবন, আমার মন ⋯

সেইজন্যেই তো আমি পালাচ্ছিলুম। আমার সারা শরীর যৌবন এবং মন তাদের নিজ নিজ ভাষায় চিৎকার করছিল, পালিয়ে বেঁচে থাকো. পালিয়ে বেঁচে থাকো।

টের পাচ্ছিলুম, ওরা এখনও আমার আশা ছাড়েনি। আমাকে খতম না করতে পারলে ওদের স্বস্তি নেই। ওরা সমানে আমাকে অনুসরণ করছে। এবং আজ এই বিপদের রাতে শহরটাও আশ্চর্যরকম বদলে গেছে—সভ্যতার সাজানো বাগান হয়ে পড়েছে প্রাক্‌-ইতিহাসের জমজমাট অরণ্য। সব স্কাইস্ক্র্যাপার তাদের আলখেল্লা ত্রস্তে খুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল গাছ। এবং সব রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবু হামাগুড়ি দিতে দিতে অন্ধকারে সেই আদিমতম স্বর্গীয় গাছটার গোড়া খুঁজছে—যার ফল খেয়ে মনুষ্যজাতির অশেষ দুর্গতি, ওঁদের হাতে আজ সেই প্যাকেটে মোড়া ছোট ছোট তিনটি কুঠার—যার একটির বিজ্ঞাপিত দাম মাত্র পাঁচ পয়সা!

এইবার সামনে একটা তেরাস্তা পাওয়া গেল। ডাইনে না বাঁয়ে যাবো—কয়েক মুহূর্তের ইতস্তত করা—তারপর বিচ্ছিরি আওয়াজে কান কালা হয়ে গেল। ওরা আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে। আশ্চর্য, স্প্লিন্টারের জোনাকিজ্বলা দেখবার জন্যে বার বার এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরাচ্ছিলুম। বিপদের সময়ও আমাদের নির্বোধ শিশুত্ব ঠিক কাজ করে যায়।

পরক্ষণেই একলাফে বাঁ দিকে চলে গেলুম। তারপর উঁচুতে একটু আলো চোখে পড়ল। একটা জানালা খুলে কোন দুঃসাহসী মুখ—আবদ্ধ একটা গরিলা যেন রডে নাক ঘষছে। বাড়িটা সুনসান। গেটের ওপর চাপ-বাঁধা লতাপাতার ছাউনি। কী ফুলের গন্ধ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মগজে ঢুকে যাচ্ছিল। বুকসমান উঁচু গেটের কপাট পেরিয়ে যখন ওপারে ভিতরে পৌঁছলুম, কিছু নিরাপত্তার স্বস্তি এল। তারপর মনে হল, সচরাচর এসব বাড়িতে কুকুর থাকে। বাইরে ফলকে লেখা থাকে : কুকুর আছে, সাবধান। কিন্তু ভেতরে ঢুকেও যখন কোন ক্রুদ্ধ গর্জন শুনছিনে, তখন নিঃসন্দেহে এ বাড়িতে কোন কুকুর নেই। কিংবা থাকলেও, এখন সেটা ঘরবন্দী।

কয়েকটা মিনিট একটু জিরিয়ে নিলুম। বাইরে আর কোন আওয়াজ নেই। ওরা সম্ভবত অন্য অন্য গলিতে ছুটোছুটি করে আমাকে খুঁজছে। খুঁজুক, আপাতত আমি কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত। ওপারের খোলা জানালার আবছা আলোয় ভিতরটা দেখে নিলুম। এক চিলতে লন—দু পাশে কিছু, গাছপালা।- ফুলবাগিচা। আর অন্ধকার এই বিপজ্জনক এলাকায় দুঃসময়ে হাসনাহানার সাহস! দুঃসাহস! রাগে বিরক্তিতে মেজাজ খারাপ হল। এটা ঠিক নয়, এসব ঠিক নয়। ইচ্ছে করল শহরের তাবৎ ফুলগাছকে থাপ্পড় মেরে বলি, চুপ করো! পাখিদের ধমকাই, খবরদার এসো না! প্রেমিক প্রেমিকাদের শাসাই। স্বামীস্ত্রীদের পাশাপাশি শুতে নিষেধ করি। এবং কারিগরগণ নিপাত যাও··· এনজিনিসারগণ হাত ওঠাও, বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্রাম করো।

সেই সময় দূরে কোথাও বুম বুম আওয়াজ হল ফের। ঘর বাড়ি কেঁপে উঠল। গাড়ির ঘর্ঘর গোঁ গোঁ গর্জন শোনা গেল। প্রচণ্ড উজ্জ্বল আলোর ঝলক এসে ফের অন্ধকারে মিশে গেল বাইরে। পুলিস নির্ঘাত! এতক্ষণে পুলিস এসে গেছে!

এক লাফে সরে এলুম। সামনে চওড়া সিঁড়ি। বেড়ার গড়নের বড় দরজাটা খোলা। তার মানে এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। বেওয়ারিশ সম্পত্তির মতো। সিঁড়ির

মুখের দরজাটা, রামবাবু ভাবেন শ্যামবাবু আটকে দেবেন—শ্যামবাবু ভাবেন যতুবাবু এবং দারোয়ান যদি বা থাকে সে নেশায় বুঁদ। সে আছে। সিঁড়ির ধাপের এক পাশে চোরকুঠরি মতো—সেখানে খাটিয়ায় নির্ঘাত সেই গুন্ধ লোকটাই বটে। কয়েক ধাপ চুপিচুপি উঠে দেখলুম দোতালার সিঁড়ির মাথায় একটা বালব জ্বলছে। বালবটা কালিঝুলি মাখা। প্রথমে গেট ফুলগাছ ইত্যাদি দেখে ভেবে ছিলুম, বাড়িটা চমৎকার এবং পরিচ্ছন্ন হবে—কিন্তু ক্রমশ তার বার্ধক্য, জীর্ণতা ও অবহেলার চিহ্নগুলো চোখে পড়তে লাগল। যত উপরে উঠছি তত মনে হচ্ছে কোন অস্বস্তিকর পোড়ো জায়গায় আমি ঢুকে পড়েছি। দোতলার চারটে দরজায় তালা ঝুলছিল। দল বেঁধে কোথায় চলে গেছে ওরা? তেতলার তিন দিকে তিনটে দরজা। ওপরের বাতিটাও তেমনি অপরিষ্কার। এখানেও দুটো দরজায় তালা ঝুলছে—একটা বাদে। তাহলে এই ঘরের জানালাতে সেই গরিলাটা দেখেছিলুম। একা না সপরিবারে থাকে ও? আশ্চর্য কোন ফ্ল্যাটে কোন নেমপ্লেট নেই! কোন কলিং বেল নেই। দেয়ালে লাল ও কালিতে লেখা অজস্র কথা—যে কথা আমার এবং সবার সবিশেষ মুখস্থ। এবার গা ছমছম করে উঠল। হয়তো আমার পক্ষে নিরাপদ নয় জায়গাটা। হযতো যেচে পড়ে স্বয়ং "ওদের" কারো খপ্পরেই ঢুকতে যাচ্ছি।

মরীয়া হতে হল। উপায় নেই। পকেটে হাত ভরে পয়েণ্ট ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবারটা চেপে ধরলুম। একটা মাত্র গুলি আছে আর। সেই যথেষ্ট। অন্তত কয়েকটি ঘণ্টা আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে নিরাপদে—পরবর্তী আরও অনেক অনেক ঘণ্টা দিন মাস বছর বেঁচে থাকবার জন্যে। এবং সেটা আমার পক্ষে ভারি জরুরী। হায় আমার সাতাশটি ব্যর্থ বছর! সে বিমুগ্ধ বেড়াল ছানার মতো আমার ভিতরে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

খুবই চাপা কড়া নাড়লুম। দুবার। তারপর আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।···

হিরণ্ময় দত্তরায়

·····কী ব্যাপার? ফের আলো গেল! সারা বর্ষা এ উপদ্রব সমানে চলবে। মোমবাতি কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে গেলুম। কর্পোরেশন······

সেই সময় বউমা দৌড়ে এল।··· ··শুনছেন? আজ রাতে ফের শুরু হল।

লাফিয়ে উঠলুম। কী, কী শুরু হল বউমা?

রানু কি বিরক্ত হল আমার ওপর? আসলে আমার কান দুটোকে বয়স ক্রমশ ক্ষয় করে ফেলছে—ঠিক চোখদুটোর মতোই—ওর জানা উচিত হয়তো

জানে, তবু বিরক্ত হয়। আমি জানি, রানু দিনে দিনে ক্রমশ বেশি বিরক্ত হয়ে পড়ছে আমার প্রতি। আমার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা, ছটফটানি, জানলা খুলে দিনরাত্তির নিচের পথটা লক্ষ্য করা এবং আচমকা কে ডাকল বলে দরজার দিকে ছুটে যাওয়া—সবই ওর পক্ষে বিরক্তিকর ঠেকছে। আমি টের পাচ্ছি এগুলো। বিশেষ করে বসবার ঘরে সৌমেনের ছবিটা রাখা তার পছন্দ হচ্ছে না। সৌমেনের সাম্প্রতিক ছবি বলতে এই একটাই—বেশ বড়ো সাইজ এবং একলা। তাছাড়া তার যত ছবি আছে তা অনেক আগের এবং কিছু কিছু বউমার সঙ্গে তোলা ছবি। সেগুলো ফ্যামিলি অ্যালবামে রয়েছে। অ্যালবামটা কখনও নিজের ঘরে রাখি, কখনও রানুকে দিই বা সে নিজেই চেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে বর্তমানের সৌমেনকে তো পাই না। ইদানীং তার কপালে ভাঁজ পড়ছিল। চোয়াল ঠেলে উঠছিল। তার লাবণ্যটা ক্ষয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। চোখ দুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল হচ্ছিল দিনে দিনে। এবং ওই নতুন ছবিতে তার সবটুকুই ধরা পড়ছিল। সৌমেন, আমার একমাত্র সন্তান, বড় আদরের ওই সৌমেন! ঈশ্বরকে বলছিলুম ওর সবটুকু জ্বালা আর উত্তাপ আমাকে দাও! পৃথিবীর অনেক শত্রুশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এ বুড়ো মানুষটির আছে। অনেক দুর্দান্ত বিষয়সমূহ আমার দেখা আছে। অনেক ভয়ঙ্কর উত্তাপ, আলো ফেটে বেরিয়ে-পড়া বিধ্বংসী আগুন, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগ, অভাবিত দৈত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কত দুঃসময় না গেছে! এবং আমি সব সয়ে বা জয় করে আজও টিকে রয়েছি। তাই যা কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা উত্তাপ আধিব্যাধি আমার সইতে কষ্ট হবে না। কিন্তু সৌমেন! ওর জীবনটা তরুণ, নবীন ওর প্রাণ—ওর আত্মায় বড় কোমলতা। পৃথিবীর প্রতি অনেক প্রত্যাশা ওর। জীবনকে অনেক দুর্মর মায়ায় সে গভীরতর স্বপ্নের দিকে চলেছিল। আমি প্রার্থনা করতুম, ওর কষ্টটা আমাকে দাও—ওর যা কিছু সুখ তা ওরই থাক। অথচ·········

ছবির কথা বলছিলুম। এই ছবিটা সে হঠাৎ কেন তুলেছিল, তখন টের পাইনি, পরে যেন পেয়ে গেলুম। এ ছিল ওর চলে যাওয়ার সময় সান্ত্বনা পেতে দিয়ে যাওয়া একটা তাজা স্মৃতি! তার বাবা এবং স্ত্রীকে সে ইচ্ছে করেই এটুকু শুধু দিয়ে গেল যেন। যেন বলে গেল ওই নিয়েই বেঁচে থাকো।

হ্যাঁ, আমি বাহাত্তরের বুড়োমানুষ—আমি পারি শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে। এখন তো আমার মতো সবাই শুধু স্মৃতি নিয়েই বাঁচে। কিন্তু বউমা রানু? সে পারে না। তার রক্তমাংস মনের সব কাজ যে এখনও

অসমাপ্ত! সে চায় সৌমেনের রক্তমাংস—সে চায় তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বটা, পরোক্ষ কিছু নয়। তাই রান্থর কষ্টটা কী, তাও আমি জানি! জানি, সে অক্ষম রাগে ছটফট করে। সে তার স্বামীকে অভিশাপ ছ্যায়। মাথা কুটে গাল ছ্যায়। সে হয়তো তাকে কাপুরুষ ভাবে। তবু রান্থকে দোষ দিই নে। সত্যি তো, এমন করে পালাবে যদি তাহলে বিয়ে করেছিল কেন সৌমেন? তার বউ তার নিজেরই পছন্দ এবং আমি কিছু জানতে পারিনি। পরে জেনে বরং খুশি হয়েছিলুম। বউমাকে সাদরে ঠাঁই দিয়েছিলুম।······আর এর পর যদি রান্থ রাগের বশে কারো সঙ্গে······

সেটা অসম্ভব লাগে। আজকাল মেয়েদের মধ্যে রক্তমাংস-ইচ্ছায় তীব্র হয়ে ওঠাটা আমি লক্ষ্য করেছি। ওই যে কী বলে, সেক্স—যৌনতা, জেনে বা না জেনে তারা তার শিকার হয়ে উঠছে—আধুনিকতা মানেই নাকি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—সভ্যতা ক্রমশ তাদের শেখাচ্ছে নতুন-নতুন নিয়মকানুন এবং যৌনতাকে মুক্ত করে দেবার সঙ্গেই নাকি মানুষের আত্মিক মুক্তির ব্যাপারটা জড়িয়ে রয়েছে······যাই হোক, রান্থ বউমার মধ্যে এ ঝোঁকটা সংক্রামিত নয় সম্ভবত। তাছাড়া তার বংশ, শিক্ষাদীক্ষা, ব্যক্তিত্ব—আমার ভরসা রাখার পক্ষে যথেষ্টই। তবে তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া জাগা তো খুবই স্বাভাবিক। আমি নচ্ছার সেকেলে গৃহস্থ নই যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুণ্ডুপাত করব। সৌমেন যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তক্ষুনি রান্থর বাবা যাই বলুক ফের তার বিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করবই। অবশ্য রান্থর মতামতের ওপর নির্ভর করবে সেটা।

আরে তাইতো! কী ভাবছি! আমার বুক ধড়াস করে উঠল। পা দুটো অসম্ভব ভারি লাগল। কাঁপুনি এল। সৌমেন, আমার একমাত্র সন্তান সৌমেন! আমি কি তাহলে ইচ্ছার অজানতে তার মৃত্যু কামনা করি? না না—যেখানেই থাক্ বেঁচে থাক। সে যা খুশি করুক, আমার কোন আপত্তি নেই আর—শুধু বেঁচে থাকুক। আজ অব্দি কত বিজ্ঞাপন দিলুম কাগজে, ছবি ছাপলুম, থানায় থানায় জানানো হল, অসনাক্তকৃত সব লাশের শুধু ছবি নয়—প্রত্যক্ষে গিয়ে দেখে এলুম—কতবার কতজনের লাশে সৌমেনকে ভুল দেখলুম। কিছুদিন আগে ন'টা লাশের একটায় ওকে খুঁজে পাওয়ার পরক্ষণে আরেক দাবিদার এসে বলল, এ তার মৃগাঙ্ক। অনেক ঝামেলা, পরীক্ষা, বিতর্ক—হাল ছেড়ে সরে এলম—হ্যাঁ ও মৃগাঙ্কই। সৌমেন নয়।···

তাই মনে হয়, সে পুলিসের ভয়ে কোন কারণে গা ঢাকা দিয়েছে। সে শিগগির এক সময় দেখা দিয়ে যাবে তার বাবা আর স্ত্রীকে। সে আসবেই। কারণ তার মতো ছেলের পক্ষে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যাওয়া খুব জরুরী। হয়তো চিঠি লেখার অসুবিধে আছে কিংবা চিঠিতে সব বলা যাবে না—সেটা বিপজ্জনকও হতে পারে ; তাই সে আসবে মুখোমুখি কৈফিয়ৎ দিতে। হয়তো চুপিচুপি এসে কড়া নাড়বে যখন হঠাৎ এমনি ইলেকট্রিসিটি ফেল, অন্ধকার রাত, মধ্যরাত, নির্জন পথঘাট, বৃষ্টি, ঝড়ো বাতাস বইছে—ভিজে পোশাকে সে চুপিচুপি উঠে আসবে তেতলায়। সে লক্ষ্য করবে, এ বাড়ির সব ফ্ল্যাটে তালাচাবি—সবাই পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে, কী চমৎকার নির্জনতা সে পেয়ে যাবে···

হ্যাঁ, তাই দারোয়ানকে বলে রেখেছি সিঁড়ির দরজাটা দিনরাত্তির যেন খোলা রাখে। লোকটা ভীতু কিন্তু হৃদয়বান। হৃদয়বত্তা তাকে সিঁড়ির দরজাটা খোলা রাখতে বাধ্য করে—কেবল ভীরুতা তাকে গেটের সদর কপাট দুটো বন্ধ করে দিতে হুকুম গ্যায়। এবং একটা জানালা খুলে আমি তাকিয়ে থাকি রাস্তার দিকে—সারা রাত—সারাটি রাত। আমার ঘুম আসে না। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে, সে যদি বা আসে—আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা পাবে, (ছেলেবেলায় বড অকারণে সৌমেন আমাকে কী ভয় না করত।) রানু দরজা খুলে দেবে—রানুর ঘরে চলে যাবে সে—এবং···

রানু চলে গেল কখন ? কী সব হচ্ছে বলছিল না ? তাই তো ! এলাকার সম্ভবত কোন প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটা জখম করে দিয়ে কারা কী সব করছে যে ! বার বার বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে। কাদের সঙ্গে কাদের মারামারি হয় কে জানে। আমি কোন খবর রাখিনে। খবর না রাখাটাই আমার কাল হয়েছে হয়তো। আমার ছেলের খবরও তো আমি রাখতুম না—রাখিনি, তাই এই যন্ত্রণা সইতে হল !

আমাকে ফের জানালায় যেতে হবে। রানু এসে সরিয়ে দিয়েছে আমার জায়গা থেকে। আরে বাঃ ! আলো জ্বলে উঠল ! এতক্ষণ যদি সৌমেন রাস্তায় এসে থাকে—আমি নির্ঘাত তাকে মিস করেছি। তাহলে এতক্ষণে সে সিঁড়ির ধাপে—চুপিচুপি উঠছে—কড়া নাড়লে ধীরে, চাপা, হয়তো ডাকবে—রানুর নাম ধরেই ডাকবে। ডাকুক, আমি সব টের পেয়ে যাব।···

রাম্মু দত্তরায়

একটা রাতও রেহাই পায় না ওদের কাছে। ওই, আবার শুরু হল তাণ্ডব। হয়তো আজ সারা রাত ধরে এসব চলবে। বার বার ঘুমের রেশ কেটে যাবে। রাগ হতে-হতে রাগ হতে-হতে ক্লান্ত হবে এবং ক্লান্ত হতে-হতে ক্লান্ত হতে-হতে দুর্বল হবে। কান্না পাবে। কিন্তু আজ সব কান্নাই যে নিজের কাছে লজ্জা। আত্ম-ধিক্কার এবং গ্লানির ব্যাপার। নিজের অসহায়তা যখন পুরোপুরি ধরা পড়ে যায় তখন মানুষ অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার ঠাণ্ডা হবার কথা। কিন্তু পারছিনে। ওরা কারা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনে—শুধু মনে হয়, ওদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর জ্বালার প্রদাহ আছে এবং সেই প্রদাহ হঠাৎ হঠাৎ চরমতায় ফেটে পড়ে কারো-কারো ওপর। তাকে গ্রাস করে নেয়। আমার স্বামীকেও গ্রাস করে নিয়েছে। আর এখানেই আমার সান্ত্বনা যত রাগও তত। সান্ত্বনা কারণ আমার মতো আরও কত মেয়ের স্বামী বাবা বা সন্তান এমনি করে তার মুখে পড়ছে। কারণ আমরা কিছু করতে পারছিনে। কমাস আগে এত বড কারখানাটা বন্ধ হয়ে আমার স্বামীর চাকরি গেল। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। সংসারে টান ধরল। আমার ভোগীপ্রকৃতির শ্বশুর সঞ্চয়ে পটু ছিলেন না। তাঁর পেনশনের টাকায় চলে হয়তো যাচ্ছে, কিন্তু এ কি মানুষের বেঁচে থাকা? বাইরে বেরিয়ে কিছু একটা যোগাড় করে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার কষ্ট হয়। ভিতরটা ছটপট করে। শ্বশুরমশাই আবার বড্ড গোঁড়া আর সংকীর্ণমনা। হয়তো প্রচণ্ড রকমের ভীতুও। স্বামীর জন্যে অনেক ছুটোছুটি করব ঠিক করেছিলাম। হয়তো ঠিকই তার খোঁজ পেয়ে যেতুম—কিন্তু শ্বশুরমশাই আমাকে কোথাও একা যেতে দেবেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা একটা বন্দিত্ব। একটা খাঁচায় আটকে গেছি নিজের অজানতে। আর ওই স্বার্থপর বুড়োটা আমাকে তার শূন্য সিন্দুকের ওপর যখ বসিয়ে রেখেছে।

নাঃ আর পারছিনে। অসহ্য লাগছে। এবার আমি পালাবই, পালাব। কেন আর এখানে থাকব শুনি? এই শূন্যতা আর মিথ্যে প্রতীক্ষা, এই একঘেয়ে দিনরাত্তির···ওঃ! তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে সব ভাড়াটে পরিবারগুলো পালিয়ে গেল একে একে। পাড়াটাও নাকি খালি হয়ে যাচ্ছে। শুধু পড়ে রয়েছে কিছু বুড়োবুড়ি আর কিছু কাচ্চাবাচ্চা! মাঝে মাঝে শুধু ওই বোমা ফাটার আওয়াজ,

গুলির শব্দ, অস্পষ্ট দু-চারবার গর্জন বা আর্তনাদ ছাড়া বিকট স্তব্ধতা সব সময় স্থির হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ বা কারা সাঁৎ সাঁৎ করে চলে যায় রাস্তায়। আর কোন লোক নেই! এই নিঃঝুম যক্ষপুরীর মধ্যে আমার বাইশ বছরের তাজা প্রাণটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি থাকব না—পালাবই পালাব।

কিন্তু যাবো কোথায়? বাবা-মা আমার ওপর ভিতরে-ভিতরে চটে আছেন। তাঁদের মনোনীত পাত্রকে আমি অপমান করেছি। তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যকে চুপিচুপি বিয়ে করে ফেললুম। রেজেষ্ট্রির পর সব জানিয়ে দিলুম দুপক্ষকে। আমার বাড়িতে বেশ কিছুদিন ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটে গেল। আমার স্বামীর বাড়িতে অবশ্য তেমন কিছু ঘটলই না। ঘটত—যদি আমার শাশুড়ী বেঁচে থাকতেন। কারণ এসব ক্ষেত্রে মেয়েরাই তো মেয়েদের বড়ো শত্রু। আমার মা-ই আমার বড়ো শত্রু আমি জানি। তাই ওবাড়ি চলে যাবার কথা আর ওঠেই না। শত্রু হাসবে। আর কোথায় যাবো তাহলে? আমি খুঁজে মনে মনে ভাবি, ভাবতে ভাবতে দিনরাত্রি কেটে যায়। তবু আমি পালাবই পালাব। আঃ আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যাবো। না না—বেঁচে থাকতে চাই।·· ···

যাবার আগে ও কোন কথা বলে যায়নি। হঠাৎ এক বিকেলে বেরিয়ে গেল চা খেয়ে। কেমন গুম হয়ে ছিল সারাটা দিন। ইদানী' খুব সহজে ও বিরক্ত হত বলে আমি আর কোন প্রশ্ন করতুম না ওকে। কেমন খটরাগী আর বদমেজাজী হয়ে পড়ছিল ও। ভাবতুম চাকরি-বাকরির ব্যাপারে ও উদ্বিগ্ন। খুব কম কথা বলত। চুপচাপ বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে। ফেরার কোন ঠিক ছিল না। শ্বশুরমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফিরে এসে তাঁকে কিছু কৈফিয়ৎ দিত। আমাকে দিত না। তার দরকারও ছিল না। রাতের দিকে ওর কাছ ঘেঁষে যেতুম। ওর স্পর্শ পেতে চাইতুম। আমার রক্তমাংস চঞ্চল হয়ে উঠত অভ্যাসে। ও আস্তে ঠেলে পাশ ফিরে বলত, গরম বড্ড। একটু সরে শোও তো রানু!

আমার কান্না পেত। তবে কি আমার ওপর ও কোন কারণে রাগ করেছে? মিথ্যে সন্দেহ? অবিশ্বাস কিছু? কেউ কি ওর কান ভারি করেছে? কিন্তু ঈশ্বর জানেন, মনে না হই—দেহে তো আমি নিষ্পাপ। আমি কাঁদতুম চুপি চুপি।

আশ্চর্য, ও ঠিকই টের পেয়ে যেত। হঠাৎ ঘুরে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত আর বলত, না রানু না—তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। কারো

ওপর নেই। আমার সব রাগ দুঃখ নিজের ওপরে। নিজেকে আমি আর সইতে পারছিনে। তুমি বিশ্বাস করো—আমার বড় জ্বালা রানু, অসম্ভব জ্বালা।

আমি নারীর স্বাভাবিক প্রেরণাদাত্রী ভূমিকায় বলতুম, তোমার সব জ্বালা আমাকে দাও।

পাগল!···বলে ও চুপ করে যেত। জড়িয়ে ধরা বাহু শিথিল হয়ে যেত। তারপর ও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত।

জানতুম ও তাকিয়ে আছে। কিছু ভাবছে। বলতুম, কী হয়েছে বলবে না লক্ষ্মীটি? তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বলো।

ও কোন জবাব দিত না। কখনও বলত, কিছু না।

ভাবতুম, ওর যত কষ্ট সবটাই নিছক টাকা-পয়সা সংক্রান্ত। বেকারদের হয়তো এমনি সব হয়। বলতুম, ভেবো না—একটা কিছু পেয়ে যাবেই।···

চলে যাবার আগের রাতে—যেন ঘুমের ঘোরে কয়েকবার একটা কথা উচ্চারণ করেছিল। আমি তখনও ঘুমোইনি, কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিলাম? এক ঝলক রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল হৃৎপিণ্ডে। কী বলছে ও?···

ট্রেটর···আমি ট্রেটর···ওঃ আমি ট্রেটর···

কী যেন বুঝলুম—অথবা বুঝলুম না। ওর রহস্যময় কালো পর্দাটা হঠাৎ যেন কিছু ফাঁক হয়ে গেল। অথবা সবই আমার ভুল ধারণা, ভুল শোনা। আমার রক্ত তবু এত হিম হয়ে গেল, উরু ভারি হল, ক্রমে মাথার ভিতরটা বরফ হতে থাকল। নিঃসাড় পড়ে রইলুম।

কথাটা আজও শ্বশুরমশাইকে বলিনি। বলা সঙ্গত মনে করিনি। আমি জানি কী ঘটেছে। মিথ্যে শাঁখাসিঁদুর আর সধবার বেশ আমার মিথ্যে বউ সেজে থাকা অন্যের সংসারে—ওর আর ফেরা হবে না।

তবু রক্তের ভিতর প্রতীক্ষার কাঁটা খচখচ করে ওঠে। সিঁড়ির বিশাল খোলে ঘুরপাক খায় হাওয়া। শব্দ ওঠে কড়া নাড়ার মতো লাগে। ধড়মড় করে উঠে বসি। ছুটে যাই দরজার দিকে। দরজা খুলতে গিয়ে ঠিক করে নিই, ঠিক কী বলব। তারপর খুলি। আবছায় হলুদ কিছু রেখা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যায়। নিছক শূন্যতার কাঁপন থেকে ফুরিয়ে যায় একটা প্রতিভাস। আর পিছনে দৌড়ে আসেন শ্বশুরমশাই। অস্ফুট কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলেন, এল? না? কে? বউমা, ও বউমা! কথা বলছ না কেন?

আমি কী বলব? শুধু বলি, বাতাস। সরে আসি।. পিছু ফিরতেই বসবার ঘরে ওই ছবিটা চোখে পড়ে। রাগে ক্ষোভে দুঃখে ওটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। যে নেই, তার নিশ্চল প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ট্রেটর। বিশ্বাসহন্তা।···

দীপক মিত্র

যে দরজা খুলল তাকে আমি চিনিনে। কিন্তু তার শরীরের পাশ দিয়ে ঘরের ভিতর উঁচু টুলে রাখা মস্তো ছবিটা কার জানি। তাকে ভালই চিনি। মুহূর্তে আমার মাথার ভিতর আগুন দপ করে উঠল। কান দিয়ে গরম গ্যাস বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো ফুলে উঠল। সৌমেন! এই সৌমেনের ঘর এবং অবশেষে এখানেই আমি এসে পড়েছি!

আমার চমকটা এই মহিলার চোখে পড়ল কি না বুঝলুম না। কিন্তু উনিও আমাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। কাঁপানো গলায়—একপা পিছিয়ে বললেন, কা-কাকে চাই?

সামলে নিয়েছিলুম। ঠাণ্ডা স্বরে বললুম, আজ রাতের মতো এখানে থাকব। চেঁচামেচি করবেন না। কোন লাভ হবে না। কোন ক্ষতি করব না আপনাদের। শুধু এই রাতটা···

আশ্চর্য, সরে পিছিয়ে গেলেন মহিলাটি। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলুম। এগিয়ে গিয়ে ধুপ করে বসে পড়লুম। বললুম, এক গ্লাস জল দিন। স্রেফ জল। এত রাতে আর খাবার জন্যে উত্ত্যক্ত করব না। একটা মাদুর থাকলে দেবেন। এখানেই শোব।

কোন কথা বললেন না উনি। সৌমেনের বউ! তাহলে কি এরা এখনও খবরটা পায়নি?

পকেটে হাত রেখেছিলুম—পাছে গোলমাল করলে ওটা বের করে ভয় পাইয়ে দিতে হয়। দরকার হবে না। হাত বের করলুম। ঘরের ভিতরটা লক্ষ করছিলুম। দুপাশে দুটো ঘর। ময়লা ছেঁড়া পর্দা দরজায়। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই এঘরে। একটা র‍্যাকে কিছু বই। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার। আর টুলে সৌমেনের ছবিটা। ছবিটার দিকে

তাকাতে ভয় হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখনও সৌমেন বলছে, তোর চেহারায় কোন খুনীর আদল নেই। তোকে ভয় করিনে, দীপু।...

খুব শিগগির জল এসে গেল। ওঁর দিকে না তাকিয়ে ঢকঢক করে জল খেলুম। তারপর গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিলুম নিচে, উনি হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন। চলে যাচ্ছিলেন, আমি ডেকে বললুম, শুনুন!

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঘরে আর কে সব আছে?

আমি আর বাবা।

ওই ছবি যার—সে কোথায়?

জানিনে।

আপনি কে?

বাড়ির বউ।

ওই ছবিটা তাহলে আপনার স্বামীর?

হুঁ।

একটু চুপ করে থাকলুম।

সৌমেনের বউ বলল, আর কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ—যাঁকে বাবা বললেন, তিনি আপনার শ্বশুরমশাই নিশ্চয়?

হুঁ।

আপনার স্বামী নেই কেন?

জানিনে।...আপনাকে বিছানা এনে দিই।

চলে যাচ্ছিল সৌমেনের বউ। ঠিক তক্ষুনি পাশের ঘরের পর্দা তুলে আচমকা সেই জানালায় দেখা বুড়ো গরিলাটা এসে পড়ল।...কে কে এসেছে? সমু? ...কে কে তুমি? কে আপনি? কথা বলছেন না কেন? বউমা, কে এ?

সৌমেনের বউ বলল, আঃ চুপ করুন বাবা। উনি আপনার ছেলের বন্ধু—ওর খবর এনেছেন।

আমি চমকে উঠলুম। হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে থাকল। ও কি সব জেনে শুনে বলছে—নাকি নির্বোধ শ্বশুরকে উত্ত্যক্ত করতে চাইছে না? ওর দিকে তাকালুম। কী নিষ্পলক চাহনি, কী উজ্জ্বলতা। আর ঠোঁটের কোণায় ওই চুপিচুপি হাসির রেখাটা কেন? আমার রিভলবারটা হয়তো পকেটের ভিতর মরচে ধরে জ্যাম হয়ে গেল। নষ্ট ট্রিগার তার। শেষ গুলিটা ভিজে।

চাপা গলায় বুড়ো লোকটি ঝুঁকে এল। সমু কেমন আছে বাবা? কোথায় আছে সে? কী করছে! একেবারে ছেলেমানুষ বরাবর! ভয় পাবার কী ছিল এত? আমি পুলিসের বড়কর্তার কাছে যেতুম—আমি রিটায়ার্ড গভমেণ্ট অফিসার—

বাধা দিয়ে বললুম, ওর ভয় পুলিসকে নয়। আপনার ছেলে ছিল ট্রেটর—বিশ্বাসঘাতক। তাই···

খবর্দার! বুড়ো গরিলাটা গর্জে উঠল।

আমি হাসলুম।···আপনার বউমাকে জিগ্যেস করুন।

সৌমেনের বউ আমাকে অবাক করে বলল, হ্যাঁ বাবা। উনি ঠিকই বলেছেন।

অসম্ভব! এ লোকটা মিথ্যেবাদী···বুড়ো চেঁচামেচি শুরু করল।··· মিথ্যুক, বদমাস জোচ্চোর সব! আমি কাকেও বিশ্বাস করিনে। সবাই ট্রেটর! সবাই বিশ্বাসঘাতক।

সৌমেনের বউ এগিয়ে এসে বলল, আঃ কী হচ্ছে বাবা! চুপ করুন।

বুড়ো আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে বলল, এক্ষুনি চলে যান আপনি। কে বলেছিল এ মিথ্যে খবর দিতে? চলে যান বলছি। আমার সমু বিশ্বাসঘাতক?···

এবার পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে উঠে দাঁড়ালুম।···বেশি চেঁচাবেন না। যান, নিজের ঘরে চলে যান। আমি রাত্তিরটা এখানে থাকব। উত্ত্যক্ত করলে প্রাণটা খোয়াবেন বলে দিচ্ছি।···দেখুন, আপনার শ্বশুরকে নিয়ে যান তো ও ঘরে। আমার মাথার কিছু ঠিক নেই। এই ওল্ড ফুল। চুপ! ডোণ্ট শাউণ্ট।

বুড়ো কয়েক মুহূর্ত আমার অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে দুহাতে মুখ ঢাকল। কেঁদে ফেলল। বসে পড়ল। জড়ানো স্বরে বলল, মারো—আমাকে বরং মেরেই ফেলো। সমুর কী হয়েছে এবার বেশ বুঝতে পারছি। আমার বেঁচে কোন লাভ নেই।

সৌমেনের বউ শ্বশুরকে সামলাচ্ছিল। এবার অদ্ভুত হাসল সে।···কী হল? পারবেন না? গুলি নেই আর? নাকি খেলনার জিনিস? ভীতু! বুঝতে পারছি, ওই যথেষ্ট। আসলে আপনি আর খোলস ছেড়ে বেরোতে পারছেন না। তাড়া খেয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই না?

রাগে আমার মাথার ঠিক ছিল না। বললুম, সৌমেনের মতো ছেলের জন্ম যে দিয়েছে, আমার ঘৃণা তার ওপরই বেশি। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত—শুধু একটু আশ্রয় আর একটুখানি ঘুমের বদলে সব দিতে পারি।

বুড়োকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে গেল ও। তারপর ফিরে এল। নিজের ঘরে গেল। বিছানা নিয়ে এল। মেঝেয় পরিপাটি বিছিয়ে দিয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন। আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ। আর···

বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বললুম, থামলেন কেন? আর?

আপনাকে ধন্যবাদ।···বলে দ্রুত ঘরে চলে গেল সৌমেনের বউ।

আমার ঘুম এল না। ওই ছবিটা! সৌমেন! খালের ধারে তার শ্বাসনালীটা আমিই কেটে দিয়েছিলুম। লাশটা পুড়িয়ে ফেলেছিলুম। এবং আবছা শব্দে অনুমান করছি ওঘরে কী ঘটছে। যেটুকু কাজ বাকি ছিল তা নিষ্পন্ন হচ্ছে চুপিসাড়ে। সৌমনের বউ শাঁখা ভাঙছে। সিঁদুর মুছছে। বাকসো থেকে সৌমেনের ধুতি বের করে পরছে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ বাড়ছে ধূপের ধোঁওয়ার মতো, কুয়াশার মতো, সর্বগ্রাসী সঞ্চরণশীল সেই বিলাপ আস্তে আস্তে দরজার ফাটল দিয়ে এগিয়ে এল আর এগিয়ে এল।

কতক্ষণ আমি কান চেপে পড়ে রইলুম। তবু মনে হল, এক শোকাকুল পৃথিবী থেকে কিছুতেই পালানো যাচ্ছে না।··আর ওই মহাকায় অজগর সাপটা—বিলাপের সাপ, পাকে পাকে জড়িয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছে। একটু বাতাস চাই, একটুখানি বাতাস!

তারপর ভোরের আগে একটু ঘুমের আমেজ এল। স্বপ্ন দেখলুম, হাজার হাজার সৌমেনের ছবি পড়ে যাচ্ছে চারপাশে। ঢেকে ফেলছে পৃথিবীকে।

পড়ন্ত তাসের মতো স্তূপাকার বিশৃঙ্খল সৌমেনদের মধ্যে আর আমার পথ খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।······

গল্পের গরু

আমার দস্যি ছেলে পুটুর জ্বর। গোবিন্দবাবু ডাক্তার তাকে নাড়াচাড়া করে বললেন, কী রে? ঠাণ্ডা বাধালি কোথায়?

পুটু বলল, জলে।

স্থলে নয়, জলে তা তো বুঝতেই পারছি। ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন। কত্ত জল তো বাবা, নানারকম। কুয়োর জল, টিউবেলের জল, ডোবার জল, নদীর জল। তোমার জলটা কী ছিল?

পুটু আরও গম্ভীর হয়ে বলল, তালপুকুরের।

তালপুকুরের। গোবিন্দবাবু ভাঁটার মতো চোখ করে বললেন। মানে সিঙ্গিদের তালপুকুরের? সে তো ডোবা বাবা! সেখানে নেমেছিলে কেন? বলে উনি ব্যাগের ভেতর কী একটা হাতড়াতে থাকলেন।

পুটু চোখ পিটপিট করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলল, কাল তালপুকুরে সুইমিং রেস হল না? তারপর সে তড়াক করে উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন, ধরো! ধরো!

আমি মহাখাপ্পা হয়ে চেঁচালুম, পুটু! পুটে! একই সঙ্গে কোথায় পুটুর মায়ের গলা শুনলুম, ও পুটু! পুটুন! তারপর কেউ খনখনে গলায় বিকট হেসে বলে উঠল, এই ধরেছি।

জানলা দিয়ে দেখলুম, মধুরবাবু পুটুকে শূন্যে তুলে নিয়ে বাড়ি ঢুকছেন। পুটু বেজায় হাত-পা ছুঁড়ছে। উঠোনের মাঝামাঝি আসতে না আসতে তারপর সম্ভবত পুটু মধুরবাবুর হাতে কামড়ে দিল। অমনি উনি ওকে ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, যাঃ। ফস্কে গেল।

পুটুকে আর দেখতে পেলুম না। গোবিন্দবাবু বাঁকা হেসে চাপা গলায় বললেন, মধুরকেষ্ট তোমার বাড়ি আসে দেখছি। সাবধান! এক নম্বর ফ্রড।

মধুরবাবু পুটুর মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। ডাক্তারের কথা শুনে বললুম, বলেন কী! কৈ, তেমন কিছু তো শুনিনি ওর নামে! তাছাড়া দেখে ভাল-মানুষ বলেই মনে হয়।

ডাক্তার বললেন, চকচক করলেই সোনা হয় না। ওর রেলের চাকরি তো এমনি-এমনি যায়নি। ভাল চাও তো লোকটাকে বেশি পাত্তা দিও না। বলে উনি প্যাড বের করে প্রেসক্রিপশান লিখতে থাকলেন।

আমাদের এই বসন্তপুর এখন প্রায় শহর হয়ে উঠেছে। হাইওয়ে আর রেললাইনের দৌলতে আমার চোখের সামনে এ শ্রীবৃদ্ধি। অসংখ্য নতুন-নতুন লোক এসে ভিড় করছে। কত লোককে আমি চিনি না ভাবলে কেমন অসহায় লাগে। এই মধুরবাবুকে কিছুদিন ধরে বসন্তপুরে দেখছি। আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে ভালমতো। স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ব্রজেনবাবুর নাকি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। পঞ্চান্নর মতো বয়স মনে হয়। ঢ্যাঙা শুঁটকো চেহারা। খাড়া প্রকাণ্ড নাক। বড়-বড় কান লোমে ভর্তি। ঠোঁটের ওপর হিটলারী গোঁফ আছে। কিন্তু পোশাক দেখলে বোঝা যায় লোকটা তেমন কিছু সুখে নেই। নোংরা ঢিলেঢালা প্যান্টের ওপর শার্টটাও মলিন এবং ওই কালো কোর্টটা যে রেল-

আমলের, তা দিব্যি কেটে বলা যায়। বলেন, টিসি ছিলুম মশাই! ঘুষ খেতুম না বলে হ্যাঙ্গামা হত। শেষে হ্যাত্তেরি বলে চাকরি ছেড়ে দিলুম। স্বাধীন-ভাবে একটা কিছু করার তালে আছি।

এ-কথায় অবিশ্বাসের কিছু নেই। বসন্তপুরের মতো উঠতি জায়গায় বাইরের লোকেরা তো এভাবেই এসে জুটছে। একটা কিছু করেও নিচ্ছে। অগত্যা চায়ের দোকানও। তাই মধুরবাবু নিশ্চয় একটা কিছু করে ফেলবেন শেষপর্যন্ত।

মধুরবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, আরে? ডাক্তার যে! তাই তো বলি শ্রীমান গুলতির গুলির মতো ছুটল কেন? ও মশাই, জানেন তো? গোবিন্দকে দেখা দূরের কথা, ওর গন্ধ পেলেই পেসেণ্ট লেজ তুলে পালায়! বিস্তর ডাক্তার দেখেছি মশাই, এমন কখনও দেখিনি যে রোগ পালানোর বদলে রুগীই পালিয়ে যায়।

গোবিন্দবাবু গুম হয়ে প্রেসক্রিপশন লিখছেন। গ্রাহ্য করলেন না। মধুরবাবু হাসতে হাসতে চেয়ার টেনে বসে ফের বললেন, কী হে ডাক্তার? রাগ হচ্ছে বুঝি? দেখো ভাই রাগের বশে সুঁই বের করো না।

ডাক্তার আমার হাতে প্রেসক্রিপশান গুঁজে দিয়ে বললেন, সামান্য ঠাণ্ডালাগা জ্বর। এবেলা বরং গরম দুধ-রুটি খাক। ওবেলা স্রেফ গরম দুধ।

দুধ! মধুরবাবু লাফিয়ে উঠলেন। মেঘ না চাইতেই জল দেখছি যে! ওই দুধের কথা বলতেই আসছিলুম। কী আশ্চর্য!

গোবিন্দবাবু ব্যাগ তুলে নিয়ে বাঁকা চোখে বললেন, দুধের কারবার শুরু করেছ বুঝি?

করেছি। মধুরবাবু মাথা কাত করে বললেন। অনেকদিন থেকে একটা কিছু করার তালে ছিলুম। শেষে ভেবে দেখলুম, বসন্তপুরে খাঁটি দুধ মেলে না। আমি খাঁটি দুধ সাপ্লাই দেব। সেণ্ট পারসেণ্ট দুধ উইদাউট এ সিঙ্গল ড্রপ অফ ওয়াটার!

ডাক্তার ফিক করে হেসে বললেন, গরু পুষেছ নাকি হে মধুরকেষ্ট?

মধুরবাবু সিরিয়াস এখন। বললেন, পুষেছি। বিশাল গরু। হরিয়ানার বংশ। এ গ্রেট কাউ। গোমাতা সুরভি বলতে পারো। দুধে বসন্তপুর ভাসিয়ে দেব দেখবে।

ভাল। গোবিন্দবাবু আমার উদ্দেশে চোখে ঝিলিক তুললেন। খুব ভাল। এবার তাহলে যথার্থ গোস্বামী হয়েছে মধুরকেষ্ট। কিন্তু তোমার গরুটি গাছে চড়তে পারে তো?

অত না ভেবেই মধুরবাবু জবাব দিলেন, পারে বৈকি।

পারে? ডাক্তারের মুখ পাকা খরমুজের মতো ফাটাফুটি হল। খুব ভাল। গাছে চড়ে যে গরু, তার দুধ খাঁটি না হয়ে যায় না। গাছের ডগার কচি-কচি পাতা খায় কিনা! ওহে মধুরকেষ্ট, আর ছিলিম টেনো না। লাং ফেঁসে যাবে।

বলে ডাক্তার চলে গেলেন। মধুরবাবু ততক্ষণে ঠাট্টাটা টের পেয়ে গেছেন। খাপ্পা হয়ে বললেন, শুনলেন? আমাকে গাঁজাখোর বলে গেল। আপনি বিশ্বাস করলেন আমি গাঁজা খাই!

মধুরবাবুর গাঁজা খাওয়ার কথা শুনেছি অবশ্য। একদিন সন্ধ্যাবেলা হাইওয়ের ধারে বদ্রী মুচির কাছে বসে ওইরকম কিছু করছেন বলে সন্দেহ হয়েছিল। আমাকে দেখে বলেছিলেন জুতোটা সারিয়ে নিচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় জুতো সারানোটা কাজের কথা নয়। যাই হোক, ওঁকে সন্তুষ্ট করতে বললুম, ডাক্তারবাবু রসিকতা করছিলেন। ছেড়ে দিন।

মধুরবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন। তবে আমি কিন্তু রসিকতা করছি না। সত্যি বলছি দুধের গরু কিনেছি। প্রচুর দুধ। যে দরে দুধ কেনেন, তার এক পয়সা বেশি নেব না। তাছাড়া ভেবে দেখুন, ভেজাল দুধ খেয়ে শ্রীমানের কী দশা! একটুতেই জ্বরজ্বালা সর্দিকাশি লেগেই আছে। খাঁটি দুধটা পেলে ছেলে দুদিনেই পালোয়ান হয়ে উঠবে।

পুটুর মা কান করে শুনছিল। এবার সায় দিয়ে বলল, ওঁকে বলো দু'লিটার করে নেব—যদি ভাল দুধ হয়। আর যেন একটু সকাল-সকাল পাই। কালু ঘোষের ছেলে ডেয়ারি করে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। বেলা দশটায় এসে জাঁক দেখিয়ে বলে, আগে কলকাতারটা এক্সপোর্ট করব, না আপনাদেরটা? এক্সপোর্ট শিখে গেছে।

কী বলে, বললেন মা? এক্সপোর্ট! খিকখিক করে হাসলেন মধুরবাবু। মানে জানে ব্যাটা? ঠিক আছে, ভাববেন না। কাল থেকে আমার গরুর দুধ আপনার বাড়ি সাপ্লাই দেব, তারপর অন্যত্র।

পরদিন মধুরবাবু ভোরবেলা সত্যিসত্যি যখন এনামেলের মস্ত পাত্রে দুধ এনে

ঘুম থেকে ওঠালেন, অন্তত আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম। বললেন, একটু হ্যাঙ্গামা হচ্ছে। যাকে দিয়ে দোহানো ঠিক করেছিলুম, সে বড্ড ফাঁকিবাজ। ট্রায়াল দিয়ে দেখি, বাঁট টানতে পারে না। বলে, আর বেরুচ্ছে না। শেষে নিজেই লেগে গেছি। মানুষ পারে না কী তাই বলুন না?

পুটুর মা দুধ জ্বাল দেবার পর বলল, ভীষণ ঘন দুধ, বুঝলে? শুধু কেমন একটু গন্ধ। পুটু খাবে তো?

বললুম, জোর করে খাওয়াতে হবে। কৈ, আমায় এক কাপ দাও তো। টেস্ট করা যাক্।

হুঁ, সত্যি কেমন একটু গন্ধ। তবে সয়ে যায় একটু পরে। বিকেলে বেরিয়ে মধুরবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল। গন্ধটার কথা বললুম। শুনে মধুরবাবু হাসলেন। ···মশাই। এই তো নিয়ম। ভেজাল খেয়ে-খেয়ে এমন হয়েছে যে খাঁটি জিনিস কেমন অচেনা ঠেকে। গন্ধের কথা বলছেন? হরিয়ানার বিদেশী ষাঁড়ের ঔরসজাত সন্তান কিনা। ইণ্ডিয়ান নাকে একটু ফরেন-ফরেন ঠেকতেই পারে। তবে দেখবেন, কী দারুণ বলবীর্যবর্ধক দুধ। সায়েবদের স্বাস্থ্য যে অমন পেল্লায় তার মূল কারণটা তো এই।

পুটুকে খাওয়ানো সমস্যা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুদিনেই তার চেহারায় চেকনাই লক্ষ্য করছি। গোবিন্দ ডাক্তারের ওষুধের কথা তুললে পুটুর মা ভুরু কুঁচকে সুন্দর কটাক্ষ হেনে বলল, ওষুধ বুঝি খেয়েছে তোমার ছেলে? খাওয়াতেই পারিনি। মধুরজ্যাঠার গরুর দুধেই কাজ হয়েছে।

বিশ্বাস করা যায়। মধুরবাবুর গরুর বাবা হাঙ্গেরিয়ান সায়েব, মা নেটিভ। একটু গন্ধ হতে পারে। তবে এ দুধ তিনজনেই পান করছি এবং বাড়িতে আজ-কাল স্বাস্থ্য ফেরার কানাকানিও চলছে। পুটু তালপুকুরের সুইমিং রেসের ফাই-নালে জিতেছে শুনেছি। তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে গোপনে। এ রুক্ষ বসন্তপুরে বসন্ত এসেছে বলে মনে হয়। মরা গাঙে জোয়ারের মতো একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে ঘটছে। অভ্যস্ত একঘেয়ে যৌবনের ধার ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। মধুরকৃষ্ণ গোস্বামীর সঞ্জীবনী সুধার দৌলতে পুটুর মায়ের চোখে, শরীরে এবং মুখেও ইদানীং শানদেওয়া উজ্জ্বলতা এবং তীক্ষ্ণতা। পুটুর দস্যিপনাটাও আরও বেড়েছে। সারাদিন তালপুকুরে। মাছ ধরার মতো ধরে আনতে হয়। কিন্তু ঠাণ্ডাটা তো আর ওকে কাবু করতে পারছে না। শুধু কাবু হচ্ছি আমি। তার মায়ের মুখের ধারে! কী তেজস্বিনী মহিলা, কস্মিনকালে কল্পনা করিনি।

মধুরবাবুর গরুটিকে একদিন দেখার ইচ্ছে হল। তার দুধে ঘন সর পড়ে। সর তুলে জমিয়ে পুটুর মা মাসান্তে কিছু প্রকৃত ঘি উৎপন্ন করবেই। সেই সমস্যা গোমাতা সুরভিকে দর্শন করার ইচ্ছা কি এমনি? আমার আগ্রহ জেনে মধুরবাবু বললেন, এত আর কথা কী? দুপুরে আসুন। বড্ড রোদ্দুর পড়েছে। পারবেন তো? সারাদিন মাঠে চরতে দিই।

জিগ্যেস করলুম, দূরে নাকি?

তা একটু দূরে। মধুরবাবু বললেন। কাছাকাছি গোচারণ কই? সব তো জমি আর বাড়ি। রেললাইনের ওপারে।

সাহস পেলুম না। কিন্তু দিন দুই পরেই অযাচিত সৌভাগ্য বলতে হয়। বিকেলে বেরিয়েছি—দেখি একটু তফাতে সিঙ্গি মশাইদের বাড়ির ওপাশে বাগানের কাছে মধুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। জনহীন পরিবেশ। বাগানের নিচু পাঁচিল। কোথাও ভেঙে চুরে গেছে। মধুরবাবু আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন যেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, এই যে! আসুন, আসুন। আমার সুরভিকে দেখতে চেয়েছিলেন না? ওই দেখুন। চুপিচুপি বাগানে ঢুকিয়ে ঘাস খাওয়াচ্ছি। দেখলে ব্যাটা খোঁয়াড়ে নিয়ে যাবে।

গোমাতা দর্শন হয়ে গেল। পেল্লাই গরু বলতে হয়। গায়ের রঙটাও দুধের মত সাদা। তাই বুঝি অমন ঘন দুধ দেয়। বাঁকা প্রকাণ্ড শিং। আপন-মনে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সপ্রশংস দৃষ্টে বললুম, বাছুর কৈ মধুরবাবু? বাড়িতে বাঁধা আছে বুঝি?

মধুরবাবু বিরসবদনে বললেন, আপনাকে বলিনি। দুঃখের কথা কী বলব? বাছুরটা রাতারাতি ভুগে মারা গেছে। আমার বরাত মন্দ। খড়ের বাছুর বানিয়ে যেটুকু পারছি, দোহন করছি। জানি না আর কদিন এভাবে চালাতে পারব। গরুটা হয়তো বেচে দিতেই হবে।

খুব দুঃখ হল শুনে। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, বেচবেন কেন? এমনি করে চালিয়ে যান। আবার তো বিয়োবে। বাছুরও হবে।

হবে। বলে মধুরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর পা বাড়িয়ে বললেন, চরুক। বুদ্ধিমতী গরু। তেমন বুঝলে পালিয়ে আসবে। চলুন, বাজারের দিকে যাই।

মধুরবাবুর কথা শুনে বিষণ্ণ হয়েছিলুম। তাহলে কি অলৌকিক শক্তি-প্রদায়িনী সুরভিনির্যাসের বদলে কেলোর গোঁয়ার ষণ্ডটির গুঁতোসহ একপ্রকার সাদা তরলপদার্থ আবার ঔদরিক নিয়তি হয়ে উঠছে? হুঁ, যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই ঘটল। মধুরবাবুর পাত্তা নেই। বেলা বাড়ে। পুটুর মা দরজায় চাতক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা বাড়ে এবং মেজাজও বাড়ে। অগত্যা পুটুকে পাঠাই। পুটু তালপুকুরে যায়। ফেরে না। অগত্যা আমি যাই। হেডমাস্টারমশাই ব্রজেনবাবুর বাড়ির লাগোয়া ঘর করে নাকি বাস করছেন মধুরবাবু, তাই বলেছিলেন। ওঁদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লে ভুলো নামে এক পুরাতন ভৃত্য মুণ্ডু বের করে বলে, মশাই তো এখন ইস্কুলে। আমি বলি, না। মধুরবাবুকে চাই।

মধুরবাবু? ভুলো ফ্যাঁচ করে হাসে। ওঁকে তো ভোরবেলা মেরে বের করে দিয়েছেন হেডমাস্টারমশাই।

সে কী! কেন?

তা বলতে পাবব না আজ্ঞে। ...বলে সে ভেতরের উত্তেজিত এক ডাক শুনে দরজা বন্ধ করে ফেলে। ব্যাপারটা রহস্যজনক বটে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। হতাশভাবে ফিরে আসি।

বিকেলে মধুরবাবু এলেন হাঁফাতে-হাঁফাতে করুণ ক্লান্ত চেহারা। বললেন, সবনাশ হয়ে গেছে মশাই! আমার গরু নিখোঁজ। সেই যে কাল বিকেলে কেষ্ট মিত্তিরের বাগানে চরতে দেখলেন, সেই শেষ দেখা। সারারাত খুঁজেছি। সারাদিন খুঁজে হন্যে হচ্ছি। খোঁয়াড় পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে এলুম। নেই।

এই বলে মধুরবাবু ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে থাকলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুলিশে খবর দিয়ে দেখুন না। নিশ্চয় কোনো গরুচোরের কাজ। অত দামী গরু দেখে লোভ সামলাতে পারেনি।

মধুরবাবু নাক ঝেড়ে নোংরা রুমালে মুছে হঠাৎ অদ্ভুত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ষড়যন্ত্রসংকুল চাপা স্বরে বললেন সিঙ্গিদের বাগানের কোনায় একটা ইঁদারা ছিল দেখেছেন। ওটার হিসট্রি জানেন কিছু?

অবাক হয়ে বললুম, সেটা তো পোড়ো ইঁদারা। কেষ্টবাবুর বাবার আমলে ওই ইঁদারায় নাকি হাওয়াকল বসানো ছিল। বেয়াল্লিশের ঝড়ে উড়ে যায় সেটা। ফুল-ফলের গাছে জল সেচতে হাওয়াকল করেছিলেন। তখন তো

ওঁরা জমিদার। পরে অবস্থা পড়ে গেছে। বাগানটা নষ্ট হয়েছে। ইঁদারাটাও ভেঙে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন মধুরবাবু?

মধুরবাবু তেমনি ফিসফিস করে বললেন, এতকাল পরে হঠাৎ আজই সাত তাড়াতাড়ি কেষ্ট সিঙ্গি ইঁদারাটা বুজিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না আপনার?

মাথামুণ্ডু খুঁজে না পেয়ে বললুম, কী ভাবছেন আপনি?

মধুরকৃষ্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে গর্জন করলেন। ···গোবধ! পাটকেল ছুঁড়ে খেদাতে খিয়ে গোবধ করে ফেলেছে। তারপর ইঁদারায় ফেলে পাপ চাপা দিয়েছে সিঙ্গি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এতক্ষণ পুলিশে যাওয়াই উচিত ছিল। তাই যাচ্ছি। ···বলে উনি নড়বড় করে পা ফেলে প্রায় দৌড়লেন।

এরপর যা ঘটল, তা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি মর্মান্তিক। এমন অদ্ভুত ঘটনা আমাদের বসন্তপুরে কখনও ঘটেনি। ব্যাপারটা এতখানি গড়াত না, যদি না এর মধ্যে গরু থাকত। কেষ্ট সিঙ্গি হাড়কেপ্পন মানুষ। কনট্রাকটরি এবং পরবর্তীকালে গোপনে মহাজনীবৃত্তি, চোরাকারবার নানান ধান্ধায় কিছু পয়সা করেছিলেন। কৃপণতা এবং অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ঈর্ষাও ছিল বিস্তর লোকের। পরদিন দুপুরের মধ্যে পুলিশের তদারকিতে ইঁদারা খোঁড়া হল এবং আশ্চর্য ঘটনা, গরুর লাশও বেরুল! ভিড়ের কানে তালা ধরিয়ে মধুরবাবু চিলচিৎকারে ফেটে পড়লেন। আর লাশের ওপর পড়ে সে কী তুমুল কান্না।

কেষ্ট সিঙ্গির অবস্থা শোচনীয়। দারোগা সাহেব বরকতুল্লাও বড় কড়া-ধাতের মানুষ। হাতকড়া পরানোর উপক্রম করতেই কিন্তু কেষ্টবাবু অন্যমূর্তি ধরলেন হঠাৎ। চেঁচিয়ে বললেন, আমার গরু! মধুরকেষ্টর বাপ কখনও গরু দেখেছে? এ আমার গরু। বিহারের হিরণপুরের গোহাটায় কিনেছিলুম। শেষে দেখি গরুটা বাঁজা। তারপর···

মিথ্যা! বলে পাল্টা আকাশ ফাটালেন মধুরকৃষ্ণ। আমার গরু। বাঁজা নয়ই, দৈনিক দশ লিটার করে দুধ দিত। যাঁরা-যাঁরা সে-দুধ খেয়েছেন, এখানেই আছেন জিগ্যেস করুন দারোগাসাহেব! বলে আমার দিকে আঙুল তুললেন।

আমি হকচকিয়ে বললুম, হ্যাঁ। দু লিটার করে রাখতুম।

মধুরবাবুর আরো সাক্ষী পাওয়া গেল। আমার মতো তাঁরা দুধ রাখতেন এবং কেউ-কেউ এই গরুটিকে মধুরবাবুর হাতে সেবা-যত্ন পেতে অর্থাৎ ঘাস খেতে দেখেছেন।

তখন কেষ্টবাবু বললেন, আমারও সাক্ষী আছে। এই দেখুন, এর নাম গোবরা। আমার বাড়ির রাখাল। এই হারামজাদার তাড়ার চোটে গরুটা ইঁদারায় পড়ে মারা যায়।

ব্যাপারটা আরও কঠিন হল। কারণ কেষ্টবাবুর সাক্ষীও কম নয়। বেগতিক দেখে বরকতুল্লা দারোগা বললেন, ঠিক আছে। তাহলে দুজনকেই চালান দেই। কোর্টে নিষ্পত্তি হোক। কী বলেন মশাইরা?

বসন্তপুরে আর সে সমাজ নেই, কিন্তু সমাজপতিরা আছেন। তাঁদের প্রতিনিধি সদানন্দবাবু বললেন, আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। সিঙ্গি, ইঁদারায় গরু পড়েছে জেনেও বুজিয়ে দিয়েছিলে কেন বলো তো বাপু? গরু যদি তোমারও হয়, কাজটা ভাল করনি।

কেষ্টবাবু কাতরস্বরে বললেন, গোবধের প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে। আপনারা আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন, মাথা পেতে মেনে নেব।

সমাজপতিরা পরামর্শ শুরু করলেন। হাড়কেপ্পনকে জব্দ করার এমন সুযোগ আর আসবে না। মধুরবাবু হাওয়া লক্ষ করে বিকট কেঁদে ফেললেন আবার।…সিঙ্গি বড়লোক বলে সাতখুন মাফ? আমার গরু মেরে গুম করে দিয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না? এই আপনাদের বিচার? ও হো হো!

বরকতুল্লা দারোগার হাবভাব দেখে বুঝতে পারছিলুম, এখানেই একটা নিষ্পত্তি হলে ঝামেলা থেকে বেঁচে যান। তাঁকে বললুম, মধুরবাবু গরীব মানুষ। ব্যাপারটা এখানে যদি মেটাতেই চান, কেষ্টবাবুকে বলুন—অন্তত একটা গরু কেনার দামটা দিক। আমরা যে ওঁর গরুর দুধ খেয়েছি, সেটা তো মিথ্যা নয় আদালতে তা বলতে রাজি আছি।

ঝানু দারোগা মুচকি হেসে বললেন, দুধে তো কিছু প্রমাণ হবে না মশাই। আদালত গরুকেনার রসিদ দেখতে চাইবে। যে দেখাতে পারবে, তারই গরু।

কেষ্ট সিঙ্গি কান খাড়া করে শুনছিলেন। কালো মুখ করে বললেন, রসিদ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে কি গোড়াতেই দেখাতুম না?

মধুরবাবুও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। রসিদটা যদি রাখতুম সিঙ্গি, তাহলে এতক্ষণে তোমার হাতে হাতকড়া চড়িয়ে ছাড়তুম!

দারোগাসাহেব দাড়ি চুলকে বললেন, তাহলে? তাহলে মামলা না করে একটা রফা হতে আপত্তি কিসের?

পুটু আবার জ্বর বাধিয়েছিল। সুতরাং গোবিন্দ ডাক্তার এলেন। ওর পেট টেপাটেপি করে বললেন. কী রে? গাছ-চড়া গরুর দুধ আর খেতে পাস না বুঝি?

হাসতে হাসতে বললুম, গাছে-চড়া গরু বলাটা এখনও ছাড়লেন না ডাক্তার-বাবু!

ডাক্তার বাঁকা হাসলেন। সিঙ্গির টাকায় মধুরকেষ্ট দেখলুম চায়ের দোকান করেছে শিরিনতলায়। শুনলুম প্রায়শ্চিত্তের ভোজ খেতেও গিয়েছিল। সিঙ্গি পাতে বসতে দেয়নি। বসন্তপুরে ঢের-ঢের মাল দেখেছি, এমন মাল দুর্লভ।

বিরক্ত হয়ে বললুম, আপনার সন্দেহ এখনও যায়নি। দুধটা তো মিথ্যা নয়।

অবশ্যই নয়। গোবিন্দডাক্তার ভুরু কুঁচকে বললেন, তবে দুধটা সিঙ্গির বাঁজা গরুরও নয়। মধুরকেষ্টর গাছে চড়া গরুরও নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানে? আমি ভড়কে গেলুম।

মানে প্যাকেটে করে যে গুঁড়ো দুধ স্কুলে আসে। গোবিন্দবাবু নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন। মধুরকেষ্ট মামার স্টকে ইন্টারফেয়ার করতে করতে শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে বেদম পেঁদানি খায়। আমার ধারণা, বেগতিক দেখে সিঙ্গির বাঁজা গরুটাকে ও-ব্যাটাই ইঁদারায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এক ঢিলে দুই পাখি বধ। কিন্তু বাবাজী, কোন গরু গাছে চড়ে জানো তো?

আনমনে বললুম, জানি। গল্পের গরু। তাই শুনে পুটু বলল, গল্পের গরুর দুধে বিচ্ছিরি গন্ধ। ছ্যা!

জুয়াড়ি

লোকটার সঙ্গে বহরমপুর বাস স্ট্যাণ্ডে আলাপ। যেমন রোগাটে গড়ন, তেমনি খাটো। চুল কুচকুচে কালো হলেও মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। বলেছিল—আমার নাম কালীচরণ। ওদিকে লালগোলা, এদিকে সুপারিগোলার হাট, পদ্মার ধারে ধারে যদ্দূর যাবেন কালীচরণকে সবাই চেনে। আপনার কোন ভয় নেই। সঙ্গে গিয়েই দেখুন।

পদ্মা কেন পয়সা দেয়, কীভাবে দেয়, তার বিশদ খবর দিয়েছিল কালীচরণ। সে-খবর বনবিহারীর একেবারে অজানা, তাও নয়। পয়সার পিছনে সেই

ছেলেবেলা থেকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এবং পয়সার নেশাই বনবিহারীকে হাঘরে করে রেখেছে। পয়সার খোঁজ পেলে তার মনে একটা চিতাবাঘ চনমন করে ওঠে। সে কালীচরণের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিল। লোকটা যে ফালতু নয়, মহা এলেমদার—বুঝতে দেরি হয়নি বনবিহারীর।

বিকেল নাগাদ পৌঁছে কালীচরণ তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়েছে। হাটতলা, দোকানপাট, আজিমগঞ্জের জৈনদের গদি আর গুদাম ঘর, ননী ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির ডিসপেনসারি, প্রাইমারি স্কুল, রক্ষাকালীর মন্দির ঘুরে বর্ডার পুলিশের ক্যাম্পে। ক্যাম্প আলাপ করিয়ে দিয়েছে সেপাই আর জমাদারবাবুদের সঙ্গে।

বনবিহারী এমন বিশাল জলের ধারে কখনও দাঁড়ায়নি। নাকে কী একটা গন্ধ এসে লাগে। চেনা-অচেনার মাঝামাঝি কী গন্ধ। আবছা কত কিছু মনে পড়ে। চোখের সামনে অপার অথৈ জল। ওপারটা অস্পষ্ট। একটানা একটা ধূসর রেখার মতো। শেষ বেলায় জেলে নৌকোগুলো সবে এদিকে-ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কালীচরণ বলল—সারারাত ওরা ইলিশ ধরবে। ভোরবেলা হাটতলায় দেখবেন ইলিশের পাহাড়। ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু তফাত দিয়ে গেছে পীচের সড়ক। লালগোলা থেকে বাস এল। বাসের মাথাঅব্দি লোক। তাদের দেখিয়ে কালীচরণ মুচকি হেসে বলল—চেনা মনে হচ্ছে না কাকেও?

বনবিহারী বলল—না তো। কেন চেনা মনে হবে?

—বেশির ভাগই আপনার স্বজাতি।

—স্বজাতি মানে?

কালীচরণ হোহো করে হাসল—বুঝলেন না? খেলাড়িরা রাতের আসর জমাতে এল সব! হাটতলার পেছনে আমবাগানটা দেখালুম—দেখবেন, কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসে পড়ছে!

বুঝতে পেরে বনবিহারীও হাসল। সিগারেট বের করে বলল—নিন কালীদা।

কালীচরণ সিগারেট নিয়ে বলল—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। মেলা নেই, পালাপার্বণ নেই, গানের আসর নেই—রোজ রাতে ওই ব্যাপার। এ এক অদ্ভুত জায়গা মশাই। আসাঅব্দি একই রকম দেখছি। তবে মাঝে মাঝে

বর্ডারে যখন অশান্তি হয়, তখন অবশ্য আমবাগানটা খালি পড়ে থাকে। অন্ধকারে তখন ভূত-পেতের বাথান। ওখানে পা বাড়াতে গা ছমছম করে।

বনবিহারী ওর সিগারেট জ্বেলে দিয়ে নিজেরটা ধরাল। জোরালো হাওয়া বইছে। পদ্মার বুক থেকে থরে-বিথরে কী যেন আরাম এসে জড়ো হচ্ছে পাড় বরাবর। সারা দিনের গরম, বাসের ক্লান্তি—জুড়িয়ে যাচ্ছে এতক্ষণে। বনবিহারী আস্তে সিগারেটে টান দিয়ে বলল—অশান্তি বললেন। সে কিসের?

—গোলাগুলির। কালীচরণ হাঁটতে হাঁটতে সহজ সুরেই জানাল। মাঝে মাঝে কী যে হয় মশাই, আচমকা রাত-দুপুরে শুনি পদ্মার মধ্যিখানে কোথায় টাঁট টাঁট ফট ফটাস বুম বুম এই রকম আওয়াজ হচ্ছে। একবার হাটতলায় একটা গোলা এসে পড়েছিল। পরার মাস। পদ্মা তখন প্রায় শুকনো ওখানটায়।

—লোক মরেছিল নিশ্চয়?

—নাঃ! আটচালায় আগুন ধরে গিয়েছিল। মাটি অব্দি ফেটে হাঁ। আর বলবেন না। দুই পারের পুলিশে-পুলিশে ঝগড়া নাকি। শেষ অব্দি মিলিটারিও এসে যায় অনেক সময়!......বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ আনমনে হাঁটল কালীচরণ। রাস্তার মোড়ে গিয়ে ফের মুখ খুলল...তবে অনেকদিন বর্ডারে শান্তি চলছে। শান্তি চললেই লোকের ভাল। ওপারেও ভাল, এপারেও ভাল। পয়সা আসে। বর্ডার অঢেল পয়সার জায়গা।...

কালীচরণের বাড়িটা একতালা। বেশ ছিমছাম নতুন বাড়ি। উঠানে টিউবেল আছে। জবা ফুলের ঝাড় আছে। একটা বাঁধানো উঁচু তুলসীমঞ্চ আছে। বাড়িটা একেবারে চুপচাপ নিঃঝুম সারাক্ষণ। বাইরের ঘরে বনবিহারী আতিথ্য করছে। একটা তক্তাপোশ আছে আর দুটো আমকাঠের হলদে পালিশ করা চেয়ার আছে। দেয়ালে মাকালী ও রামকৃষ্ণদেবের ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। বনবিহারীর সঙ্গে ছোট্ট একটা বিছানা সব সময় থাকে। সেটা কালীচরণ বিছোতে দেয়নি। নতুন তোষক চাদর আর বালিশ দিয়ে খাতির করেছে।

বনবিহারী অনুমান করেছিল কালীচরণের বউটউ আছে। বিকেলে বাস থেকে নামার পর এ বাড়ি এসে যাকে দরজা খুলতে দেখেছিল, সে এক বুড়ি। ঝি বলেই মনে হয়েছে। এখন দরজা খুলল যে, তাকে দেখে বনবিহারী একটু অবাক হল। সারা গা সোনার গয়নার ঝলমল করছে, ফর্সা রঙ ফুটফুটে সুন্দর যাকে বলে এমন এক যুবতী। গয়না, শাঁখা আর অতখানি সিঁদুর না থাকলে কালীচরণের মেয়ে বলেই মনে করত।

তার হাতে লম্ফ। দরজা খুলেই চলে গেল ভিতরে। মেঝেয় অবশ্য একটা ছোট হারিকেন জ্বলছে। কালীচরণ বলল···বসুন বনোয়ারিবাবু। আরেক কাপ চা খেতে-খেতে দু ভায়ে গল্পগুজব করা যাক। তারপর নাগাদ আটটা খেয়ে-দেয়ে বেরুনো যাবে।

বনবিহারী বিছানায় বসে বলল···দেরি হয়ে যাবে না?

কালীচরণ হাসল।···মোটেও না। পুরো 'আসর বসতে ধরুন দশটা বেজে যাবে। কারণ, লালগোলা থানা থেকে এক চক্কর অফিসার এসে টহল দিয়ে যাবে সেই স্লিপ চলে গেলে খবর হবে অল ক্লিয়ার। তখন আপনার দাদা-ভাই বন্ধুরা এদিক-ওদিক আটচালা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান···সবখান থেকে পিলপিল করে বেরুবে। গ্যাস বাতিতে জল পুরবে। হ্যাসাগে পাম্প দেবে। আসর জমবে মাঝরাত। ভোর অব্দি খেলুন না, কত খেলবেন।

কালীচরণ ভেতরে চলে গেল। বনবিহারী বালিশে মাথা রেখে পা ছড়াল। চোখ বুজে অভ্যাস মতো পা নাচাতে থাকল। একটা কথা এখনও জিগ্যেস করা হয়নি কালীচরণ কখনও খেলেছে কি-না। নিজে না খেললে তো খেলার দিকে এতখানি টান থাকার কথা নয় এবং খেলাড়িরও খাতির করার কথা নয়। মনে হচ্ছে, এ লাইনে লোকটার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। বলেছে বটে, ছোটখাট দালালীর কারবার করে···কখনও ফসলের আগাম দাদন দেয় এ-গাঁ ও-গাঁয়ে। তবু কোথায় একটা চাপা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। লোকটা কেমন যেন রহস্যময়। তখন রাতের পদ্মায় আলোর ঝিলিকের কথা বলছিল। হয়তো নিজেও ঝিলিকের কারবার করে।······

ভাবতে ভাবতে কালীচরণ একটু পরে চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে ঢুকল। বলল···আপনি ভাই একটুখানি গড়িয়ে নিন। ঘণ্টাখানেক। আমি একটু কাজ সেরে আসি ততক্ষণ। ঠিক সময়ে এসে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিয়ে দুভায়ে বেরুব।

চা খেতে খেতে আবার কিছুক্ষণ বর্ডার এবং পদ্মার হাওয়া নিয়ে গল্পগুজব করল কালীচরণ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে বলল—দরজাটা আটকে দিন বরং।

বনবিহারী বলল—থাক।

—উঁহু নতুন লোক আপনি। আটকে দিন। কার মনে কী থাকে।

বনবিহারী অগত্যা দরজা আটকে দিল। কালীচরণের হাতে টর্চ আছে। জানলা দিয়ে বাইরে টর্চের আলোর ছটা চোখে পড়ল। তারপর স্তব্ধতা। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। অবশ্য মশার চাপা গুনগুনানি আছে। সেটা যেন নিজেরই মাথার মধ্যিখানে। বনবিহারী তক্তাপোশের তলা থেকে ফোলিও ব্যাগটা বের করে বিছানায় রাখল। তারপর ব্যাগ খুলে তার খেলার সরঞ্জাম বের করল। হারিকেনটা তুলে বিছানার ওপর সাবধানে বসাল। তকিপুরে খেলার সময় মারামারি হয়েছিল আগের রাতে। ছকটা একটু ছিঁড়ে গেছে কোণার দিকে। তাতে কোন অসুবিধে হবে না। গুটিগুলো হারিয়েছে নাকি, ভাল করে দেখার সুযোগ পায় নি। তিন সেট গুটি আছে। একটা সেট ভারি পয়মন্ত। তোরমান ওস্তাদ দিয়েছিল ওই সেটটা। বলেছিল—নেহাত ফাঁপরে না পড়লে বের কোরো না বনোয়ারিবাবু, বেশি চাললে পয় ক্ষয়ে যাবে।······

সেটগুলো ছক বিছিয়ে মেলাতে থাকল বনবিহারী। ছটা গুটিতে একটা সেট। ইস্কাপন, রুইতন, চিড়িতন, হরতন, রাজমুকুট আর ড্রাগন। এরা রাজাকে ফকির করে, ফকিরকে করে রাজা। আজ রাতের আসরে বনবিহারী তার ছকের দিকে তাকিয়ে আছে।

অচেনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেচে কথা বলতে বাধে। বনবিহারী গম্ভীর হয়ে গুটিগুলো 'ফড' বা চামড়ার কৌটোয় সাজাতে শুরু করল। তারপর শুনল—আপনি জুয়াড়ি ?

সোজাসুজি আক্রমণ একেবারে। বনবিহারী নিজেই জানে সে জুয়াড়ি। কিন্তু কথাটা অমন করে বললে ভারি খারাপ লাগে। একবার একটা চায়ের দোকানের ছোকরা তাকে জুয়াড়িদা বলে ডেকেছিল। বনবিহারী চড় মেরে বলেছিল—তোর বাবা জুয়াড়ি! আসলে ভদ্রলোকের ছেলে, ম্যাট্রিক অব্দি পড়েছিল···সেই কথাগুলো কিছুতেই মন থেকে ঘোচে না। আর সব জুয়াড়ির সঙ্গে নিজের পার্থক্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা তার সব সময় আছে। তোরমানকে ওস্তাদ বলে মানলেও তোরমান তাকে অন্য শাগরেদের মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক তো দেখি! তোরমানও সেটা বোঝে।

বনবিহারী জবাব দিল না দেখে কালীচরণের বউ ফের বলল···হুঁ, তাই এত খাতির করে সঙ্গে এনেছে। আমি ভেবেছিলুম—

বনবিহারী মুখ নামিয়ে রেখেই বলল—কী ?

—ব্যাপারী-ট্যাপারী হবে।

বনবিহারী ছোট্ট করে নাঃ বলল।

—বাড়ি কোথায় আপনার? ওপারে নাকি?

—উঁহু, এপারে।

—কোথায় শুনি?

কান্দি এলাকায়।

কালীচরণের বউ দু-পা এগিয়ে এল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বলল—আমার বাপের বাড়ি কাঁদির পাশে। আঁদুলে চেনেন? সেখানে।

বনবিহারী খুশির ভাব দেখিয়ে বলল—বাঃ! তাহলে তো আপনি আমার দেশের মেয়ে।

—আপনার কোন্ গাঁয়ে বাড়ি বললেন না কিন্তু!

—এখন আর বাড়ি-ফাড়ি নেই।… বনবিহারী একটু হাসল। এক সময় অবশ্য ছিল—ভরতপুরে।

—ভরতপুরে? সেখানে তো আমার মামার বাড়ি। কতবার গেছি।… কালীচরণের বউ সংকোচ কাটিয়ে তক্তাপোশের কোনায় এসে বসল। ফের বলল—কিন্তু বাড়ি নেই মানে? একটা জায়গা তো থাকে মানুষের। যেখানে যাক, ঘুরে ফিরে সেখানে একবার যেতেই হয়।

বনবিহারী বলল—যখন যেখানে থাকি, সেখানেই আমার ঘর। এখন আপনাদের ঘরে আছি, এটাই আমার ঘর। বলে সে জুয়াড়ে ছক ভাঁজ করতে থাকল।

কালীচরণের বউ হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি দেখি। এইটে দিয়ে জুয়ো খেলেন বুঝি? ওগুলো কী? গুটি? একবার চালুন না, দেখি। আহা, চালুন না বাবা একবার।

বনবিহারী তামাশা করে বলল—বিনিপয়সায় খেলতে নেই। পয় ক্ষয়ে যায়। পয়সা নিয়ে বসুন। দু-চার দান খেলুন। তবে না মজাটা টের পাবেন।

কিন্তু কালীচরণের বউ অমনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। নির্ঘাত মাথায় ছিট আছে। বনবিহারী একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কালীচরণ এসে যদি দেখে তার বউকে নিয়ে খেলতে বসেছে, নিশ্চয় সেটা খুশি মনে নেবে না।

তক্ষুণি কালীচরণের বউ এসে হাজির। হাতের মুঠোয় পয়সা এনেছে। তক্তাপোশের কোনায় বসে দম বাড়িয়ে দিল হারিকেনের। তারপর বলল—নিন, একদান খেলে দেখব।

—কালীদা দেখলে কিন্তু বকবেন!

—বয়ে গেছে! কই, খুলুন!

বনবিহারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছকটা বিছিয়ে দিল। ছটা গুটি বাদামী রঙের চামড়ার ফড়ে রেখে মুখের ওপর তুলে নেড়ে ছকে উপুড় করে বলল—দান ধরুন।

কোন্ ঘরে ধরব?

আমি বলব কেন? সে তো আপনার ইচ্ছে।

কালীচরণের বউ চঞ্চল চোখে ঘরগুলোকে দেখার পর হরতনে একটা সিকি রাখল। বনবিহারী কৌটো তুলল। দুটো হরতন, বাকিগুলো কোনটা সাদা, কোনটায় অন্য 'রঙ' চিত হয়েছে। সে হরতন আঁকা গুটি দুটো হরতনের ঘরে রেখে খিকখিক করে হেসে উঠল। কালীচরণের বউ উদ্বিগ্ন মুখে বলল—হেরে গেলুম বুঝি?

না জিতেছেন। আট আনা পেলেন।…বলে বনবিহারী পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ছকে ছুঁড়ে দিল।

কালীচরণের বউ খিলখিল করে হেসে বলল—চার আনা জিতলুম?

—আপনার লাক ভাল। আমি হারলুম।

—এই আট আনাই ধরলুম।

বনবিহারী হাসতে হাসতে বলল—সবুর, সবুর। আগে গুটি চালি। তারপর দান ধরবেন।

—কেন? আগে ধরলে কী হবে?

—হারলে বলবেন, গুটি এমন কায়দায় চেলেছি যে, ও ঘরের রঙে কোন গুটির রঙ আসেনি।

—যাঃ! সে তো কপাল।

—না, কপাল নয় বউদি। হাতের চালের কায়দা। গুটি আমার কথা শোনে।

—সত্যি? কালীচরণের বউ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

—সত্যি।

—বিশ্বাস করিনে। এই নিন, আগেই ধরলুম। কই, জিতে নিন দেখি।

বনবিহারী একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। গুটি কোন্ পাশে চিৎ হবে, বড় বড় জুয়াড়ি তা জানে। যে-হাতের ট্রিকস এখনও, বনবিহারীর ততখানি আয়ত্তে আসেনি। সে পারে তোরমান মিয়া। কাটোয়ার দিকে তাকে আর

সব জুয়াড়িরা রাজা বলে ডাকে। তবে বনবিহারী গুটির শব্দে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে আজকাল।

গুটি চেলে ফড় তুলল সে। ফের কালীচরণের বউ জিতেছে। সিকিছুটো টেনে একটা এক টাকার নোট এগিয়ে দিতেই কালীচরণের বউ প্রায় খামচে হাত থেকে নিল। আবার খিলখিল করে হাসতে থাকল। বনবিহারী টের পাচ্ছে, এই সেই সর্বনেশে ঘোর,.যা রাজাকে ফকির করে—এবং যে-ঘোরকে সে নিজে জুয়াড়ি হয়েও আজো বুঝতে পারে না, কালীচরণের বউকে তাই পেয়ে বসেছে। বনবিহারী ঘড়ি দেখে বলল—এই থাক বউদি। দেখলেন তো কেমন মজার খেলা।

কালীচরণের বউ বলল—না, না। আর একদান—একটা দান খেলি।

এবারেও সে জিতল। বনবিহারী দু টাকার নোট দিয়ে বলল—আপনি আমাকে ফকির করে দেবেন। লাক আপনার ফেভারে।

নোট দুটো ড্রাগনের ঘরে পড়ে রইল। কালীচরণের বউ কেমন চোখে তাকিয়ে বলল—হুঁ, বুঝেছি। আপনি ইচ্ছে করেই জিতিয়ে দিচ্ছেন আমাকে।

তখন বললেন, গুটি কথা শোনে।

—বললুম। কিন্তু ব্যাপারটা—...

—না। আপনি ইচ্ছে করে জিতিয়ে দিলেন।

—বিশ্বাস করুন!......

—উহুঁ আপনি জিতলে তবে বিশ্বাস করব।

—ইচ্ছে করলেই আমি জিততে পারিনে, বউদি!

কালীচরণের বউ জেদ ধরে বলল—না। আপনি হাতের কায়দা করেছেন

—বেশ। আপনি নিজে গুটি চালুন। আমি দান ধরি।

দুষ্টু মেয়ের মতো হেসে কালীচরণের বউ আনাড়ি হাতে ফড়টা খুব নাড়া-চাড়া করল। তারপর ছকের ওপর উপুড় করে চেপে ধরল। বনবিহারী রাজমুকুটে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরল। তারপর বলল—তুলুন এবার দেখি।

কালীচরণের বউ কৌটো তুলল। গুটিগুলোর দিকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—কে জিতল?

—আপনি।

—মিথ্যে।

—না বউদি, সত্যি। এই দেখুন, রাজমুকুটের রঙ একটা গুটির ওপরেও নেই।

গুম হয়ে বসে রইল কালীচরণের বউ। ভুরু কুঞ্চিত দৃষ্টি গুটিগুলোর দিকে। হাত ভর্তি সোনার চুড়ি ঝকমক করছে। গলার চন্দ্রহার আনমনে আঙুলে নেড়ে সে চাপা গলায় বলল—আজ আপনি খেলতে যাবেন না। আপনার ওপর কুদৃষ্টি পড়েছে। কাল রক্ষেকালীকে পুজো দিয়ে খেলতে যাবেন।

বনবিহারী হোহো করে হেসে উঠল। বলল—বউদি, ওসব কিছু নয়। এই ফড়ের মধ্যে গুটি নড়াচড়ার শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারি, কে কোন ঘরের রঙ খাবে। আপনি তো একেবারে আনাড়ি। কাজেই শব্দ শোনামাত্র বুঝলুম রাজমুকুট খালি যাবে।

কালীচরণের বউ অমনি তক্তাপোশ থেকে উঠে দাঁড়াল। বনবিহারীর দিকে বাঁকা ঠোঁটে তাকিয়ে ঘুরল দরজার দিকে। বনবিহারী বলল—জেতা টাকাগুলো নিয়ে যান বউদি। ও বউদি।

কালীচরণের বউ জবাব দিল না। সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে বারান্দাটা অন্ধকার। বনবিহারী ফের বলল—বউদি, অন্তত আপনার সিকিটা নিয়ে যান!

কিন্তু আর কোন সাড়াই এল না। তখন বনবিহারী ছক ভাঁজ করতে ব্যস্ত হল।...

কালীচরণ এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। হাটতলার পিছনে আমবাগান। তার ওপাশে পদ্মা অন্ধকারে অপার হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

আমবাগানে হ্যাসাক আর গ্যাস বাতি ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে জুয়াড়িরা। প্রত্যেক ছকে এক দঙ্গল করে খেলাড়ি। কালীচরণ বনবিহারীকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। বলল—এক্ষুনি আসছি, নিশ্চিন্তে বসুন।

ছোট কারবাইড বাতি জেলে শতরঞ্জি বিছিয়ে আরাম করে বসেছে বনবিহারী। তলায় ঘাস আছে। সে বসতে না বসতে পোকার ঝাঁকের সঙ্গে খেলাড়ির একটা ঝাঁক এসে বসে পড়ল। নানান বয়সী লোক সব। পোশাক-আসাক দেখেই বোঝা যায় অনেকেই চাষাভুষো। কেউ কেউ একটুখানি উজ্জ্বল চেহারার, এবং পানে ঠোঁট রাঙা, দৃষ্টিতে চালাক-চতুর ভাব আছে।

বনবিহারীর চিনতে দেরি হয়নি, এরাই বর্ডারের আদত মাল। ছোট ব্যাপারীর ছদ্মবেশে ঘোরে। পদ্মায় রাতের কারবারই এদের আসল পেশা।

আমবাগানে এত সব লোক, অথচ কোন কথা নেই মুখে। বড় জোর ফুসুর ফাসুর, চাপা দু-একটা মন্তব্য। ফিক করে একটুখানি হাসি। জিভ বের করে চুকচুক। প্রথমে কিছুক্ষণ বনবিহারী জাল ছাড়ল—ঢিলে হাতে চাল দিতে থাকল। সিকি আধুলি. বড় জোর একটা করে নোটের দান পড়ছে। প্রতি চালে দু-তিন জন করে জিতছে। বনবিহারী হাসতে হাসতে বলছে—কার মুখ দেখে উঠেছিলেন ভাই ?

দেখতে দেখতে ছকের খেলাড়িদের সঙ্গে ভাব জমে গেল। বনবিহারী এটা পারে। এ তার ওস্তাদের শিক্ষা। ছকে বসলে তার চেহারা বদলে যায়। গম্ভীর ভাবটা আর একটুও থাকে না। কিন্তু ফতেখাঁর দিয়াড়ের এই আসর একেবারে অন্য রকম। মেলার আসরের মতো গলা ছেড়ে বুলি বলা যাবে না। বাঁধা গতের মতো সেই চমৎকার বুলি তালে তালে আউড়ে যেতে পারলে ছক জমে ওঠে। খেলাড়িদের মনে নেশা ধরে যায়। ছক ছেড়ে উঠতে পারে না, হেরে ভুট হয়ে গেলেও না।

রাত আড়াইটা অব্দি অপেক্ষা করেও কালীচরণের পাত্তা নেই। তখন বৃষ্টি পড়ছে। হাল্কা দু-চার ফোঁটা টাপাচ্ছে গাছগাছালি থেকে। ননীডাক্তার হাই তুলে শুতে গেলেন। বনবিহারী টর্চ জেলে এগোল। রাস্তা চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু তার গা বাজছিল। সঙ্গে টাকাকড়ি আছে।

ড্যাগারটা ব্যাগ থেকে বের করে সে পকেটে ঢোকাল। ভিজে জামাকাপড আর ব্যাগটা বাঁ হাতে—ডান হাতে টর্চ। কারবাইড বাতিটা ননীবাবুর কাছে রেখে এসেছে। চারদিকে আলো ফেলতে ফেলতে সে হাঁটছিল। ঝোপঝাড আর গাছপালার ভেতর একটা করে বাড়ি। ভিজে গাছে ঝোপেঝাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলছে। কুকুর ডাকছে কোথায়। রাস্তা মাটির। কিন্তু মাটিটার গুণ একফোঁটা জল জমতে দেয়নি। কাদাও হয়নি। একটু পিছল, এই যা।

কালীচরণের বাড়িতে আলোর ছটা দেখে সে ভাবল, তাহলে কখন সোজা বাড়ি ফিরেছে সে। দরজায় চাপা গলায় ডাকল - কালীদা ! কালীদা !

সাড়া দিল কালীচরণের বউ। বনবিহারী একটু জোরে বলল—আমি বনবিহারী বউদি।

দরজা একটা ফাঁক হল। কালীচরণের বউয়ের নাক দেখা গেল। তারপর দরজা খুলে গেল। বনবিহারী চমকে উঠল। ওর হাতে হাত তিনেক লম্বা একটা দা। বনবিহারী হেসে বলল—কালীদা ফেরেন নি?

—না। আপনি ঢুকে পড়ুন, দরজা আটকাব।

কালীচরণের বউ কেমন গম্ভীর। বনবিহারী ভিতরে ঢুকে বলল—যা বিষ্টি। খেলা পণ্ড করে দিল! এতক্ষণ কালীদার জন্যে ডাক্তারবাবার ওখানে বসেছিলুম। রোজ এমন দেরি হয় নাকি?

--হুঁউ। বলে কালীচরণের বউ চলে যাচ্ছিল।

বনবিহারী—আপনি একা এভাবে থাকেন বউদি?

অমনি কালীচরণের বউ হিসহিস করে বলে উঠল—কেন?

বনবিহারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। জিব কেটে বলল—না, না। আপনি আমার দেশের মেয়ে। একলা এভাবে থাকেন, বাড়িতে একা মেয়েছেলে--তাই···

কলীচরণের বউ কাটারিটা দেখিয়ে বলল—এটা কী?

বনবিহারী হোহো করে হেসে উঠল। বলল—ওরে বাবা। আপনি একেবারে সাক্ষাৎ ইয়ে! যাক্‌. শোন গিয়ে। কালীদা এলে আমি বাইরের দরজা খুলে দেব।

কালীচরণের বউ ভেতরে চলে গেল। ভেতরের বারান্দার মাথায় আরেকটা হারিকেন জ্বলছে। পোকা থকথক করছে তার গায়ে। এ ঘরের হারিকেনটাও পোকায়-পোকায় থকথকে হয়ে গেছে। রাতের বৃষ্টির পর পোকা বেড়ে গেছে এতক্ষণে। বনবিহারী জিনিসপত্র সামলে রেখে তক্তাপোশে বসে সিগারেট ধরাল। তারপর আপন মনে বলল—সন্ধ্যায় এত মশা ছিল না। কী মশা রে বাবা!

ভেতরের দিক থেকে কথা ভেসে এল—বালিশের তলায় মশারি রেখেছি। টাঙিয়ে নিন।

বনবিহারী খুশি হয়ে দেখল মশারিটা নতুন। দেয়ালে পেরেক রয়েছে চার কোণায়! সে তক্ষুনি ঝটপট মশারিটা টাঙিয়ে ফেলল। তারপর ব্যাগটা খুলে টাকাগুলো বের করল। গুণে রুমালে জড়িয়ে বালিশের তলায় রাখল। ড্যাগারটা রেখে দিল। বরাবর এই অভ্যাস।

মশারিতে ঢুকে তার মনে পড়ল ভেতরের দরজাটা খোলা। তাই ডাকল—বউদি! জেগে আছেন নাকি শুয়ে পড়েছেন।

—কেন ?

—ওই দরজাটা…

—বন্ধ করে দিয়ে শোন।

সে মশারি থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করত গেল। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল কালীচরণের বউ কী করছে এখনও। তাই একটু ঝুঁকল দরজার বাইরে। দেখল ও থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনবিহারী ভালমানুষী করে বলল—শুয়ে পড়ুন বরং! আর জেগে কী লাভ ?

কালীচরণের বউ-এর হাতে এখন সেই দাটা নেই। গা ভরা সোনার গয়না পরে এমন একটা নির্জন বাড়িতে রাত জাগছে! অদ্ভুত মেয়ে তো! মাথায় পাগলামির ছিট আছে, তা স্পষ্ট। বনবিহারীর কথা শুনে সে ঘুরেছে। আলোর ছটায় চোখ দুটো জ্বলছে। তারপর হঠাৎ বনবিহারীর কাছে এসে সে ফিসফিস করে উঠল---একটা কথা বলি শুনুন। আপনি আমার বাপের দেশের লোক। না বলে পারছি না।

বনবিহারী বলল—কী ?

—রাত পোহাল এখান থেকে চলে যান! নয়তো বিপদ হবে।

বনবিহারী চমকে উঠল।—কেন ? কিসের বিপদ ?

—অত কৈফৎ দিতে পারব না—ভাল চান তো চলে যাবেন।

বনবিহারী গোঁ ধরে বলল—দেখুন বউদি, ছেলেবেলা থেকে এই করে দেশে দেশে ঘুরছি। বিস্তর বিপদআপদ দেখেওছি। নতুন আর কী হবে, বলুন!

কালীচরণের বউ গলা আরও নামিয়ে বলল—বাপের দেশের লোক বলেই বলছি। নৈলে আমার কী দায়! গত কালীপুজোর সময় কোত্থেকে ঠিক আপনার মতো একজনকে নিয়ে এসেছিল। আপনার চেয়ে বয়েস অনেক বেশি। হুঁ—কী যেন নাম। বোরেগী না কী যেন—হুঁ, বোরেগীবাবু। তারপর…

বনবিহারীর বুকে ধক করে এক টুকরো বরফ নড়ে উঠল। গা হিম হয়ে গেল। বৈরাগ্য জুয়াড়িকে সে ভাল চিনত। কাটোয়ার লোক। গত বছর থেকে আর কোন আসরে তাকে দেখা যায় না। গুজব রটেছিল, কোথায় খেলতে গিয়ে নাকি খুন হয়েছে।

সেই বৈরাগ্য জুয়াড়ির পাত্তা কালীচরণের বউয়ের মুখে! বনবিহারী বলল—বেঁটে শ্যামবর্ণ লোক। কড়ে আঙুলে পলাবসানো মোটা চাঁদির আংটি ছিল। নাকটা মোটা, বড় বড় কান…

—সেই। চেনেন নাকি?

—খুব। কী হয়েছিল বৈরাগ্যদার?

—ক'রাত এবাড়ি থাকল। রোজ রাতে বাগানে জুয়ো খেলল। তারপর এক রাতে আর এল না শুতে। পরদিন ঘোড়ামারার চরে লাশ পাওয়া গেল।

—খুন?

—জলে ডুবে মরেছিল।

—তাহলে দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল। নয় তো ধস ছেড়ে…

—না, না! ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল!

—কে?

—যম।…বলে সরে গেল থামের দিকে। ফের চাপা স্বরে বলল—ভালমানুষি করে কানে তুললে আমার কিছু হবে না। আরো কখানা সোনার গয়না বখশিস পাব।

বনবিহারী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মিনিট। তারপর ঠোঁট কামড়ে বলল—আচ্ছা দেখা যাবে। আমার নাম বনোয়ারি মুখুয্যে। আমার বাবার নাম কালু মুখুয্যে। ডাকাতের সর্দার। গুলি খেয়ে মরেছিল। তখন আমার বয়স ছ বছর।…

কালীচরণ কখন ফিরেছিল বনবিহারী জানে না। দেখা হল সকালবেলা। বলল—কাল একটা কাজে আটকে পড়েছিলুম। হঠাৎ বিষ্টি। আপনাদের আসরও নিশ্চয় জমে নি।

বনবিহারী বলল—জমাটি যা হবার হয়েছিল। আমার ওই নিয়ম দাদা। প্রথম কয়েক চালেই যা করার করে নিই!

—তাই বুঝি? কালীচরণ হাসি মুখে বলল।

—হুঁউ। দু ঘণ্টায় পাঁচশো মতো তুলেছি। এক রাতে আমার মতো চুনোপুঁটির পক্ষে ওই যথেষ্ট। তবে দাদা, যা মনে হচ্ছে, ক'রাতেই রাজা হয়ে যাব!

—আপনাকে বলেছিলুম। বর্ডারে প্রচুর পয়সা!

কিছুক্ষণ কথা বলার পর কালীচরণ কাজ আছে বলে বেরিয়ে গেল। বনবিহারী একটু পরে বেরোল। ডেকে বলল—বউদি, দরজা আটকে দিন। বেরুচ্ছি।

সকাল থেকে কালীচরণের বউ আজ অন্যরকম। কাল বিকেলে বা রাতে যেমন দেখেছে, তেমন নয়। গিরগিটির মতো রঙ বদলেছে যেন। হাসতে

হাসতে এল এঘরে। চোখ নাচিয়ে বলল—খুব লোভ দেখাচ্ছিলেন যেন? আপনার পরমায় শেষ হয়ে এসেছে। টাকার গন্ধ পেলে ও কিন্তু ক্ষেপে যায়।

বনবিহারী বলল—একটা ভয় শুধু বিষের। খাবারে বিষ দিলে আমার কিছু করার নেই!

কালীচরণের বউ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ জ্বলে উঠল তার। নাকের ফুটো কাঁপল। বলল—বিষ দিলে সে তো আমি! আর যে জন্যে হোক, টাকার জন্যে আপনার পাতে বিষ দেব না।

—এই রে! আপনি রেগে গেলেন!···বলে বনবিহারী হাত জোড় করল।

তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে পা বাড়াল। মনটা অস্থির। সারা দিন কীভাবে কাটাবে ভেবে পাচ্ছে না।

সে রাতে আবার আমবাগানে জমজমাট আসর। ননীবাবু আজ এলেন না। কালীচরণ আসরে বসেছে। কিন্তু খেলছে না। বনবিহারী টের পেল, কালীচরণকে তার আসরে দেখে অন্য জুয়াড়িরা যেন উসখুস করছে। মাঝে মাঝে কেউ ডাকছে—কালীদা, এখানে একবার আসুন না। পায়ের ধুলো দিয়ে যান, দাদা। ধন্য হই।

অগত্যা মাঝে মাঝে সে সবাইকে খুশি করে আসছিল। এক ফাঁকে কালীচরণ অন্য আসরে গেছে, তখন গত রাতের এক চেনা খেলাড়ি চোখ নাচিয়ে বলল—কালীদাকে কত দিচ্ছেন ওস্তাদ? খবর্দার, দশের বেশি দেবেন না। ওরা সব্বাই দশ করে দেয়।

বনবিহারী কালীচরণের আরও একটু পরিচয় পেয়ে গেল।···

খেলা ভোর অব্দি চালানো যায় না। গেলে খুব ভাল হত। কে এসে সাবধান করে দিয়ে গেল—অফিসার এসেছে ক্যাম্পে। তখন রাত সাড়ে তিনটে। আসর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল। আলোগুলো নিবিয়ে ফেলা হল। তারপর চুপচাপ যে যেদিকে পারল, গা ঢাকা দিতে গেল। কালীচরণ বলল—এই এক বিপদ। যাক্ গে, আসুন। এই যথেষ্ট!

বনবিহারী বলল—পেটটা ব্যথা করছে। একটু মাঠ সারতে যাব।

কালীচরণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বলল—টর্চ সাবধানে জ্বেলে ওখানে কোথাও বসুন। আগে জল দেখে নেবেন, কোথায় আছে।

বনবিহারী একটু ভেবে বলল—ওপাশটায় যাই। আপনি কি এখানে অপেক্ষা করবেন দাদা?

—পাগল! আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়। আমি বরং চায়ের দোকান-টোকানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

—আমার ভয় করবে, কালাদা। মাইরি।

কালীচরণ হাসতে হাসতে বলল—চলুন, চলুন।

বাগান পেরিয়ে ফাঁকায় গেল দুজনে। জায়গা পছন্দ হল না বনবিহারীর। যদি বা পছন্দ হল, কালীচরণ বলল—ওখানটায় আজ বিকেলে মাটি খেয়েছে। ওই শুনুন, এখনও খাচ্ছে।

আবছা ধস ছাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আরো একটু এগোল দুজনে। তারপর কালীচরণ বলল—যান! এবার নিশ্চিন্তে বসুন।

বনবিহারী পায়ের কাছে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে গিয়ে একটু তফাতে বসল। কালীচরণ আকাশ দেখতে দেখতে চাপা গলায় বলল—বনোয়ারিবাবু, খেলা যদি দেখবেন তো ওই দেখুন! ওই হচ্ছে খেলা। কালোছকে কেমন রঙ-বেরঙের গুটি ছড়িয়ে পড়ছে দেখবেন! ওস্তাদ খেলাড়ি বসে আছে কোথায়, কেউ দেখতে পাবে না তাকে। আপন মনে একা বসে গুটি চালছে কে জিতছে, কে হারছে!···কী হল?

বনবিহারী বলল—সাপ! কী সাপ দেখুন তো! বলে সে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে গেল। ব্যস্তভাবে ফের বলল—কালাদা, দেখুন—দেখুন! বিষাক্ত মনে হচ্ছে—দেখে যান শিগগির!

কালীচরণ এগিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।—দেখবেন, একেবারে জলের ধারে যাবেন না।

—আরে সর্বনাশ! ফণা তুলেছে দেখুন। আলোতে কী সাংঘাতিক দেখাচ্ছে।

—কই দেখি, দেখি। বলে কালীচরণ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ফের বলল—কই সাপ, কোথায়?

বনবিহারী শক্তভাবে দাঁড়িয়ে বলল—এই যে!···

···একটু পরে বনবিহারী হাটতলা ছাড়িয়ে ননীবাবুর ডাক্তারখানার পেছন ঘুরে লুকোচুরি খেলতে খেলতে বড় রাস্তায় উঠেছে। বাঁয়ে কাঁচা রাস্তায় মোড় নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আবার ওবাড়ি কেন? সে বড় রাস্তায় হনহন

করে হাঁটতে থাকল। কিন্তু মনে কী কাঁটা বিঁধে থেকেই যাচ্ছে। কালীচরণের বউকে খবরটা দিয়ে এলে যেন মাথাটা ঠাণ্ডা হত। যাক গে।······

বছর চার-পাঁচ পরে বনবিহারী একদিন বহরমপুর বাসট্যাণ্ডে এসেছে। সঙ্গে এবার জুয়োর রাজা তোরমান মিয়া। ওস্তাদ-শাগরেদ জোট বেঁধে বর্ডার এলাকায় যাবে খেলতে। ফতেখাঁর দিয়াড়, নয়তো সুপারিগোলার হাট। নাকি কাতলমারির চরে গিয়ে ছক বিছিয়ে বসবে? চায়ের দোকানে বসে দুজনে পরামর্শ করছে কোন বাস ধরবে। বনবিহারীর মন টানছে ফতেখাঁর দিয়াড়ের দিকেই। তোরমান বলছে—শুনলুম ওপারওলারা সেদিন দিনদুপুরে এসে লুঠপাট চালিয়ে গেছে। মিলিটারিতে ছেয়ে ফেলেছে সারা তল্লাট। ভাল করে খবর নিতে হয় আগে।

এই সময় বনবিহারীর চোখে পড়ল প্রকাণ্ড শিরিষ গাছের শেকড়ে সোনার গয়নাপরা একটি মেয়ে বসে আছে। তার দু পায়ের ফাঁকে একটা সন্থ হাঁটতে শেখা বাচ্চা। লাল পেণ্টুল, নীল জামা, চুলের সঙ্গে আটকানো একটা সোনার টায়রা। মা ছেলের নাক চুষে দিচ্ছে। ছেলে মায়ের। তার সঙ্গে খিটখিট করে হাসি।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। বেঁটে, রোগা, শ্যামলা চেহারা। গায়ে টেরিকটনের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। তার এক হাতে এক ঠোঙা জিলিপি, অন্য হাতে মাটির ভাঁড়ে চা।

বনবিহারী নিজের চোখকে কয়েক সেকেণ্ড বিশ্বাস করতে পারল না। লোকটা বউয়ের হাতে চা আর জিলিপি দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। বুকে চেপে আদর করতে করতে শিরিষ গাছের ওপরে পাখি দেখাতে থাকল—ওই দেখ, ওই দেখ···

তোরমান বলল—কী হল বনোয়ারি?

বনবিহারীও যেন মুখ তুলে পাখি দেখতে গেল। পাখি দেখতে গিয়েই সে অন্য কিছু দেখছিল। সে-রাতে পদ্মার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখিয়ে কালীচরণ বলেছিল—বনোয়ারিবাবু, খেলা যদি দেখতে হয়, ওই দেখুন। ওই হচ্ছে খেলা। কালো ছকের ওপর কেমন রঙ বেরঙের গুটি ছড়িয়ে পড়ছে দেখছেন? ওস্তাদ খেলাড়ি বসে আছে কোথায়, কেউ দেখতে পায় না তাকে। আপন মনে গুটি চালছে। কে হারছে, কে জিতছে। কেমন করে বেঁচেছিল কালীচরণ?

বনবিহারী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল—চলুন ওস্তাদ, বরং কাতলমারির বাসে গিয়ে বসি।…

আকারান্ত

জগনমামা বললেন, তাহলে বাবা ঝণ্টু, ততক্ষণ তুমি মামীমার সঙ্গে গল্পসল্প করো। আমি ঝটপট বাজারটা সেরে আসি।

বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে ডাকলেন, কই গো! ছাতিটা দাও বরং। এই সাতসকালেই রোদ্দুরটা বড চড়ে গেছে।

জগনমামার মাথায় এমন প্রকাণ্ড টাক আমি আশা করি নি। এতকাল পরে ওঁকে দেখে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চেহারার কী দারুণ অদলবদল না ঘটে গেছে! রোগা খটখটে চেহারার মানুষ ছিলেন। এখন বিশাল পিপে হয়ে উঠেছেন। মুখের এমন প্রশান্ত হাসিও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই মফস্বল শহরে এখন ওঁর উকিল হিসেবে বেজায় নামডাকও হয়েছে এবং তার কারণ সম্ভবত ওঁর চেহারার এই ভোলবদল। আগে ওই শুঁটকে চেহারার আর খিটখিটে মেজাজের জন্যে মক্কেল যেমন জুটত না, তেমনি হাকিমরাও নাকি ওঁকে এজলাসে দেখলে চটে যেতেন। অবশ্যি, সবই শোনা কথা।

এও শোনা কথা যে জগনমামার স্ত্রী আত্মহত্যাই করেছিলেন। কৌশলে কলেরায় মৃত্যু বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। উকিলমানুষদের তো পেটে-পেটে বুদ্ধি।

বলে রাখা ভাল, জগনমামা কস্মিনকালে আমার মামাকুলের কেউ নন। ছোটবেলায় আমার বাবা মারা যান। পাড়াগাঁয়ে সম্পত্তি রাখার নানা ঝামেলা। মামলা-মোকদ্দমার দায় সামলাতে হ'ত তাই মাকেই। সেই সুবাদে এই উকিলভদ্রলোক মায়ের দাদা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি ভেবে পেতাম না, জগনবাবুর মতো উকিল কেন ধরেছিলেন মা! তখন আরও কত জাঁদরেল উকিল এ শহরে তো ছিল! মামলায় হেরে গেলেও দেখতাম, মা ফের এই ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়েছেন।

হয়ত এটাই মানুষের অভ্যাস। চেনাজানা ডাক্তারের হাতে মরতেও রাজি যেমন, তেমনি উকিল-মোক্তারের বেলাও তাই। এখন মা নেই। আমি বিষয়-সম্পত্তির হাল ধরেছি। আমি সেই একই অভ্যাসে এসে জুটেছি

জগনউকিলের দরজায়। মামলায় হার-জিত ভবিষ্যতের কথা,—ছোটবেলা থেকে যাঁকে মামা বলে জানি, তার কাছে এসে দাঁড়ালে মনের জোর ভীষণ বেড়ে যায়।

তবে তার চেয়ে বড় কথা, জগনমামার এখন নাকি নামডাক হয়েছে। কাজেই আমার মনের জোর অনেক বেশি করেই বেড়েছে। আজ রোববার। আজকের দিন ও রাত্তিরটা জগনমামার বাড়ি কুটুম্বিতা এবং সলাপরামর্শ করা যাবে বলেই আসা। আগামীকাল ফার্স্ট আওয়ারে কেস ঠোকা যাবে।

বুঝতে পারছিলাম, জগনমামা আবার বিয়ে করেছেন কবে। কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম নতুন মামীমা একবারও ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না দেখে। ভেতরের বারান্দায় একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। জগনমামা ওপাশের কিচেন থেকে চা বয়ে এনেছেন। চায়ের খালি কাপপ্লেট উনি নিজেই রেখে এসেছেন। মামীমার পাত্তা নেই। জগনমামা ওঁর উদ্দেশে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু কোনো সাড়া আসছে না।

তাই ভাবছিলাম, একটা দাম্পত্যকলহ-গোছের কিছু ঘটে থাকবে। নাকি মামীমা ঠাকুরঘরে পুজোয় বসে আছেন?

জগনমামা ছাতি চাইলেন। তবু মামীমার সাড়া এল না। তখন জগনমামা মুখে একটু বিরক্তি ফুটিয়ে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন। তারপর ছাতির খোঁজে ঘরে ঢুকলেন। ঘর থেকে ওঁর চাপা গলায় কথাবার্তা শুনতে পেলাম। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ছাতি হাতে। মুখে প্রশান্ত হাসি। বললেন, তাহলে গল্পসল্প করো তোমরা। আমি ঝটপট ফিরব।

উনি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওদিকটায় আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শর্টকাট পায়ে চলার পথ আছে। গিয়ে উঠেছে বাজারের চওড়া রাস্তায়। এদিকটা একেবারে নিরিবিলি নিঝুম জায়গা। আশেপাশে বাড়ি বিশেষ নেই। গঙ্গার ধারে শহরের একান্তে এই বাড়িটার বয়স প্রাচীন। একটু তফাতে হাসপাতাল এলাকা। অন্যদিকটায় গঙ্গার পাড়ে বনদফতরের যত্নে সাজানো ঘন বন। ভাঙন আটকাতেই ওই নিরামিষ জঙ্গল। জগনমামার ভাষায় নৈমিষারণ্য।

বাড়ি একেবারে চুপচাপ। গ্রীষ্মের এই সাতসকালে গঙ্গার দিক থেকে একটা হাওয়া এল শনশনিয়ে। হাওয়াটা খিড়কির দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে ঠাঁই ঠাঁই করে ঘুরতে থাকল। তারপর পাঁচিলের ধারে জবা ও শিউলির ঝোপ

হুলুস্থুল করে পটাপট কিছু হলুদ পাতা ছিঁড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল। এই সময় আমার মনে পড়ল, যেদিকে গেল, সেদিকটায় শ্মশানবট এবং একটু পরে সেই উঁচু বটগাছের মাথায় ঝাঁকুনি লাগল।

কিছু করার না থাকলে আমার উদ্ভট সব অনুভূতি জাগে। হঠাৎ মনে পড়ল ছোটবেলায় দেখা মামীমা অর্থাৎ জগনবাবুর প্রথম স্ত্রীর কথা। আত্মহত্যা করলে মানুষ নাকি ভূত হয়। এমন নিরিবিলি বাড়িতে ভূতের পক্ষে হামলা করা ভারি সহজ। পুরনো মামীমার ভূত নতুনমামীকে জ্বালায় না?

কে জানে কেন, এ বাড়িতে রাতে থাকতে হবে ভাবতেই এবার অস্বস্তি জাগল। ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভূতের ভয় আমার বেজায়-রকমের।

একটু কাশলাম। ভেতরের ঘর একেবারে চুপচাপ। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হঠাৎ নতুন মামীমা বেরিয়ে এলে লজ্জা পাব। আবও একবার কাশলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে তাকিয়ে আধআধ গলায় বললাম, মামীমা! আমি একটু ঘুরে আসি। শুনছেন? মামীমা!

কিন্তু সাড়া এল না। অদ্ভুত মহিলা তো! উঠোনে গিয়েও সাড়া পাব ভাবলাম। না পেয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আগাছার জঙ্গলে ঢুকলাম। সিগারেট টানতে থাকলাম। জগনমামা বলছিলেন, সবসময় খালি তোদের গল্প করি। তোর মায়ের মতো মহীয়সী মেয়ে আর হয় না। আর তুই— কট্টুকুন ছিলি জানিস বাবা ঝণ্টু? এই এ্যাট্টুকুন। আর কী ভীতু, কী ভীতু!

এতসব যদি শুনে থাকেন ভদ্রমহিলা, তাহলে আমাকে দেখার জন্যে বেরুলেন না কেন—কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

সিগারেট শেষ করে বাড়ি ঢুকে চমকে উঠলাম। কোত্থেকে একটা নেড়ি কুকুর ঢুকে পড়েছে যে! বারান্দায় গিয়ে ভেতরের ঘরের পর্দার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, মামীমা! কুকুর ঢুকছে! কুকুর!

তবু সাড়া নেই দেখে দৌড়ে গেলাম। কুকুরটা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। লাথি খেয়ে কেঁউ করে উঠল এবং ডিগবাজি খেতে খেতে উঠোনে গিয়ে পড়ল। লেজ গুটিয়ে পালাল।

পর্দা তুলে উঁকি মেরে ডাকলাম, মামীমা। কিন্তু ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। সেকেলে পালঙ্কের ওপর জগনমামার লুঙি পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকালাম। একগুচ্ছের স্নোপাউডার ইত্যাদি যথারীতি সাজানো। ওপাশে আলনায় কয়েকটা শাড়ি ও সায়া পর্যন্ত! সেগুলো অত ময়লা কেন ভেবে পেলাম না।

কিন্তু ঘরে একটা মেয়েলি গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। আবছা মনে হল, নতুন মামীমার বয়স নিশ্চয় জগনমামার তুলনায় ঢের কম। মেয়েলি গন্ধটা কি চুলের? স্নানের পর মেয়েদের চুলের এমন গন্ধ হয়। একটু লজ্জা পেলাম। এভাবে এঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা ওপাশে কোথাও আছেন। এসে গেলে অপ্রস্তুতের একশেষ হব।

বেরিয়ে আসার আগে ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছবিটার দিকে চোখ পড়ল। পুরুষ ও মহিলার ছবি পাশাপাশি। কিন্তু চিনতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, যুবতী মহিলাটি কেমন চোখে তাকিয়ে হাসছেন।

ঠিক এইসময় বাইরে জগনমামার সাড়া পেলাম। বহুভাগ্যে দুটো গলদা পেলাম, বুঝলে? মোটে দুটো। যাক্ গে, এতেই হবে। আর ইয়ে, শোনো—দুঃচ্ছাই। ভুলে গেলাম যে!

ঝটপট বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম, জগনমামা সদরদরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন। বগলে ছাতি। একহাতে বাজারভর্তি থলে। বললেন, এ অসময়ে ওদের বাড়ি না গেলে চলত না? ঝটপট ফিরে এস তাহলে। অবশ্যি আজ রোববার। বেলা করেই খাওয়া যাবে।

নতুন মামীমা তাহলে কিচেনে ছিলেন!

ঘুরে আমাকে দেখে জগনমামা একগাল হেসে বললেন, এই যে ঝণ্টু! আলাপ হল মামীমার সঙ্গে? গপ্পের রাজা। থুড়ি রানী! রানী! আর তুমি তো বরাবর ভূতের গপ্প শুনতে ভালবাসতে! এখন অবশ্যি বড় হয়েছ। তাহলেও মন্দ লাগবে না! কী বলো!

বলে চোখ নাচালেন। রাত্তিরে শুনবে'খন।

নতুন মামীমাকে তখন পর্যন্ত চোখে না দেখলেও বুঝতে পারছিলাম, ভদ্রমহিলা খুব শান্ত ও চাপা স্বভাবের। কথাবার্তা বলেন হয়ত অতি সামান্য। যেটুকু বলেন, তাও যেন ভীষণ আস্তে গলার ভেতর। তাছাড়া বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপে হয়ত সংকোচ বোধ করেন, অথবা আদপে পছন্দই করেন না।

বাইরের ঘরে জগনমামার ওকালতির আপিস। আজ ছুটির দিন বলে বুঝি ওঁর মুহুরিবাবু আসেন নি। সেই ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বাইরে রোদ বেড়েছে। এখনই লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চারপাশে শুধু গাছপালার শনশন আর গঙ্গায় নাইতে যাওয়ার সরু গলিপথে ধুলোবালি আবর্জনার ঝড় বইছে শোঁ শোঁ করে। ভেতর থেকে জগনমামার কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। নতুন মামীমার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা ভারি অদ্ভুত বলব। সম্ভবত শুনেই যাচ্ছেন মুখ বুজে।

আর কৌতূহল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হল। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। জগনমামা কিচেনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেবিলে তরকারি কুটছেন এবং কথা বলছেন। কিচেনের দরজা সামনাসামনি। ভেতরে কেরোসিনকুকার জ্বলছে। রান্না হচ্ছে। কিন্তু নতুনমামীমাকে দেখা যাচ্ছে না।

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে জগনমামা হেসে বললেন, এস বাবাজী। তোমার মামীমাকে বলছিলাম, ঝণ্টু তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বিশুদ্ধ জল-বায়ু আর নির্ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ হয়েছে। এ ভূতের জায়গায় অখাদ্য কি ওর রুচবে?

বলেই ভেতরের সেই ঘরের দিকে তাকালেন। তোমার অত কেন লজ্জা বলো তো? ঝণ্টু বলতে গেলে আমার আপন ভাগনে। এস। কই? কেশ, এসো না। ফিরে গিয়ে তোমারই বদনাম করবে। অচেনা তো নয়। সেই ছোট্টবয়সে কতবার দেখেছ। বড় হয়েছে বলে লজ্জা! আশ্চর্য!

আপনমনে ফের গজগজ করতে থাকলেন। তোমার এই একরোখামিই যত সর্বনাশের গোড়া।

আমি চকচকিয়ে গেছি ততক্ষণে। ছোট্টবয়সে কতবার দেখেছ—এর মানে কী? তাহলে কি নতুন মামীমা আমার চেনাজানা কোনো মহিলা? জগনমামার হাবভাব দেখে কোনো কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না। বুঝলাম, আমার খুব পরিচিত মহিলাকেই বিয়ে করেছেন জগনমামা। এত পরিচিত যে মুখোমুখি হলে নিশ্চয় দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তাই উনি দেখা দিচ্ছেন না। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। খুঁজেই পেলাম না তেমন কে হতে পারেন নতুন মামীমা?

দুপুরে খাবার সময়ও উনি এলেন না। জগনমামার মুখ গম্ভীর। সেটা খুবই স্বাভাবিক। টেবিলে সব সাজানো ছিল। দুজনে পচাপ খেলাম।

খাওয়া হলে, জগনমামা বললেন, ওঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। সাড়ে পাঁচটার আগে উঠো না। গরম কমলে বরং ঘুরে এসো গঙ্গার ধারে।

লম্বা হয়ে গেল ঘুমটা। উঠে দেখি, টেবিলে চা ঢাকা আছে। নতুন মামীমা এসে দিয়ে গেছেন কি? বোধ হয় জগনমামাই। বাড়ির ভেতর চুপচাপ। চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। কল্পনা করলাম, নতুনমামীমাই চা রেখে গেছেন এবং আশ্চর্য, সেই মিষ্টি মেয়েলি গন্ধটা অবিকল টের পেলাম।

দরজা ভেজিয়ে গলিরাস্তায় গঙ্গার ধারে ঘুরতে গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরে এলাম, তখন এদিকটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। লোডশেডিং। দরজা বন্ধ থাকবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ঠেলতেই দেখি, তেমনি খোলা। ভেতরে ঢুকে ডাকলাম, জগনমামা!

সাড়া এল, আয় ঝণ্টু! এখানে আয়।

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন জগনমামা কালো মূর্তিটি হয়ে। আলো নেই বাড়িতে। বললাম, আলো জ্বালেননি যে?

জগনমামা বললেন, অন্ধকার ভাল লাগে। আয়, এখানে আয়। কী গো! এখন তো ঝণ্টু তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না—এবার কথা বলবে না কী? অ ঝণ্টু, মামীমার সঙ্গে কথা বল্।

ডাকলাম, মামীমা! তারপর টের পেলাম অন্ধকার উঠোনে আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমি আর জগনমামা। হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল। বললাম, জগনমামা! মামীমা কই?

এই তো দেখতে পাচ্ছিস না? জগনমামা অস্বাভাবিক গলায় বললেন। কই গো, ঝণ্টুকে ছুঁয়ে দাও তো! আহা, দাও না বাবা! বলতে গেলে আপন ভাগনে—ছোটবেলায় কত আদর করেছ!

হিহি করে অদ্ভুত হাসি হেসে জগনমামা আমার একটা হাত টেনে অন্যহাতে অন্ধকারে অদৃশ্য মামীমার হাত টানার ভঙ্গি করতেই আমার মাথা ঘুরে গেল এবং আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফে বারান্দা এবং বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে তারপর ব্যাগ-ট্যাগের কথা ভুলে দড়াম করে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়লাম।

মাসদুয়েক পরে একদিন শহরে গেছি। ব্যাগটা নিয়ে আসতে তো বটেই—জগনমামার অবস্থা দেখতেও তীব্র কৌতূহল হল। নিরিবিলি জায়গায় পুরনো

জরাজীর্ণ বাড়িটা দেখে একটু গা ছমছম করল। কিন্তু দিনদুপুরে আশা করি আর ভূতের ভয়টা পাবে না।

দরজায় কড়া নাড়ার পর খুলল। খুলতেই আমার বুকের ভেতর রক্ত চড়াং করে উঠল। হাসিখুশি মিষ্টি চেহারার সুন্দরী মহিলা দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। যেই হাসিমুখে বলেছেন, কাকে চাই—অমনি আমি পিছিয়ে এসেছি। প্রায় লাফ দিয়েই।

ইনিই যে সেই নিরাকার মামীমা—যাঁর সঙ্গে জগনমামা অনর্গল কথা বলতেন এবং যিনি আত্মহত্যা করে মারা যান, তিনি ছাড়া আর কে হতে পারেন? ভুল হয়েছে বলে আমি হনহন করে চলে এলাম। পা টলছিল। একবারও পিছু ফেরার সাহস হল না। নিরাকার আকার ধরলেই সমস্যা।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্যময়। তবে এটুকু মনে পড়ছে, পেছনে জগনমামার যেন চিৎকার শুনেছিলাম—ঝণ্টু! ও ঝণ্টু! চলে যাচ্ছিস কেন? তোর নতুনমামীমার সঙ্গে আলাপ করে যা।

কানের ভুল হতেও তো পারে। 'নতুন' শব্দটা কি সত্যি শুনেছিলাম?

সাক্ষীবট

মাখনবাবু বলেছিলেন, তোমরা দেখে নও। এ কেষ্টব্যাটা কবে বেঘোরে মারা পড়বে।

তখন সবাই হেসেছিল। হাসির কারণ মারা পড়াটা নয়, নামটা। ওর নাম কেষ্ট নয়, কালা। কুড়ুলে-কাপশার কালাচরণ। তিরিশের মধ্যে বয়স। পেটে বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্যই। ছেলেবেলায় যাত্রাদলে একানি গানের 'বালক' ছিল। এ যৌবনে সে গলা আর নেই। রূপও নেই। রুক্ষুসুক্ষু পোড়খাওয়া চেহারা। পেশাদার চোর বলে বদনাম প্রচুর।

ইটখোলার মাখনবাবু ম্যাট্রিক পাস। রবি ঠাকুরের পদ্যপড়া লোক। 'পুরাতন ভৃত্যের কেষ্টাব্যাটাই চোর, এই অনুসঙ্গ থেকেই হয়তো বলে থাকবেন কথাটা। কিন্তু লোকে বুঝেছিল অন্য কেষ্ট। বৃন্দাবনের প্রেমিককে।

সেই প্রেমিকের গায়ের রঙও নবঘনশ্যাম অর্থাৎ স্রেফ কালো ছিল। যমুনা নামে একটা নদীও ছিল, যেমন এই ছোট্ট নদীটা। সেই প্রেমিক বাঁশিও বাজাত। আসলে প্রেমিকাকে ডাকার সংকেত।

কুড়ুলে-কাপশার এ কালীচরণের সঙ্গে তার এমন অনেক মিল। তাছাড়া চুরি-চামারিতেও দুজনের নামডাক—যদিও বৃন্দাবনের প্রেমিক স্রেফ ননীটা মাখনটাই চুরি করত। কাজেই সুঁদরিতলায় লোকেরা এমনি-এমনি হাসেনি।

ইটখোলাটা নদীর পাড়ে। পিচরাস্তা গ্রাম ঘুরে যেখানে সাঁকো পেরিয়ে গেছে, তার নীচে। মাখনবাবুর দরমাবেড়ার ঘরের বারান্দায় বসলে সামনা-সামনি ওপারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখা যায়। তার তলায় ষষ্ঠী নামে একটা লোক বুড়ো হয়ে গেল কালক্রমে। চা-বিস্কুট আর বিড়ি সিগারেট বেচছে সেই খেয়া নৌকোর আমল থেকে। এখনও ভোল ফেরাতে পারেনি। কালী তারই ছেলে। শিবরাত্রির সলতে।

ওপারে কুড়ুলে-কাপশার বিস্তীর্ণ মাঠে সন্ধ্যার ঘোর লাগতে না লাগতে ষষ্ঠী তার সলতেটিকে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় বটতলায়।

আজকাল নদীর ধারের খোলামেলায় রাতের হাওয়াটা সয় না। বুড়ো হাড এখন একটু ঘুমের আরাম চায়। এদিকে কালী টাট আগলায়। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ এ-গাঁ ও-গাঁর লোকেরা বসে যায় বটতলায়। বিক্রিবাটা মন্দ হয় না। তারপর রাত আটটার বাস চলে গেলে একেবারে নিশুতি। চারদিক জুড়ে অন্ধকার। তার মধ্যে টিমটিমে আলো আর কালীর বাঁশের বাঁশির সুর। রাতের নদী বাঁশির সুরকে প্রতিধ্বনিতে মুড়ে উজান-ভাটি কতদূর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেলা করে।

ইটখোলার মজুর-মজুরনীরা যদ্দিন ছিল, তদ্দিন ব্যাপারটা কানে আসেনি মাখন হালদারের। কারণ সেই সন্ধ্যা থেকে ওদের ঢোলে উঠত তুমুল বাজনা। তার সঙ্গে ইকড়ি-মিকড়ি ভাষার গান। সেই মধ্যরাত অব্দি এই আসর চলত। এখন ইটখোলায় স্টক ঠাসা। কণ্ট্রাকটার ফেঁসে গেছে কিসে, মাল ডেলিভারি নিচ্ছে না। চৈত্রের মরশুমটাই 'ব্লকড'। মাখনবাবুর মনমেজাজ খিঁচড়ে গেছে। ইটখোলা খাঁ খা করে দিনরাত। কাজকর্ম না থাকলে সময় কাটানো দায়। মন সবখানে সবকিছুতে ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়।

এই ছোঁক-ছোঁকামি এবং স্তব্ধতার দরুন মাখনবাবুর চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা।

ইটখোলার অন্যপাশে নদীর একটা দহ আছে। সারা বছর সেখানে জল থাকে এবং সুঁদরিতলার লোকেরা শীতের শেষ থেকে ঘাট বদল করে ওখানেই যায়। বারান্দা থেকে দহের ঘাট ভালই নজরে পড়ে। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার।

কালীর বাঁশি বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। তারপর মাখনবাবু ভূত দেখে চমকে উঠেছিলেন।

সাদা কাপড়পরা মূর্তি দহের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূত তো এরকমই। মাখনবাবু ভয় পাওয়া ভাবটা জেদ করে কাটিয়ে পা টিপে-টিপে এবং সাপের ভয়ে পায়ের কাছে সাবধানে টর্চের আলো ফেলে ইটের স্তূপের আড়াল দিয়ে এগিয়েছিলেন। তারপর যা থাকে বরাতে বলে টর্চের আলো সোজা সেই মূর্তির ওপর ফেলেছিলেন।

তখন মূর্তি একটা নয়, দুটো। এবং কালী তক্ষুণি পালিয়ে গেল। ঝোপ-ঝাপ ডিঙিয়ে একেবারে হাওয়া। আর সরমা দুহাতে মুখ ঢেকে হাসল।—মাখনদা নাকি?

মাখনবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবতেই পারেননি, এমন অদ্ভুত কিছু ঘটতে পারে। ভদ্রবাড়ির বিধবা মেয়েটি ওই চোরচোট্টা কালীর সঙ্গে প্রেম করছে, এ কি ভাবা যায়?

তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, নিলাজ মেয়েটা আবার অমন গলায় বলছে, মাখনদা নাকি?

মাখনবাবু গুম হয়ে ফিরে আসছিলেন। তখন ফের সরমা ডেকেছিল—মাখনদা, শুনুন!

—বলো।

—কাকেও বলবেন না যেন। বললে ভাল হবে না।

এ কি শাসানি, না দাবি? মাখনবাবু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে শুধু বলেছিলেন, হুঁ।

বুকের পাটা অসতী মেয়েটার—ফের বলেছিল, হুঁ নয়। বললে ভাল হবে না কিন্তু।

মাখনবাবু ফোঁস করে উঠেছিলেন—শাসাচ্ছ নাকি?

—তা বললে তাই।

এতক্ষণে চোখে পড়েছিল জ্যোৎস্নায় একটা পেতলের ঘড়া চকচক করছে। ঘড়াটা তুলে নিয়ে সরমা জলে নেমেছিল। আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছিলেন মাখনবাবু। ভীষণ খাপ্পা হয়ে গিয়েছিলেন মনে-মনে। কিন্তু তিনি হিসেবী মানুষ। তাছাড়া বাইরের লোক। সরমাদের বাড়ি যাতায়াত করে থাকেন বটে, তেমন যাতায়াত তো সুঁদরিতলার সব বাড়িতেই। এই সুনসান

ইটখোলায় একা পড়ে আছেন। প্রাণের ভয়ও আছে কারণ-অকারণে। সুঁদরিতলার লোকের বদনাম আছে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বলে। নদীতীরের লোকেরা যা হয়। তার ওপর বিশেষ করে সরমার দাদা পরেশ নাকি সাংঘাতিক লোক। একসময় মিলিটারিতে ছিল। সবসময় সেই রোয়াব দেখায়। ওর সঙ্গে ভাব রাখাটা ভাল ভেবেছিলেন।

কিন্তু সাতপাঁচ ভেবে এ ঘটনাটা চেপেই গিয়েছিলেন। শুধু কখনও-সখনও কালীর কথা উঠলে বলেন, কেষ্টাব্যাটা মরবে। লোকেরা হাসে। ষষ্ঠীর ছেলে কালী নাকি পুলিশের হাতে কতবার ঠ্যাংগানি খেয়েছে। জেল এখনও হয়নি—তবে বদনামটা রটে গেছে ইতিমধ্যেই। কালী নাকি পাকা চোর। রাত-বিরেতে চুরি করে বেড়ায়। ওর সাঙ্গাতরা সবাই এলাকার দাগী। তবে পুলিশের ভয়ে বটতলায় এসে প্রকাশ্যে মাথামাথি করে না কালীর সঙ্গে।

কিন্তু মাখনবাবু ভেবে কুল পান না, ওই একটা কালোকুচ্ছিত চোরচোট্টার সঙ্গে ভদ্রলোকের বাড়ির সুন্দর মেয়েটা—বিধবা মেয়েটার এ প্রেমের মানেটা কী? নিছক কাম ছাড়া কিছু হতে পারে না। গতরের সুখ মেটানো। ঘেন্নায় রাগে মাখনবাবুর পিত্তি জ্বলে যায়। ওদের বাড়ি আর যান না। দূর থেকে সরমাকে দেখলে অন্যদিকে ঘোরেন। মনে মনে বলেন, মরবে। দুজনেই মারা পড়বে। তবে ওই কালীর মরণটাই আগে হবে পরেশের হাতে। তারপর মরবে সরমা। অবশ্য সরমার মৃত্যুটা ওর নিজের হাতেই হবে। সচরাচর তাই হয়ে থাকে বিধবাদের বেলায়।…

কালীর চোর বদনামের সঙ্গে লাম্পট্যের বদনামও আছে। তাই বলে কেউ ভুলেও ভাবে না সরমার সঙ্গে তার কিছু থাকতে পারে। এটা অকল্পনীয়। কালী সুঁদরিতলা বরাবর যাতায়াত করেছে কাজে-অকাজে। পরেশের পায়ের কাছে বসে আড্ডা দিয়েছে কতদিন। পরেশ তাকে সেই ছেলেবেলা থেকে একটু আধটু আস্কারা দেয়, সেটা স্বাভাবিক। পরেশ লোকটাও তো ভাল নয়। মুরুব্বির জোর আছে বলে, তাছাড়া ভদ্রলোকের বংশ, পুলিশের পাল্লায় তাকে কখনও পড়তে দেখে নি কেউ। বরং পুলিশই গাঁয়ে এলে তার পাল্লায় পড়ে। অর্থাৎ তার বসার ঘরে আড্ডা দিয়ে যায়। দারোগাবাবুরা তাকে খাতির করে কথা বলেন। তার বাড়ি খাওয়াদাওয়া করেন। পরেশের দাপট তাই বেড়েছে।

এমন মানুষ পরেশ—তার বিধবা বোন সরমাও তেজী মেয়ে। সকাল-সন্ধ্যা একাদোকা ঘুরে বেড়াতে তার বাধে না। জোরটা তার নিজের খানিকটা এবং খানিকটা দাদার। কে তার দিকে খারাপচোখে তাকানোর সাহস পাবে? ধারণাটা এমন: পরেশের বোন যদি ন্যাংটো হয়ে পড়ে থাকে পথেঘাটে, মানুষ তো দূরের কথা—কুকুর-বেড়ালেরও সাধ্যি নেই তার দিকে একবার তাকায়।

কথাটা সত্যি। সুঁদরিতলার প্রেমিক বা লম্পট কারুর সে হিম্মত নেই। তাছাড়া শহর থেকে অনেক দূরে এই অথদ্ধে গাঁয়ে এখনও চিরাচরিত গ্রামীণ ঐক্যবোধ বড় প্রবল। গাঁয়ের লোক সবকিছুতে এককাট্টা। আণ্ডাবাচ্চা থেকে বুড়োবুড়ি সবার এক রা। নিজেদের ব্যাপারে সামাজিক শাসন বড় কড়া। এ গাঁয়ের চোর নিজের গাঁয়ে চুরি করে না। এ গাঁয়ের লম্পট কদাচ নিজের গাঁয়ে লাম্পট্য করে না। অবশ্য প্রেম জিনিসটা আলাদা। একটু-আধটু প্রেম না হয়, এমন নয়। তবে বেশিদূর এগোতে পারে না।

এমন গাঁয়ের ধারে ইটখোলা করে মাখন হালদার নিরাপদ বোধ করেছেন। গাঁয়ের লোকে বলেছে, নির্ভয়ে থাকুন মাখনবাব। মাখনবাবু নির্ভয়ে আছেন বৈকি—দারোয়ান রাখেননি ইটের পাহারায়। তবে সংস্কারবশে মাঝে মাঝে ভয় পান এই যা।

সেই জ্যোৎস্নারাতের ঘটনা থেকে তাঁর মনে কী একটা অস্বস্তির শুরু। তারপরও কোনো-কোনো রাতে টের পেয়েছেন দহের ঘাটে কালী আর সরমার প্রেম চলছে। কিন্তু আড়ি পাততে যাননি। যতক্ষণ ব্যাপারটা চলতে থাকে, অস্বস্তি ঝড়ের মতো হুলুস্থুল বাধায়। ছটফট করেন। কান পাতেন, কালীর মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনবেন বলে।

কখন কান পেতে থাকেন, হইহল্লার আওয়াজ আসছে নাকি।

কিছু আসে না। নিশুতি রাত থমথম করে। জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে নদী তেমনি শান্ত শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সাঁকোয় শব্দ করে চলে যায় মোটর-গাড়ি। আলোর ঝলকানি ছড়িয়ে যায় বাঁকের মুখে। মাঠ ঝোপঝাপ আর বটগাছটা জ্বলে ওঠে যেন। ফের নিভে যায়। কখনও লালচে ইটের স্তূপে আলোর থাবা পড়ে। থাবা সরে যায় দূরে। মোটর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যায়। ফের জেগে ওঠে স্তব্ধতা। সেই বিরাট স্তব্ধতার ওপর রাতের হাওয়া এসে খেলা করে। বটের ডালে পেঁচা ডাকে একবার। কোথাও শেয়াল ডেকে ওঠে। আবার সব চুপ। দহের দিকটাও ভারি শান্ত।…

চৈত্র শেষ হয়ে এসেছে। গাজনের বাজনা বাজিয়ে ভক্তরা দহের ঘাটে এসে ঠিকন-ঠাকনের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। এখন নাইতে মানা ওদের। ওদিকে ইটখোলার পেছনে বাঁশবনের ভেতর আখমাড়াই কল বসেছে। মিঠে গন্ধ ভেসে আসে ফুটন্ত রসের। ক্ষেতে চৈতালীর হলুদ রঙের ঘোর লেগেছে। সেই সময় মাখনবাবু শুনে আঁতকে উঠলেন, সরমার সঙ্গে কালীর ব্যাপারটা সুঁদরিতলায় কীভাবে জানাজানি হয়ে গেছে।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কথায় বলে, পাপ চাপা থাকে না। মাখনবাবু জানতেন, এ পাপ কখনও চাপা থাকবে না। তাছাড়া কতবার আসল কথাটা ঢেকে ইশারায় বলেছেন, দেখে নিও—কেষ্টব্যাটা মরবে। লোকেরা হেসেছে।

এখন সেই লোকেরাই বলছে, আপনি ঠিক কথা বলেছিলেন মাখনবাবু। তাহলে নিশ্চয় কিছু চোখে পড়েছিল আপনার?

মাখনবাবু জোরে মাথা দুলিয়ে বলছেন, আরে না না। ওটা বোঝা যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা কীভাবে জানাজানি হল? আর কার চোখে পড়ল? মাখনবাবু এর সঠিক জবাব পাচ্ছেন না। বিজ্ঞের মতো সুঁদরিতলার লোকেরা খালি এক কথাই বলে, ও জিনিস কি চাপা থাকে?

দুপুরবেলাটা ইটখোলায় ঘুমঘুম ভাব। কুকারে রান্না সেরে মাখনবাবু চান করে এসেছেন। খাবার জল গাঁয়ের টিউবেল থেকে দিয়ে যায় একটা লোক। খাওয়াদাওয়া সেরে সবে ভাতঘুম দিতে গড়িয়েছেন, বারান্দায় কেউ এল। কুকুর ভেবে বললেন—যাঃ যাঃ।

সরমা সোজা ঘরে ঢুকে বলল—আমি।

মাখনবাবু ধুড়মুড় করে উঠে বসলেন। বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে শুধু বললেন—কী?

সরমার কাঁধে গামছা। ঘাটে নাইতেই এসেছে। ঘড়াটা নিশ্চয় ওখানে রেখে এসেছে। কবে চুল মুড়োতে হয়েছিল। মুরুব্বিদের চাপে, ফের গজিয়েছিল। কিন্তু আর কাটেনি। এখন কাঁধ ছুঁয়েছে। ছিপছিপে হাল্কা গড়ন। তাই বলে রোগা দ্যাখায় না। ডিমালো মুখ। নীলচে সূক্ষ্ম রোম আছে ঠোঁটের ওপর। চিবুকের বাঁদিকে জড়ুল। গায়ে জামা নেই। চুলপাড় ঘিয়ে রঙের শাড়ি জড়িয়ে যৌবনের অনেকটা আড়ালে রেখেছে। ভুরু কুঁচকে বলল—একটা কথা বলতে এলাম মাখনদা।

মাখনবাবু কোনোরকমে খালি বললেন—উঁ?

সরমা এবার ফিক করে হাসল।—উঁ নয়, একটা কথা বলতে এলাম। বোবাকালার মতো তাকাবেন না। শুনুন। ওবেলা বটতলায় কালীকে একটা খবর দেবেন?

মাখনবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—খবর দেবার আর লোক পেলে না?

—না। সরমা ফের গম্ভীর হল। গাঁয়ের লোককে তো জানেন। সব এক রা। আপনি কালীকে বলবেন, এখন কিছুদিন যেন ভুলেও এপারে না আসে। এমনকি বটতলাতেও যেন না আসে। বলবেন—কেমন?

—বলব। মাখনবাবু ভালমানুষের মতো বললেন।

সরমা যেমন এসেছিল, তেমনি হুট করে মিলিয়ে গেল। মাখনবাবু সিগারেট ধরালেন। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? সিগারেট টানতে টানতে রেগে গেলেন ক্রমশ। কী ভেবেছে আমাকে? ওই হারামজাদীর দূতিয়ালি করতে হবে নাকি? কী আব্দার দেখছ?

বিকেলে অস্থির হয়ে সাঁকোতে ঘুরছেন, সুঁদরিতলার কানু নামে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল। কানু বলল, দাদাবাবু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ হে কানু, শোন। মাখনবাবু ফিসফিস করে বললেন—পরেশবাবুরা কালীকে খুন করবে, সত্যি নাকি হে?

কানু একগাল হেসে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবু। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সেদিন রাতে মিটিংয়ে কথা হয়েছে, কালীকে হাত-পা বেঁধে গুড জ্বাল দেওয়া চুলোয় ঢোকানো হবে।

মাখনবাবু আঁতকে উঠে বললেন—বলো কী হে!

কানু অকপটে সরলমুখে বলল—প্রথমে কথা হয়েছিল, বলি দেওয়া হবে বরজেতলার হাঁড়িকাঠে। শেষে ঠিক হল, মুণ্ডু কাটলে তো কিছু বুঝবেই না। তার চেয়ে চুলোয় ঢুকিয়ে মারলে কষ্টটা বেশি হবে। জ্ঞানও হবে।

মাখনবাবু করুণ হাসলেন। —সে জ্ঞানে আর কী ফল?

কানু বলে গেল—ফল আছে বৈকি। মুরুব্বিরা বুঝেসুঝেই ওই শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

মাখনবাবু মনে মনে নাক কান মললেন। ইটগুলোর ব্যবস্থা বোশেখেই হয়ে যাবার কথা। এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় আর নয়।

কানু চলে যাওয়ার কতক্ষণ পরে সূর্য ডুবল। কুডুল-কাপশার মাঠের দিকটা ধোঁয়াটে হয়ে এল। বনচডুইয়ের ঝাঁক উড়ল আর বসল শূন্য ধানক্ষেতে।

শেষ ঘূর্ণিটা চলে গেল খড়কুটো উড়িয়ে। বটতলায় হারিকেন জ্বললে মাখনবাবু গেলেন।

কালীর টাটে অচেনা দুজন লোক চা খেয়ে বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে নিয়ে মাঠের পথ ধরল। একটু তফাতে বাসের অপেক্ষায় কারা দাঁড়িয়ে আছে। মাখনবাবুকে দেখে কালী হেসে বলল—আসুন দাদাবাবু। বসুন, চা খান।

মাখনবাবু বাঁশবাতার বেঞ্চে বসে বললেন—থাক্। একটা কথা বলতে এলাম, কালী।

কালী এদিকওদিক দ্রুত দেখে নিয়ে বলল—দাদাবাবু, কথা আমিও বলতে যেতাম। এসেছেন ভালই হয়েছে।

মাখনবাবু বললেন—তোমার কথাটাই শোনা যাক আগে।

কালী চাপা গলায় বলল—দোহাই দাদাবাবু, কাকেও বলবেন না। আপনি বাইরের লোক বলেই অনুরোধ করছি। আপনি তো পরেশবাবুর বাড়ি যান-টান দেখেছি।

—হুঁ। যেতাম, আজকাল যাইনে। কেন?

তাহলে⋯কালী একটু ইতস্তত করে বলল, তাহলেও আপনার সঙ্গে ওর দেখা হতে পারে। ঘাটে তো আসে-টাসে! দয়া করে বলবেন, কালী বলেছে⋯

মাখনবাবু বাধা দিয়ে বললেন—আহা, ও-টা কে আগে তাই বলো না হে!

কালী লাজুক হেসে বলল—আজ্ঞে, পরেশবাবুর বোনের কথা বলছি।

—হুঁ। বলে মাখনবাবু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

কালী বলল—আপনি তো সবই জানেন দাদাবাবু। আপনার হাতে একবার ধরাও পড়েছিলাম। আপনি বড় ভালমানুষ দাদাবাবু। আমরা কত সুনাম করি আপনার।

মাখনবাবু হাত তুলে বললেন—আহা, বলোই না বাবা কী বলতে চাও।

—আপনি সরমাকে বলবেন, তুমি কালীকে যা বলেছ, কালী তাতে রাজী না। বাস্, তাহলেই ও বুঝবে। আর কিছু বলতে হবে না।

মাখনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—দেখা হলে বলব। এবার আমার কথাটা বলি।

কালী চা ছাঁকা বন্ধ রেখে আগ্রহে তাকিয়ে রইল।

—ওবেলা সরমা বলে গেছে তোমাকে বলতে। ওপারে কিছুদিন তুমি ভুলেও পা দেবে না এমন কী বটতলাতেও আসবে না।

কালী নড়ে উঠল।—কেন? কেন?

মাখনবাবু একদমে বললেন—তুমি খুন হয়ে যাবে।

কালী হেসে উঠল। —হ্যাঁ! এই কথা।

মাখনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কোরো না কালী। আমিও শুনেছি, তোমাকে গুড়ের চুলোয় ঢুকিয়ে মারবে সুঁদরিতলার লোকেরা।

—যাঃ! কালী চা ছেঁকে চায়ের গেলাস দিল। তারপর দাঁড়িয়ে ওপারটা দেখতে দেখতে বলল—সুঁদরিতলার লোকেরা কী, তা জানি দাদাবাবু। কিন্তু এ কালীকেও কম ভাববেন না।

—কথা শোনো কালী। অত বড়াই কোরো না। যা বললাম, শুনো।

কালী একটা আড়ামোড়া খেয়ে বলল—সরমার কাছে আর যাব না, সে তো বুঝতেই পেরেছেন। ও আমাকে ঠকিয়েছে। তবে ওই যে বললেন, ওরা আমাকে খুন করবে—সেজন্যেই ওপারে যাব।

—কালী! পাগলামো কোরো না।

কালী ফের হাসতে লাগল। তার হাসিতে আত্মবিশ্বাসের ভাব জোরালো। মাখনবাবু আর কোনো কথা বললেন না। চা শেষ করে চুপচাপ চলে এলেন। কালী পিছু ডেকে একবার বলল—কথাটা বলবেন কিন্তু।

সরমা এল পরদিন দুপুরের একটু আগেই। তেমনি কাঁধে গামছা, স্নানের ভঙ্গি। ঘরে ঢুকে সোজা বলল—দেখা হয়েছিল? বলেছেন?

—বলেছি।

—কী বলল?

--গ্রাহ্যই করলে না। আর···

—আর?

—তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছে।

—কী?

—তোমার কথায় ও রাজি না। তুমি ওকে নাকি ঠকিয়েছ!

সরমা ঠোঁট কামড়ে ধরল। ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওর নাকের ফুটো কাঁপছিল। একটু পরে মাখনবাবুর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বলল—ঠকিয়েছি বলল?

—হুঁ। তাই তো বলল।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সরমা বলল—আচ্ছা। তারপর দরজার দিকে ঘুরল।

মাখনবাবু পিছু ডাকলেন—সরমা, শোন।

পিছু না ফিরে সরমা বলল—কী?

—ব্যাপারটা খুলে বলবে আমাকে?

—সব কথা সবাইকে বলা যায় না মাখনদা। যায়?

—না। মানে,...

সরমা ঘুরে তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাখনবাবু একটু কেসে গলা সাফ করে হাসলেন। —ধরো, তোমাদের যদি সাহায্য করতে পারি। আমি বাইরের লোক কিনা!

সরমা কেমন হাসল। —আপনি খুব ভালমানুষ জানি, মাখনদা। কিন্তু থাক্। বাইরের মানুষ বলেই আর আপনাকে জড়াবো না। তবে লোকে আপনার ক্ষতি করে বসবে।...

সরমা হনহন করে চলে গেল। ইটের পাঁজার ফাঁক দিয়ে সাবধানে পা ফেলে শেয়ালের মতো চলে গেল। মাখনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেন। বড় রহস্যময় একটা ব্যাপারের সঙ্গে যেভাবেই হোক, জড়িয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো ইচ্ছে করে জড়াননি। পরেশের বোন আর ওই হারামজাদাটা তাঁকে বেমক্কা জড়িয়ে ফেলেছে। অথচ ভেতরকার কিছু আঁচ করতে পারছেন না। এ বয়সেও বিয়ে করেননি। প্রেম করারও সুযোগ পাননি জীবনে। সরমা আর কালীর প্রেমের আড়ালে একটা কিছু আছে যেন। সেই অন্য ধরনের ব্যাপার।

তবে নিজের পৌরুষে বড্ড বাজে। মেয়েটা তাঁকে কী ভেবেছে? ওদের জঘন্য ব্যাপারটার দালাল বানিয়ে বসেছে তাঁকে। এটা ধৃষ্টতা। মাখন হালদারের মতো সোমত্ত পুরুষমানুষ, তাঁকে নোংরা একটা মেয়ে চাকরের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। পরেশের বাড়ি ওঠাবসা করতে গিয়েই হয়তো নিজের অজান্তে প্রশ্রয় দিয়ে বসেছিলেন মেয়েটাকে।

সেদিনের মতো মনমেজাজ বেজার হয়ে রইল মাখন হালদারের। বিকেলে একবার সাঁকোর ওপর ঘুরতে গিয়েছিলেন। বটতলা পর্যন্ত এগোননি। দূর থেকে দেখলেন, কালী আজ সকাল-সকাল বাবাকে ছুটি দিতে এসেছে।

একটু পরে তিনটে সাইকেলে চেপে তিনজন পুলিশ এসে বটতলায় থামল। তখন সূর্য ডুবে গেছে। মাখনবাবু দেখলেন, পুলিশরা হেসে-হেসে কথা বলছে কালীর সঙ্গে। চা খাচ্ছে।

তারা যখন ফেরার পথে সাঁকোর ওপর এসেছে, মাখনবাবু চিনতে পারলেন,

কাপাসীর দারোগা ত্রিলোচনবাবু আর দুজন সেপাই। মাখনবাবুকে দেখে ত্রিলোচন দারোগা রাস্তায় পা ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন।—মাখনবাবু যে। হাওয়া খাচ্ছেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল আছেন স্যার?

—আপনার আশীর্বাদ।

মাখনবাবু সিগারেট দিয়ে বললেন—আর বলবেন না স্যার! ইট ডেলিভারি হচ্ছে না। কী যে বিপদে পড়েছি। যখের ধনের মতো আগলে থাকা। কখন গাড়ি বোঝাই করে মেরে দেয় কে।

দারোগা হাহা করে হাসলেন। —সুঁদরিতলা ভাল জায়গা। এককাট্টা গ্রাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। চুরি যাবে না।

যা দিনকাল পড়েছে স্যার' বলে মাখনবাবু হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন দারোগাবাবুকে।

ত্রিলোচন দারোগা ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন—এ-গাঁয়ে আমরা বিশেষ ঢুকি না জানেন? কারণ, গ্রামবাসীর একতা। কতকাল এ গাঁয়ের কোনো মামলা কোর্টে যায়নি জানেন? যাক্ গে, চলি। আজ খুব হয়রানি গেছে। দশ মাইল চক্কর দিয়ে এলুম।

মাখনবাবু হঠাৎ চাপা গলায় বললেন—একটা কথা ইদানীং কানাঘুঁষো শুনছি স্যার! আপনারা তো আইনরক্ষক। তাই বলা উচিত মনে করছি।

দারোগা আগ্রহে বললেন—বলুন, বলুন কী ব্যাপার?

—সুঁদরিতলার লোকেরা নাকি ওই কালীকে খুন করবে ঠিক করছে।

—তাই বুঝি? বলে আকাশমুখো ধুঁয়ো ছেড়ে ত্রিলোচন দারোগা হাসির মতো একটা শব্দ করলেন। সেটা কাশিও হতে পারে। তারপর ফের বললেন—দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। ওই যে শাস্ত্রবাক্য আছে, দুষ্কৃতয়াং বিনাশাশ্চ পাপীনাং উদ্ধারেণ না কী যেন। আমার আবার মুখস্থ বিদ্যাটা আসে না। তা বুঝলেন কি না? সবই ভগবানের লীলা। তিনিই পাপীদের সৃষ্টি করেছেন এক রূপে, হনন করছেন অন্যরূপে। এতে আপনিই বা কী করবেন, আমিই বা কী করব? আমরা কে, বলুন? নিমিত্ত মাত্র।

সন্ধ্যার আকাশের দিকে সিগারেটসুদ্ধ আঙুলের চক্কর এঁকে দারোগা দার্শনিক হাসি হেসে প্যাডেলে পা রাখলেন। সেপাই দুজন সাঁকোর রেলিং-ঘেঁষে সাইকেলে বসে ছিল। তারাও প্যাডেলে চাপ দিল।

তারপর ওই অবস্থায় ত্রিলোচন দারোগা ঘাড় ঘুরিয়ে ফের বললেন—রাখে হরি তো মারে কে, আর মারে হরি তো রাখে কে?

আবছা আঁধারে তিন আইনরক্ষকের মূর্তি মিলিয়ে গেল। মাখনবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেরাতে বটতলায় কালীর বাঁশি জোর বাজছিল। কী সুর বাজায় এলোমেলো, মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। যাত্রাগানেরই সুর হয়তো। আর আজকাল রাতের দিকে হাওয়া বড় উত্তাল। ইটের পাঁজাগুলোকেও যেন কাঁপিয়ে দেয়। সবকিছু নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। বুক কাঁপে। কী হয় কী হয় এরকম একটা উত্তেজনা রক্ত ঘুলিয়ে তোলে। একটা মানুষ খুন হবে—একটা জলজ্যান্ত মানুষ! ভাবতেই হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যায় মাখনবাবুর। কালীর বাঁশি থামলে আগেও একটা উত্তেজনা জাগত, সেটা নির্জন নদীর ঘাটে একজোড়া মানুষের জোড়বাঁধার খেলা চলছে অনুমান করেই। এখন থামলে যে উত্তেজনা, তা আতঙ্কের। ওরা কি কালীর হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে নিয়ে যাচ্ছে আখমাড়াই কলের দিকে বাঁশবনের ভেতর?

বড় অসহায় লাগে নিজেকে। এই ইটভাটায় এভাবে থাকা যায় না। এ এক শাস্তি।···

এর ক'দিন পরে সুঁদরিতলার সেই কানুর সঙ্গে ফের দেখা হল সাঁকোর ওপর। কানু বলল—এই যে দাদাবাবু। আপনার কথাই ফলল। কেষ্টাব্যাটা খুন হল।

চমকে উঠলেন মাখনবাবু।—এঁ্যা সত্যি খুন হল নাকি? কবে?

—গত রেতে।

—সর্বনাশ! মাখনবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কানু একগাল হেসে বলল—গুড়ের চুলোয় ঢোকানো হয়নি। ঘাড়ে বাঁশ রেখে ধড়টাকে উল্টে দিতেই মট করে শব্দ হল। বাস্, বাছাধন কাঠ। কই, একটা সিগারেট দিন আগে।

নিঃসাড় হাতে সিগারেট দিলেন মাখনবাবু। কানু মৌজ করে টানতে টানতে সাঁকোর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ফের বলল—তখন রাত বারোটা-টারোটা হবে। কালী পরেশবাবুদের বাড়ি ঢুকেছিল পাঁচিল ডিঙিয়ে। আর পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের মুখে। পরেশবাবু লোহার রড হাতে রেডিই ছিলেন। এক ঘা খেয়ে কালী খিড়কির দরজা খুলে পুকুরে পড়ল। ততক্ষণে পরেশবাবুর ডাকে লোকজন হাজির হয়েছে। পুকুর ঘিরে ফেলেছে। যেদিকে উঠতে যায় কালী, বল্লমের খোঁচা খায়। শেষে বল্লমে গেঁথে মাছের মতো তোলা হল। সদররাস্তায় টানতে টানতে নিয়ে গেল পরেশবাবু। তখন গাঁসুদ্ধ জেগেছে। আমিও দাদাবাবু—বুঝলেন? বরজেতলার থানে ওর ঘাড়ের তলায় বাঁশ দিয়ে···

মাখনবাবু বললেন—থাক্।

কানু হাসতে লাগল।—লাস বিলের তলায় পুঁতে দিয়েছে। আজ সকাল থেকে তার ওপর বোরো ধানের চারা রুয়ে দিয়েছে পরেশবাবু।

একটু চুপ করে থেকে মাখনবাবু বললেন—সরমার খবর কী?

কানু বলল—গতিক বুঝে রাতেই পালিয়েছে। সামনে থাকলে তো গাঁয়ের লোকে ওকেও ছাড়ত না। পরেশবাবুর সে হুকুম দেওয়া আছে। জোড়া লাসের ওপর ধান ফলিয়ে ছাড়ত।

এরা কী নিষ্ঠুর—এই সুঁদরিতলার লোকেরা! মাখনবাবু ভুরু কুঁচকে বিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু একটা ব্যাপার এখনও বোঝা যাচ্ছে না, কালী সরমার কোন কথায় রাজি নয় বলেছিল? সেটা কী? এ জীবনে রহস্যটা আর হয়তো জানাও যাবে না। কুলটা মেয়েটা নিপাত্তা হয়ে গেছে।···

বোশেখের মাঝামাঝি সুঁদরিতলার ইটখোলা শূন্য করে কণ্ট্রাক্টর মাখন হালদারকে উদ্ধার করেছিল। পরের ইটখোলার জায়গা খুব ভেবেচিন্তে বেছেছিলেন মাখনবাবু। শহরের কাছাকাছি জায়গা। একটু তফাতে ভাগীরথী। মাটিটা আরও ভাল। বর্ষার পর কাজ শুরু হবে। ততদিনে জঙ্গল সাফাইয়েব কাজ আছে। সেই নিয়ে ব্যস্ত।

সরমার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সাইকেলে শহরের রাস্তায় যেতে যেতে মাখনবাবুর চোখে পড়ল, চাপানবিড়ির ছোট্ট একটা দোকানে কুড়ুলে-কাপশার সেই ষষ্ঠীচরণ বসে আছে। তাহলে ওদের অত্যাচারেই বুড়োটা শহরে চলে এসেছে। মাখনবাবু কাছে গিয়ে বললেন—চিনতে পারছ ষষ্ঠী?

ষষ্ঠী একটু হেসে ঘাড় নাড়ল। —আপনি ইটখোলার মাখনবাবু।

—হ্যাঁ। খবর কী তোমার? এখানে এসে জুটলে কবে?

ষষ্ঠী বলল—তা মাসদুই হবে বাবুমশাই। গাঁয়ে মানুষ থাকে? চলে এলাম।

মাখনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন—তোমার ছেলেকে নাকি···

কথা কেড়ে বুড়ো বলল—ওরা পিচাশ বাবুমশাই। তাজা যোয়ান ছেলেটাকে মেরে ফেললে। ফেলুক। থানাপুলিশ করিনি। কী লাভ? ও গাঁয়ের সব শেয়াল এক রা।

মাখনবাবু বললেন—পরেশবাবুর বোনের খবর কী ষষ্ঠী? সে নাকি বেপাত্তা?

দোকানের ভেতর থেকে চটের পর্দা তুলে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে মাখনবাবু হতভম্ব। এ যে সরমা! এই ষষ্ঠীর কাছে আছে সে? সরমা বলল—পরেশবাবুর বোন কোন দুঃখে বেপাত্তা হবে মাখনদা? তাহলে শাস্তিটা দেবে কে পরেশবাবুকে?

—সরমা! কেমন আছ তুমি?

—খুব ভাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন কেমন আছি।

মাখনবাবু ইচ্ছে হল বলেন, ভদ্রঘরের বিধবা মেয়ে হয়ে এভাবে বেজাতের ঘরে কাটানোটা কেমন ভাল এবং কতখানি ভাল? বলতে পারলেন না। তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণে আবিষ্কার করলেন, সরমার পেটে বাচ্চা আছে। সরমা সেটা গোপন করতেও চায় না। ছি ছি, এ-কী নিলাজ সৃষ্টিছাড়া মেয়ে রে বাবা!

সরমা হাসল। —আপনি বলবেন পাপ। কিন্তু আমি জানি, পাপ করিনি। ঘটা করে পুরুত ডেকে মন্তর আওড়ালেই বিয়ে হয়, আর মনের মিল হলে বুঝি বিয়ে হয় না? একবার তো ভাগ্যপরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল মাখনদা। পরের বার বটকে সাক্ষী রেখে আগুন ছুঁয়ে বিয়ে হল। এবার কিন্তু পরীক্ষায় হেরে জিতলাম। পেটে একটা বাচ্চা এল। ওকে চোরছ্যাঁচোড় বলে বদনাম দিত লোকে। আমি জানতাম ও কী। জানাজানির ভয়ে বাচ্চাটা নষ্ট করতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, আজকাল তো হাসপাতালে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। শুধু তুমি সঙ্গে গিয়ে স্বামী বলে কাগজে সই দেবে। আমি সিঁদুর প যাব। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হল না। উল্টে আমাকে ভুল বুঝল। ভাব আমি অন্য কারুর সঙ্গে···

সরমা আঁচলে মুখ ঢাকল। কাঁদতে থাকল। ষষ্ঠীবুড়ো বলল—আর কাঁদে না মা! আমি তো আছি।

সরমা কান্না সামলে জলজলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—দাদার গুমোর আ.. থাকবে ভেবেছেন মাখনদা? সুঁদরিতলার লোকেরা কি খবর পাবে না পরেশবাবুর বোন কোথায় আছে, কেন আছে? শাস্তিটা ভালমতো না দিয়ে ছাড়ব ভাবছেন? আমি সেই সুঁদরিতলারই মেয়ে।

ষষ্ঠী বলল—আমারও সেই কথা বাবুমশাই! মেয়েটা সেই রেতের বেলা দৌড়ে গেল আমার কাছে। আমার সাধ্যি কী? ভাবলুম বোকা ছেলেটাকে তো বাঁচাতে পারব না। বরঞ্চ মেয়েটাকে বাঁচাই। ভাল করেছি, না মন্দ করেছি এবার বলুন?

মাখনবাবু চুপ করে আছেন দেখে বুড়ো ফের বলল—বলুন বাবুমশাই, ভাল না মন্দ করেছি?

মাখনবাবু বললেন—ভাল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল নদীর পাড়ে সেই পরিচিত বটগাছটাকে। বিশাল বট। চারদিকে ঘন সবুজ পাতা ছড়িয়ে ধূসর ডালপালা ও অজস্র ঝুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের বটগাছ। তলায় ছায়া। কিন্তু এ মুহূর্তে গাছটার চেহারা কেমন যেন মানুষেরই মতো।···